রকিব হাসান
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম-১২
সেবা
প্রকাশনী

ভলিউম-১২

তিন গোয়েন্দা

৪৬, ৪৭, ৪৮

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-1261-5
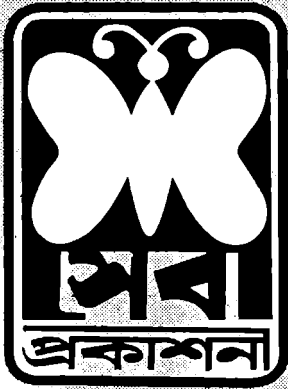
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব, প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৩

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল. ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Volume-12
TIN GOYENDA SERIES
By Rakib Hassan

তেষট্টি টাকা

তিন গোয়েন্দা

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নামঃ
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অপরজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরনো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি এবার—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে!

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

প্রজাপতির খামার ৫—৮২
পাগল সংঘ ৮৩—১৬৬
ভাঙা ঘোড়া ১৬৭—২৬২

তিন গোয়েন্দার আরও বইঃ

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৬৬/-
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৬৬/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৫৫/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৫৫/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৫৮/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৬০/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৬১/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৬৩/-
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৬০/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, রাতের আঁধারে, তুষার বন্দি)	
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৫১/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মুলা)	৫৮/-
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলা'র নেশা, মাকড়সা মানব)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৬৩/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৫৫/-

প্রজাপতির খামার

প্রথম প্রকাশঃ মার্চ, ১৯৯১

'এখানেই বিছাই,' বলে, মেঝেতে ম্যাপ বিছিয়ে দেখতে বসে গেল কিশোর পাশা।

'হ্যাঁ, এইই ভালো হয়েছে,' বললো রবিন। 'টেবিলটা একটু সরাতে হয়েছে, এই যা। তবে বড় ম্যাপ দেখতে মাটিতেই সুবিধে।'

'বেশি আওয়াজ করো না,' হুঁশিয়ার করলো জিনা। 'বাবা স্টাডিতে। শব্দ শুনলেই এসে চেঁচামেচি শুরু করবে।'

'না, করবো না,' মাথা নেড়ে বললো মুসা।

'এই রাফি, চুপ থাকবি,' কুকুরটাকেও সাবধান করলো জিনা। 'নইলে বের করে দেবো। বুঝেছিস?' বুঝতে পারলো রাফিয়ান। শুয়ে পড়লো একেবারে ম্যাপটার ওপরই।

'আরে গাধা, সর!' ধমক লাগালো কিশোর। 'তাড়া আছে আমাদের। বাটারফ্লাই হিল খুঁজে বের করতে হবে...'

'বাটারফ্লাই হিল?' জিনা বললো। 'দারুণ নাম তো!'

'হ্যাঁ, বাংলা করলে হয় প্রজাপতির পাহাড়। ওদিকেই ছুটি কাটাতে যাচ্ছি আমরা এবার। কয়েকটা গুহাও আছে কাছাকাছি। তাছাড়া রয়েছে একটা প্রজাপতির খামার...'

'প্রজাপতির খামার!' জিনা অবাক। 'প্রজাপতির আবার খামার হয় নাকি!'

'হয়,' মুসা জানালো। 'আমাদের ইস্কুলের এক বন্ধু, জনি, তার বাড়ি ওখানে। সে-ই আমাদের দাওয়াত দিয়েছে ওখানে যেতে...'

'তা-ই বলো,' মাথা দোলালো জিনা। এ-জন্যেই হুট করে চলে এসেছো আমাদের বাড়িতে। আমি তো ভাবলাম আমাদের এখানেই ছুটি কাটাতে এসেছো। তোমরা তাহলে বাটারফ্লাই হিলে যাচ্ছো প্রজাপতির খামার দেখতে!'

'হ্যাঁ,' রবিন বললো। 'ভাবলাম, এদিক দিয়েই যখন যেতে হবে, তোমাকেও নিয়ে নেবো। তা যাবে তো?'

'যাবো না মানে? এরকম একটা চান্স ছাড়ে নাকি কেউ?'

গভীর মনযোগে ম্যাপ দেখছে চারজনে। হঠাৎ ঝটকা দিয়ে খুলে গেল

স্টাডিরুমের দরজা। বিড়বিড় করে আপনমনে কি বলতে বলতে এগিয়ে এলেন জিনার বাবা মিস্টার পারকার। ছেলেমেয়েদেরকে দেখতেই পেলেন না আত্মভোলা বিজ্ঞানী, এসে পড়লেন একেবারে ওদের গায়ের ওপর। হোঁচট খেয়ে মাটিতেই পড়ে গেলেন।

রাফি ভাবলো, ওদের সঙ্গে খেলতে এসেছেন মিস্টার পারকার, খুশিতে জোরে ঘেউ ঘেউ করে উঠে নাচানাচি শুরু করলো সে।

'তুমি যে কি, বাবা,' মিস্টার পারকারকে ধরে বললো জিনা। 'একটু দেখে হাঁটতে পারো না?'

'এই রাফি, চুপ!' ধমক লাগালো কিশোর। 'এতো হাসির কি হলো? থাম!'

তিন গোয়েন্দাও এসে হাত লাগালো। মিস্টার পারকারকে ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো। তারপর কেউ তার কাপড় ঝেড়ে দিতে লাগলো, কেউ দেখতে লাগলো কোথাও ব্যথা-ট্যথা পেয়েছেন কিনা। কড়া চোখে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে আচমকা গর্জে উঠলেন তিনি, 'এটা একটা শোয়ার জায়গা হলো! এই জিনা, তোর মা কোথায়? জলদি যা, ডেকে নিয়ে আয়! ডেস্কটা যদি একটু গুছিয়ে রাখে! কাগজপত্র কিচ্ছু পাচ্ছি না। ডাক, জলদি ডাক!'

'মা তো বাড়ি নেই, বাবা। বাজারে গেছে।'

'নেই? সেকথা আগে বলবি তো! যত্তোসব!' গজগজ করতে করতে গিয়ে আবার স্টাডিতে ঢুকলেন তিনি। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

পরদিন সকালে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ওরা। তিন গোয়েন্দা আর জিনা সাইকেলে চলেছে, পাশে পাশে ছুটে চলেছে রাফি। সাগরের ধার দিয়ে গেছে পথ। রোদে ঝলমল করছে নীল সাগর।

গোবেল দ্বীপটা দেখা যেতেই হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলো জিনা, 'ওই যে, আমার দ্বীপ।'

মুখ ফিরিয়ে তাকালো অন্যেরা। বহুবার দেখেছে ওরা ওই দ্বীপ, আর দ্বীপের পুরানো দুর্গের টাওয়ারটা। তবু যতোবারই দেখে নতুন মনে হয়। যতক্ষণ না চোখের আড়াল হলো, সাইকেল চালাতে চালাতে ফিরে ফিরে তাকালো ওরা ওটার দিকে।

সঙ্গে প্রচুর খাবার দিয়ে দিয়েছেন তিন গোয়েন্দার প্রিয় কেরিআন্টি, জিনার মা। কাজেই দুপুরে খাবার অসুবিধে হলো না ওদের। পথের পাশে গাছের ছায়ায় বসে খেয়ে নিলো, জিরিয়েও নেয়া হলো সেই সাথে। তারপর আবার চলা।

'ক'টা নাগাদ পৌঁছবো?' জিজ্ঞেস করলো জিনা।

'এই চারটে,' জবাব দিলো কিশোর।

বেলা গড়িয়ে আসছে। পথের দু'ধারে এখন ছড়ানো প্রান্তর। কোথাও মাঠ, কোথাও চাষের জমি। দূরে দেখা গেল পাহাড়।

'ওটাই বোধহয়,' বলে গলায় ঝোলানো ফীল্ডগ্লাস চোখে ঠেকালো কিশোর। 'হ্যাঁ, ওটাই। অদ্ভুত চ্যাপ্টা চূড়া। বুড়ো মানুষের দুমড়ে যাওয়া হ্যাটের চূড়ার মতো লাগছে দেখতে।'

সাইকেল থেকে নামলো সবাই। এক এক করে ফীল্ডগ্লাস চোখে লাগিয়ে পাহাড়টা দেখলো।

চারটের আগেই পৌঁছতে পারতো ওরা, রাফির কারণে পারলো না। ওরা সাইকেলে চড়ে চলেছে, আর কুকুরটা চলেছে দৌড়ে, তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। ওকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে ওদের।

অবশেষে পৌঁছলো ওরা বাটারফ্লাই হিলের গোড়ায়। ঢালু উপত্যকায় ছড়িয়ে আছে তৃণভূমি, তাতে গরু চরছে। ঢালের আরও ওপরে, ঘাস যেখানে ছোট আর শক্ত, সেখানে চরছে ভেড়ার পাল। পাহাড়ের পায়ের কাছে যেন গুটিসুটি মেরে শুয়ে রয়েছে ফার্মহাউসটা।

'ওটাই জনিদের বাড়ি,' বললো কিশোর। 'ছবি দেখেছি। এই চলো, ওই ঝর্নাটায় হাতমুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে নিই। রাফি, সাংঘাতিক ঘেমেছিস। ইচ্ছে করলে গোসল করে নিতে পারিস।'

মুখহাত ধুয়ে, পরিপাটি হয়ে বাড়িটার দিকে এগোলো ওরা। পায়েচলা মেঠোপথ পেরিয়ে এসে থামলো ফার্মের গেটের কাছে। ভেতরে বিরাট এলাকা। উঠনে মুরগী মাটিতে ঠুকরে ঠুকরে দানা খাচ্ছে। পুকুরে হাঁস সাঁতার কাটছে।

ভেতরে ঢুকলো ওরা। সামনে এগোলো। কোথায় যেন ঘেউ ঘেউ করে উঠলো একটা কুকুর। বাড়ির এককোণ ঘুরে ছুটে বেরিয়ে এলো একটা ছোট জীব। ধবধবে সাদা।

'খাইছে! দারুণ সুন্দর ভেড়ার বাচ্চা তো!' মুসা বললো।

'এই রাফি, চুপ!' ধমক দিয়ে বললো জিনা। 'কিছু বলবি না ওটাকে।'

বাচ্চাটার পিছে পিছে বেরোলো একটা বাচ্চা ছেলে। বয়েস পাঁচের বেশি হবে না। লালচে কোঁকড়া চুল, বড় বড় বাদামী চোখ। ওদেরকে দেখে থমকে দাঁড়ালো।

'তোমরা কারা?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'আমরা জনির বন্ধু,' হেসে জবাব দিলো কিশোর। 'তুমি কে?'

'আমি ল্যারি। আর ও,' ভেড়ার বাচ্চাটাকে দেখিয়ে বললো ছেলেটা, 'ও টোগো। খুব দুষ্টু।'

'তাই নাকি?' রবিন বললো। 'খুব সুন্দর তোমার বাচ্চাটা।'

'সে-জন্যেই তো ওকে আমি এতো ভালোবাসি। এই টোগো, আয় আয়, আমার কাছে আয়।' বাচ্চাটা এগিয়ে এলে ওটাকে ধরে কোলে তুলে নিলো ল্যারি। 'তা তোমরা ভাইয়ার কাছে এসেছো বুঝি?'

'জনি তোমার ভাই?' মুসা বললো। 'হ্যাঁ, তার কাছেই এসেছি। কোথায় ও?'

'ওখানে,' হাত তুলে মস্ত গোলাঘরটা দেখালো ল্যারি। 'ডবিও আছে সাথে। যাও না, গেলেই দেখা হবে।'

ভেড়ার বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে চলে গেল ল্যারি।

'ভেড়াটার যেমন লোম, ছেলেটার তেমনি গাল। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে,' জিনা বললো।

অন্য তিনজনেও মাথা ঝাঁকালো। এমনকি রাফিয়ানও বলে উঠলো, 'হুফ!'

গোলাঘরের কাছে এসে গলা চড়িয়ে ডাকলো কিশোর, 'জনি! জঅনি?'

বেরিয়ে এলো ওদেরই বয়েসী একটা ছেলে। সাথে একটা কুকুর। ওদেরকে দেখেই দু'হাত তুলে চিৎকার করতে করতে ছুটে এলো জনি, 'এই যে, তিন গোয়েন্দা, এসে পড়েছো! আরি, জিনাও! আবার রাফিও! এসো এসো। ছুটিটা ভালোই কাটবে এবার! আমি তো সেই কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি। ভাবছি এই আসছো, এই আসছো!...আরি আরি, ডবি, তুই আবার যাচ্ছিস কোথায়? আরে ও তো রাফি। তোরও বন্ধু।'

ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে রাফিয়ানের। মৃদু গরগর করছে। তার মাথায় চাপড় দিয়ে জিনা বললো, 'হয়েছে, আর রাগতে হবে না। ও ডবি। ওদের এখানেই বেড়াতে এসেছি আমরা।'

দুটো কুকুরের ভাব হতে সময় লাগলো না।

জিনা বললো জনিকে, 'তোমার ভাইটা কিন্তু খুব সুন্দর। ভেড়ার বাচ্চাটাও।'

হেসে উঠলো জনি। 'আর বলো না। টোগোকে নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত ও। কিছুতেই চোখের আড়াল করতে চায় না। এসো, বাড়িতে এসো।'

মায়ের সঙ্গে বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিলো জনি।

'তোমাদের কথা রোজই বলে জনি,' হেসে বললেন মহিলা। 'বলেছে এখানে নাকি ছুটি কাটাবে। এসেছো, ভালো করেছো। কোনো অসুবিধে হবে না। তাঁবু, কম্বল সব রেডি করে রেখেছে তোমাদের জন্যে ও। খাওয়ারও অসুবিধে হবে না। দুধ, ডিম, রুটি, মাখন, সঅব পাবে। যখন যা দরকার, চাইবে, লজ্জা করবে না।'

ঘরের ভেতরে ছোটাছুটির শব্দ শোনা গেল। 'ওই যে, আবার শুরু করেছে!

দুটোর জ্বালায়…,' ঘরের দিকে ফিরে চিৎকার করে মহিলা বললেন, 'এই ল্যারি, চুপ করলি! ভেড়ার বাচ্চাটাকে নিয়ে আবার ঢুকেছিস ঘরে! কতোবার না মানা করেছি, ওসব নিয়ে ঘরে ঢুকবি না।' আবার মেহমানদের দিকে ফিরলেন তিনি। 'বুঝলে, কুকুর-বেড়াল আমার খারাপ লাগে না। কিন্তু ছাগল-ভেড়া একটুও পছন্দ না। কত বলি ওকে, ওটা ফেলে দিয়ে একটা কুকুরের বাচ্চা পোষ, শোনেই না ছেলেটা। টোগো টোগো করে পাগল।'

'মা,' জনি বললো, 'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাই বলবে শুধু? চা-টা খাওয়াতে হবে না ওদেরকে?'

'ও, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! এসো, এসো তোমরা। ভেতরে এসো।'

খাবারের বহর দেখে আফসোস করলো মুসা, 'হায় হায়, এতো! এমন জানলে দুপুরে খেতামই না।'

'না না, এমন আর কি করতে পারলাম,' জনির মা বললেন। 'তাড়াহুড়ো করে করেছি। জনি, তুই খাওয়া ওদের। দেখিস, কোনো কিছু যেন বাকি না থাকে। আমার কাজ পড়ে আছে…'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' ভদ্রতা করে বললো কিশোর। 'আমরা নিজেরাই নিয়ে খেতে পারবো।'

'হ্যাঁ, খাও। নিজের বাড়ি মনে করবে। কোনো লজ্জা করবে না।' চলে গেলেন মহিলা।

টোগো আর ল্যারিও বসেছে ওদের সঙ্গে। পারলে ভেড়ার বাচ্চাটাকে টেবিলেই তুলে দিতো ল্যারি, বড় ভাইয়ের ভয়ে পারছে না। কোলে নিয়ে বসেছে।

মাংসের বড়াগুলো দেখিয়ে জনি বললো, 'ওগুলো কি দিয়ে তৈরি হয়েছে, জানতে পারলে মোটেও খুশি হবে না টোগো।' হাসলো সে। 'ওর দাদার মাংস দিয়ে।'

তাড়াতাড়ি টোগোকে মাটিতে নামিয়ে দিলো ল্যারি। ভয়, কি জানি কোনোভাবে দাদার মাংসের অবস্থা দেখে যদি ভয় পেয়ে যায় ভেড়ার বাচ্চাটা?

কুকুর দেখে অভ্যস্ত টোগো, রাফিয়ানকে দেখে মোটেও ভয় পেলো না। তার গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ালো। রাফিও আদর করে তার গা চেটে দিলো। ব্যস, ভাব হয়ে গেল দুটোতে।

খাওয়া শেষ হলো। এই সময় হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন জনির মা। একটা চেয়ার টেনে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তা কি ঠিক করলে? কোথায় থাকবে? ঘরে, না বাইরে?'

'বাইরেই থাকি,' কিশোর বললো। 'মজা বেশি হবে।'

'থাকো, যেখানে ইচ্ছে। জনি, তাঁবুটাবুগুলো কোথায় রেখেছিস? দিয়ে দে। ওরা নিজেরাই গিয়ে জায়গা পছন্দ করুক, কোথায় থাকবে।'

'এসো,' বন্ধুদের ডাকলো জনি।

ল্যারি আর ডবিও চললো ওদের সাথে। আর ল্যারির কোলে অবশ্যই রইলো টোগো।

তাঁবু আর অন্যান্য জিনিসপত্র বয়ে নিতে মেহমানদেরকে জনি তো সাহায্য করলোই, ল্যারি আর ডবিও করলো।

পাহাড়ের দিকে যেতে যেতে জনি বললো, 'যা সুন্দর জায়গা! খুব পছন্দ হবে তোমাদের। আমিও তোমাদের সঙ্গে ক্যাম্পে থাকতে পারতাম, কিন্তু বাড়িতে অনেক কাজ।'

দুই

সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে গোলাঘরে রেখেছে জনি। দুটো তাঁবু, দুটোই ভালো। আবহাওয়া এখন যেরকম, তেমন থাকলে এই তাঁবুরও দরকার নেই। খোলা আকাশের নিচেই ঘুমাতে পারবে অভিযাত্রীরা।

জিনিসগুলোর প্রশংসা করলো তিন গোয়েন্দা আর জিনা।

একটা *ঠেলাগাড়ি* বের করে তাতে জিনিসগুলো তুলতে আরম্ভ করলো জনি। তার সঙ্গে হাত লাগালো তিন গোয়েন্দা আর জিনা। ল্যারিও যতোটা পারলো সাহায্য করলো ওদেরকে। চামচ থেকে শুরু করে, ফ্রাইং-প্যান, কেটলি, মোটকথা ক্যাম্পিঙের যতো জিনিস দরকার, সব জোগাড় করে রেখেছে জনি।

সে বললো, '*ঠেলাগাড়ি* পরেও নিতে পারবে। আগে জায়গা পছন্দ করো।'

'তার চেয়ে আরেক কাজ করা যাক,' কিশোর বললো। 'জিনা, তুমি আর রবিন চলে যাও। জায়গা পছন্দ করো গিয়ে। আমরা মালপত্র নিয়ে আসছি।'

জায়গা বাছতে বেশিক্ষণ লাগলো না। *ঠেলে* বেরিয়ে থাকা একটা পাথরের নিচ থেকে দেখা গেল ঝর্না বইছে। স্বচ্ছ টলটলে পানি। পানি যেখানে গিয়ে পড়ে ছোট একটা ডোবামতো তৈরি করেছে, সেখানে গজিয়ে উঠেছে ঘন সবুজ গাছপালা। ওই ঝর্নার পাড়েই ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিলো ওরা।

মালপত্র সব এনে রাখা হলো জায়গামতো। কিন্তু সেরাতে আর তাঁবু ফেলার ঝামেলায় যেতে চাইলো না কেউ। আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। তারা থাকবে। বাতাসও বেশ উষ্ণ। রাতে খোলা আকাশের নিচে ঘুমালেও অসুবিধে হবে না।

খাবারের প্যাকেটগুলো খুলতে বসলো রবিন আর জিনা। রবিন ভাবছে,

ভাঁড়ার করা যায় কোন জায়গাটাকে। মনে পড়লো, ঝর্নাটা যে পাথরের নিচ থেকে বেরিয়েছে, সেখানে একটা গুহা আছে। ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা। খাবার রাখলে সহজে নষ্ট হবে না। অন্যদেরকে বলতে তারাও একমত হলো তার সাথে।

ওদেরকে কাজেকর্মে সাহায্য করলো জনি। তার যাবার সময় হলো। বললো, 'রাতের খাবারের দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই। আমি যাই। কাল দেখা হবে। ইস্, তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারলে ভালোই হতো!...আচ্ছা, চলি।'

ডবিকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে। নেমে যাচ্ছে ঢাল বেয়ে। সেদিকে তাকিয়ে একবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো শুধু কিশোর। কিছু বললো না।

'ও তোমাদের খুব ভালো বন্ধু,' জিনা মন্তব্য করলো।

একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালো তিন গোয়েন্দা।

'ক'টা বাজে?' বলে ঘড়ি দেখলো কিশোর। 'আরিব্বাপরে! আটটা বাজে! বুঝতেই পারিনি। তা ঘুমটুম পেয়েছে কারো?'

'পেয়েছে,' হাই তুললো মুসা।

রবিন আর জিনা জানালো, তাদেরও ঘুম পেয়েছে। এমনকি কিছুই না বুঝে রাফিয়ানও 'হুফ' বলে মাথা ঝাঁকালো।

'ঘুমের আর দোষ কি?' মুসা বললো। 'সারাটা দিন কি কম কষ্ট গেছে? তা ঘুমের আগে হালকা কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয়?'

'আমিও একথাই ভাবছি,' কিশোর বললো।

ভাঁড়ারের দায়িত্ব নিয়েছে রবিন। বললো, 'রুটি, মাখন আর সামান্য পনির হলেই চলবে। কি বলো? আর গোটা দুই টম্যাটো। কিছু জাম, আর সেই সাথে এক গ্লাস করে বরফ দেয়া দুধ হলে...'

'চমৎকার হয়!' রবিনের কথাটা শেষ করে দিলো মুসা। হাত তালি দিয়ে বললো, 'জবাব নেই!'

'বরফ পাবে কোথায়?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

'তাই তো,' একমুহূর্ত ভাবলো রবিন। 'চিন্তা নেই,' তুড়ি বাজালো সে। 'ঝর্নার পানি যেরকম ঠাণ্ডা, তাতে বোতল চুবিয়ে রাখলেই বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে দুধ। পানি এমন ঠাণ্ডার ঠাণ্ডা, মনে হয় ফ্রিজ থেকে বের করা হয়েছে।'

হালকা খাওয়া। তাড়াতাড়িই সেরে ফেললো ওরা। তার পর হলুদ ফুল ফুটে থাকা একটা বড় ঝোপ বেছে নিয়ে তার পাশে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো।

শোয়ার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়লো মুসা। কিশোর ঘুমালো তারপর। রবিন আর জিনা শুয়ে শুয়ে কথা বললো কিছুক্ষণ, ওদেরকে সঙ্গ দিলো রাফিয়ান।

জিনা ঘুমালো। সারাদিন এতো পথ দৌড়ে এসে রাফিয়ান খুব ক্লান্ত। সেও ঘুমালো। রবিন জেগে রইলো আরও কিছুক্ষণ। অনেক তারাই ফুটেছে আকাশে। তবে তার মাঝে ঝকঝক করছে মস্ত একটা তারা, চট করে চোখে পড়ে। দেখছে আর ভাবছে রবিন, 'আহা, পৃথিবীটা কি সুন্দর এখানে! এরকম একটা জায়গায় যদি চিরটাকাল বাস করা যেতো...'

আকাশে তারার মেলা, নিচে নিঝুম ধরণী। সব কিছু নীরব, শুধু ঝর্নার একটানা বয়ে চলার কুলকুল ছাড়া। মাঝে মাঝে দূরের খামারবাড়ি থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ডাক, বোধহয় ডবি। তারপর বাতাস যখন স্তব্ধ হয়ে গেল, সেই ডাকও শোনা গেল না আর।

কিছুক্ষণ ঘুমানোর পরই জেগে গেল রাফি। একটা কান খাড়া করলো। মৃদু একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে, মাথার ওপরে। একটা চোখ মেললো। কালো একটা বাদুড়। শূন্যে পাক খেয়ে খেয়ে নিশাচর পোকা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আবার ঘুমিয়ে পড়লো সে।

হঠাৎ জোরালো একটা আওয়াজে সবারই ঘুম ভেঙে গেল। লাফিয়ে উঠে বসলো সবাই। নীরবতার মাঝে আওয়াজটা বড় বেশি হয়ে কানে বাজছে।

'কী?' জিনার প্রশ্ন।

'এরোপ্লেন,' জবাব দিলো কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া ছোট বিমানটার দিকে। 'নিশ্চয় ওদিকের এয়ারফীল্ড থেকে এসেছে।...ক'টা বাজে? আরিব্বাবা, ন'টা পাঁচ! বারো ঘণ্টা ঘুমালাম!'

'বাজুকগে,' বলে আবার গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়লো মুসা। চোখ বন্ধ করে বললো, 'আমি আরো ঘুমাবো।'

'এই ওঠো, ওঠো,' জোরে জোরে ঠেলা দিলো তাকে কিশোর। 'এলাকাটা ঘুরে দেখা দরকার। প্রজাপতির খামার দেখবে না?'

'ভুলেই গিয়েছিলাম,' উঠে বসলো আবার মুসা।

ঝর্না থেকে হাতমুখ ধুয়ে এলো সবাই। নাস্তা তৈরি করতে বসলো রবিন। তাকে সাহায্য করলো জিনা।

পরিষ্কার নীল আকাশ, ঝলমলে রোদ। ফুরফুরে হাওয়া বইছে। ঝোপের পাশে বসে বাতাস বাঁচিয়ে আগুন জ্বাললো রবিন। ডিম সেদ্ধ করলো। রুটি কেটে তাতে মাখন মাখালো জিনা। টুকরো করে টম্যাটো কেটে তাতে লবণ আর মশলা মাখালো। ঝর্নার পানিতে চুবিয়ে রাখা কয়েকটা দুধের বোতল গিয়ে নিয়ে এলো কিশোর আর মুসা।

সাধারণ খাবার। কিন্তু এই পরিবেশে বসে এসবই অমৃতের মতো লাগলো

ওদের।

খাওয়ার মাঝামাঝি সময়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করলো রাফি। ঘনঘন লেজ নাড়ছে। সবাই আন্দাজ করলো, বোধহয় জনি আসছে। হ্যাঁ, সে-ই, কারণ রাফিয়ানের ডাকের জবাবে সাড়া দিলো ডবি। একটু পরেই দেখা গেল তাকে। পাহাড়ের মোড় ঘুরে বেরিয়ে এলো। কাছে এসে লম্বা জিভ বের করে বসলো।

স্বাগত জানাতে তার গা চেটে দিলো রাফিয়ান।

জনি এলো। 'ও, নাস্তা করছো! এতোক্ষণে? ওদিকে কতো কাজ করে এলাম আমি। সেই ছ'টা থেকে শুরু করেছি। গরু দোয়ালাম, গোয়াল সাফ করলাম, হাঁস-মুরগীগুলোকে খাবার দিলাম, খুপরী থেকে ডিম বের করলাম।'

'এখানে এসেই পুরোদস্তুর খামারওয়ালা বনে গেছো দেখছি,' হেসে ঠাট্টা করলো মুসা।

হাতের ঝুড়িটা নামিয়ে রাখলো জনি। 'দুধ, রুটি আর ডিম পাঠিয়ে দিলো মা। বাসায় বানানো কেকও দিয়েছে।'

'অনেক ধন্যবাদ তাঁকে। তোমাকেও।' কিশোর বললো। 'কিন্তু জনি, তাঁবু আর জিনিসপত্র ধার দিয়ে এমনিতেই অনেক সাহায্য করেছো, ঋণী করে ফেলেছো। ভাই, কিছু মনে করো না, খাবারের দামটা অন্তত দিতে দাও।'

'মা নেবে না। বললেই রাগ করবে।'

'কিন্তু আমরাই বা তোমাদের কাছ থেকে পয়সা ছাড়া কতো নেবো?' রবিন বললো।

'নিতে খারাপ লাগবে,' বললো মুসা। 'বুঝতে পারছো না...'

'পারছি। কিন্তু মাকে আমি বলতে পারবো না,' জনি হাতজোড় করলো। 'আমি মাপ চাই। পারলে তোমরা দাও গিয়ে।'

'মুশকিলই হলো দেখছি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর।

'এক কাজ করা যায়,' প্রস্তাব দিলো জিনা। যতোবার খাবার আনবে, ততোবার কিছু কিছু করে পয়সা দেবো আমরা তোমার হাতে। তুমি সেগুলো নিয়ে রেখে দেবে একটা বাক্সে। তারপর আমরা চলে যাবার দিন, কিংবা পরে উপহার কিনে তাঁকে দেবে। আমাদের তরফ থেকে। তাহলে আর তিনি মাইন্ড করতে পারবেন না। কি, ঠিক আছে?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলো জনি। 'হুঁ, তা দেয়া যায়। তবে তোমরা পয়সা না দিলেই আমরা খুশি হতাম। যাকগে, এখন এগুলো তোমাদের ভাঁড়ারে তুলে রাখো তো।'

খাবার রেখে আসা হলে কিছু টাকা বের করে জনির হাতে দিয়ে কিশোর

বললো, 'কালকের আর আজকের খাবারের দাম।'

টাকাটা পকেটে রেখে দিয়ে জনি বললো, 'তা আজ কি করবে ঠিক করেছো কিছু? প্রজাপতির খামার দেখতে যাবে, না আমাদের খামার?'

'তোমাদের খামারে তো গেছিই কাল একবার, পরে যেতে পারবো যখন খুশি,' কিশোর বললো। অন্যদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এই, আজ কি করা যায় বলো তো? এমন ঝলমলে রোদ ফেলে কালো গুহাগুলোতে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। গুহায় নাহয় আরেকদিন ঢোকা যাবে, কি বলো?'

কেউ জবাব দেয়ার আগেই হঠাৎ সমস্বরে চেঁচাতে শুরু করলো রাফি আর ডবি। একই দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বড় একটা ঝোপের দিকে।

'কে এলো?' জিনা বললো। 'এই রাফি, দেখ তো কে?'

ছুটে গেল রাফিয়ান আর ডবি। একটা বিস্মিত কণ্ঠ কানে এলো। 'এই যে ডবি? এখানে এসে উঠেছিস কেন? তোর বন্ধুটি কে?'

'মিস্টার ডাউসন,' জনি জানালো। 'প্রজাপতির খামারের এক মালিক। জাল নিয়ে প্রায়ই আসে এখানে, প্রজাপতি ধরতে।'

ঝোপ ঘুরে বেরিয়ে এলেন একজন মানুষ। আলুথালু পোশাক, চশমাটা বারবার নাকের ওপর থেকে পিছলে পড়তে চায়। চুল-দাড়িতে কতোদিন নাপিতের কাঁচি লাগেনি কে জানে। হাতে একটা প্রজাপতি ধরার জাল। ছেলেমেয়েদের দেখে থমকে দাঁড়ালেন। 'হাল্লো! জনি, ওরা কারা?'

'আমার বন্ধু, মিস্টার ডাউসন। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, এ-হলো জর্জিনা পারকার, বিখ্যাত বিজ্ঞানী মিস্টার জোনাথন পারকারের মেয়ে। ও কিশোর পাশা, বাংলাদেশী। ওর চাচা রকি বীচের বিরাট এক স্যালভিজ ইয়ার্ডের মালিক। ওর নাম মুসা আমান, আফ্রিকান অরিজিন, এখন রকি বীচে থাকে। বাবা উঁচুদরের সিনেমা টেকনিশিয়ান। আর এ-হলোগে রবিন মিলফোর্ড, আইরিশ, বাবা বড় সাংবাদিক। আর এই মিয়া হলো আমাদের রাফিয়ান, ওরফে রাফি, জিনার প্রিয় কুকুর।'

'হ্যাঁ। বোঝা যাচ্ছে, আমাদেরও প্রিয় হয়ে উঠবে,' মাথা নেড়ে এগিয়ে এলেন মিস্টার ডাউসন। কাঁধের ওপর তুলে রেখেছেন লাঠিতে বাঁধা প্রজাপতির জাল। চশমার কাঁচের ওপাশে চোখ দুটো উজ্জ্বল। 'তিন কিশোর, এক কিশোরী। চমৎকার। তা বাপুরা নোংরা করে দিয়ে যাবে না তো এলাকাটাকে? দাবানল লাগিয়ে দেবে না তো?'

'কল্পনাই করতে পারি না ওকথা,' হেসে বললো জিনা। 'মিস্টার ডাউসন, আপনার প্রজাপতির খামারটা দেখাতে নিয়ে যাবেন আমাদের? খুব দেখতে ইচ্ছে

করছে।'

'নিশ্চয়ই নেবো,' আরও উজ্জ্বল হলো ডাউসনের চোখ। 'দেখানোর সুযোগই পাই না কাউকে। এদিকে বড় একটা আসে না কেউ। এসো, এদিক দিয়ে।'

তিন

সরু একটা পাহাড়ী পথ ধরে ওদেরকে নিয়ে চললেন ডাউসন। এতো জঙ্গল হয়ে আছে, পথটা প্রায় চোখেই পড়ে না। মাঝামাঝি আসতেই শোনা গেল একটা ভেড়ার বাচ্চার ডাক, পরক্ষণেই কথা বলে উঠলো একটা কচিকণ্ঠ; 'ভাইয়া, ভাইয়া, আমি এখানে। আমাকে নিয়ে যাবি?'

ল্যারি আর টোগো। প্রায় একই রকম করে লাফাতে লাফাতে এলো। ছুটে গিয়ে ভেড়ার বাচ্চাটার গা শুঁকলো রাফি, যেন ওটা কোনো ধরনের আজব কুকুরের বাচ্চা।

'এখানে কি?' কড়া গলায় বললো জনি। 'বাড়ি থেকে এতোদূর এসেছো! কতোদিন না মানা করা হয়েছে? দেখো, একদিন ঠিক হারিয়ে যাবে।'

'আমি আসতে চাইনি তো,' বড় বড় বাদামী চোখ দুটো ভাইয়ের দিকে মেলে কৈফিয়তের সুরে বললো ল্যারি। 'টোগো আসতে চাইলো, তাই।'

'তুমিই এসেছো ওকে নিয়ে। আমি কোথায় যাই দেখার জন্যে।'

'না না, টোগোই আসতে চাইলো!' কেঁদে ফেলবে যেন ল্যারি। 'আমি মানা করেছিলাম, পালিয়ে চলে এলো।'

'বেশি মিথ্যে কথা শিখে গেছো। কিছু হলেই টোগোর ওপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজে বেঁচে যেতে চাও। বাবা শুনলে দেখো কি করে। এখন এসেই যখন পড়েছো, চলো। প্রজাপতির খামারে যাচ্ছি আমরা। এরপর যদি কোথাও যেতে চায় টোগো, ওকে একাই যেতে দেবে। গিয়ে মরুকগে। জ্বালিয়ে মারলো ওই ভেড়ার বাচ্চাটা!'

'না না, আর যেতে চাইবে না,' বলতে বলতে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলো ল্যারি। 'আর নামতেই দেবো না।' কিন্তু খানিক পরেই আবার নামিয়ে দিতে বাধ্য হলো। এই মুহূর্তে কোল পছন্দ না হওয়ায় এতো জোরে আচমকা চেঁচিয়ে উঠলো, চমকে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠলো রাফি আর ডবি। এরপর থেকে না নামানো পর্যন্ত চেঁচিয়েই চললো বাচ্চাটা।

'হুঁম্‌ম্‌,' ফিরে চেয়ে বললেন ডাউসন, 'ভালো দর্শক জোগাড় হয়েছে আজকে।'

'কুকুর-ভেড়া দেখলে কি ভয় পায় আপনার প্রজাপতিরা?' তাড়াতাড়ি তাঁর পাশে চলে গেল ল্যারি। 'বলেন তো ওগুলোকে এখানেই রেখে যাই?'

'গাধার মতো কথা বলে,' পেছন থেকে বললো তার ভাই। 'প্রজাপতির কি...।' কথা শেষ না করেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো জনি। হ্যাঁচকা টান মারলো ডাউসনের হাত ধরে। 'ওই যে, স্যার, একটা প্রজাপতি! ধরবেন না!'

'না,' শান্তকণ্ঠে বললো ডাউসন। 'ওটা মিডো-ব্রাউন। অতি সাধারণ। কি ব্যাপার, ইস্কুলে কিছু শেখায় না নাকি? এরকম একটা প্রজাপতিও চিনতে পারো না!'

'না, শেখায় তো না,' হেসে বললো জনি। 'আপনি আমাদের ইস্কুলের টীচার হলে খুব ভালো হতো। অনেক কিছু শিখতে পারতাম। তবে জেনারেল নলেজ বইতে দেখেছি অনেক রকম প্রজাপতির নাম। ক্যাবেজ বাটারফ্লাই, কলিফ্লাওয়ার মথ, রেড অ্যাডমিরাল, ব্লু ক্যাপটেন, অসট্রিচ মথ...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করলো, 'মিস্টার ডাউসন, এখানে দুর্লভ প্রজাপতি আছে কিছু?'

'নিশ্চয়ই আছে,' বললেন প্রজাপতি বিশেষজ্ঞ। 'আর সাধারণ প্রজাপতিও আছে প্রচুর। যতো খুশি ধরে নিয়ে গিয়ে বংশ বাড়াই। একটা প্রজাপতি মানেই শত শত ডিম। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে বিক্রি করি আমরা।'

হঠাৎ একদিকে ছুটলেন তিনি। আরেকটু হলেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন জিনাকে। 'সরি!' বললেন বটে, কিন্তু ফিরেও তাকালেন না তার দিকে। 'ওই যে একটা ব্রাউন অ্যারগাস। চমৎকার নমুনা! এ-বছর এই প্রথম দেখলাম। সরো, সরো তোমরা, সরে যাও। কথা বলবে না।'

চুপ করে আছে ছেলেমেয়েরা। এমনকি জানোয়ারগুলোও নীরব। পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছেন ডাউসন একটা গাছের দিকে। ফুলের ওপর বসা ছোট কালচে বাদামী রঙের একটা প্রজাপতির ওপর চোখ। কাছে গিয়ে হঠাৎ ওপর থেকে নিচের দিকে নামিয়ে আনলেন জালটা। ধরা পড়লো ব্রাউন অ্যারগাস। ডানা নেড়ে ফড়ফড় করতে থাকা প্রজাপতিটার পাখা দু'আঙুলে টিপে ধরে সবাইকে দেখিয়ে বললেন, 'এটা মাদী প্রজাপতি। গরমের সময় সচরাচর যেসব নীল প্রজাপতি দেখো, এটা তাদেরই একটা প্রজাপতি। অনেক ডিম পাড়বে এই প্রজাপতিটা, অনেক শুঁয়াপোকার জন্ম দেবে, নাদুস-নুদুস পোকা...'

'নীল প্রজাপতি বললেন,' আগ্রহী চোখে ব্রাউন অ্যারগাসের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'কিন্তু এটা তো নীল নয়। কালচে বাদামী। ডানায় কমলা রঙের ফোঁটা...'

'তাতে কি? রঙে কি এসে যায়? আমি বলছি এটা নীল প্রজাপতির বংশধর।' কাঁধে ঝোলানো একটা টিনের বাক্সে প্রজাপতিটা ভরে রাখলেন ডাউসন। 'বোধহয় ওদিক থেকে এসেছে, তৃণভূমির দিক থেকে,' হাত তুলে উপত্যকা দেখালেন তিনি।

'মিস্টার ডাউসন,' জরুরী গলায় বললো মুসা। 'সামনের ডানা কালচে সবুজ, তাতে লাল ফোঁটা। আর পেছনের ডানা লাল, তাতে সবুজ বর্ডার। জলদি আসুন! ধরতে পারলে লাভ হবে আপনার।'

'ওটা প্রজাপতি নয়,' রবিন বললো।

'ঠিকই বলেছো,' প্রশংসার দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকালেন ডাউসন। জাল তুললেন পতঙ্গটাকে ধরার জন্যে। 'এটা মথ।' আটকে ফেললেন ওটাকে।

'কিন্তু মথ তো দিনের বেলা ওড়ে না,' তর্ক শুরু করলো মুসা। 'শুধু রাতে ওড়ে।'

'কিচ্ছু জানে না!' ভারি লেন্সের ভেতর দিয়ে মুসার দিকে তাকালেন ডাউসন। 'আজকালকার ছেলেমেয়েগুলোর হলো কি? অথচ আমাদের সময়ে প্রতিটি ছেলেমেয়েই জানতাম কোনটা দিনের মথ, আর কোনটা রাতের।'

'কিন্তু...,' বলতে গিয়ে ডাউসনের কড়া চাহনির দিকে তাকিয়ে থেমে গেল মুসা।

'এটার নাম সিক্স-স্পট বারনেট ডে-ফ্লাইং মথ,' বাচ্চা ছেলেকে যেন বোঝাচ্ছেন, এমনিভাবে ধীরে, থেমে থেমে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করলেন ডাউসন। 'রোদের মধ্যে উড়ে বেড়াতে খুব ভালোবাসে এরা। আর তর্ক করবে না আমার সঙ্গে। মূর্খ ছেলেকে ভালো লাগে না আমার।'

মুসার কাঁচুমাচু মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো অন্যেরা। তবে অবশ্যই নীরবে, এবং ডাউসনের অলক্ষ্যে।

তবে তাদের দিকে চোখ নেই তাঁর। মথটাকে বাক্সে ভরতে ব্যস্ত। বললেন, 'এরকম মথ আরও দরকার আমার। দেখলেই বলবে। মনে রেখো, এগুলো আরও বড় হয়। বড় দেখলেও বলবে।'

ব্যস, আর কিছু বলতে হলো না। সবাই মথ খুঁজতে আরম্ভ করলো ঝোপেঝাড়ে। প্রজাপতি ধরা খুব ভালো লাগছে ওদের। রাফি আর ডবিও বেশ আগ্রহী। এখানে ওখানে শুঁকে বেড়াতে লাগলো। কিছুই না পেয়ে আবার আগের জায়গায় এসে জমায়েত হলো সকলে। তারপর আবার এগোনোর পালা।

এমনি করে পথে পথে থেমে, প্রজাপতি ধরে এগোতে অনেক সময় লাগলো। যতোটা লাগার কথা, তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগিয়ে, অনেক দেরিতে এসে

প্রজাপতির খামারে পৌঁছলো দলটা।

'এই কাঁচের ঘরেই আপনার প্রজাপতি রাখেন?' জানতে চাইলো কিশোর।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন ডাউসন। 'এসো। সব দেখাচ্ছি। কিভাবে কি করি আমি আর আমার বন্ধু ডরি। আজ অবশ্য ওর দেখা পাবে না, নেই এখানে।'

জায়গাটা অদ্ভুত লাগলো দর্শকদের কাছে। কটেজটা দেখে মনে হয় যে কোনো সময় ধসে পড়তে পারে। দুটো জানালা ভাঙা, ছাতের কয়েকটা টালি গায়েব। কিন্তু কাঁচের ঘরগুলো বেশ সুন্দর, সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়েছে। প্রতিটি কাঁচ ঝকঝকে পরিষ্কার। নিজেদের চেয়ে প্রজাপতি আর মথের যত্ন অনেক বেশি নেন প্রজাপতি মানবেরা, বোঝা গেল।

'এখানে কি শুধু আপনারা দু'জনই থাকেন?' জিজ্ঞেস করলো রবিন। এরকম একটা জায়গায় দু'জন মানুষ কি করে থাকে ভাবতে অবাক লাগছে তার। 'একা লাগে না?'

'না, একা লাগবে কেন?' রবিনের প্রশ্নটাই যেন অবাক করলো ডাউসনকে। 'তাছাড়া মিসেস ডেনভার আছে, আমাদের কাজকর্ম করে দেয়। তার ছেলে এসে মেরামত-টেরামত কিছু লাগলে করে দেয়। প্রজাপতির ঘরগুলো পরিষ্কার রাখে। মিসেস ডেনভার কীট-পতঙ্গ একদম পছন্দ করে না, ঘরগুলোর কাছেই আসে না সে। কাজেই তার ছেলেকেই সব করতে হয়।'

কটেজের জানালা দিয়ে উঁকি দিলো এক বৃদ্ধা। জিনার মনে হলো, বুড়ি তো নয়, রূপকথার বইয়ের পাতা থেকে নেমে আসা ডাইনী। ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকালো মুসা। ভূত আর ডাইনী-পেত্নীকে যে সে ভয় পায়, একথা জানা আছে জনির। হেসে বললো, 'ভয় নেই, মানুষই, ভূতপ্রেত নয়। মহিলা ভালো। আমাদের রাঁধুনী মেয়েটা প্রায়ই দুধ আর ডিম দিতে আসে এখানে। সে গিয়ে সব বলে। একটা দাঁতও নেই মহিলার। ফলে চেহারাটা ওরকম বিকট লাগে। ডাইনী মনে হয়।'

'তোমার ভূতের ভয়টা আর দূর করতে পারলে না,' রবিন বললো মুসাকে। 'তোমরা ডাইনীর আলোচনা নিয়েই থাকো, আমি প্রজাপতি দেখতে গেলাম।'

ছোট ছোট কাঁচের বাক্সের ভেতরে শত শত প্রজাপতি উড়ছে। কাঁচের ঘরের মধ্যে নানা রকম গাছ লাগিয়ে ঝোপঝাড় তৈরি করা হয়েছে, বাইরে যেরকম ঝোপে ঝাড়ে থাকে প্রজাপতি, ঠিক সেরকম পরিবেশ।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'কতো শুঁয়াপোকা দেখেছো? পাতা খেয়ে তো সব সাফ করে ফেললো।'

'হ্যাঁ, রাক্ষসের মতো খায় ওরা,' ডাউসন বললেন।

অনেক ধরনের শুঁয়াপোকা দেখা গেল। কোনোটা ভীষণ কুৎসিত, দেখলেই গায়ে কাঁটা দেয়, কোনোটা খুব সুন্দর, সারা শরীরে রঙের বাহার। যেমন, গাঢ় সবুজ পোকা, লাল আর হলুদ ফোঁটা। আরেক ধরনের আছে, বেশ বড়, সবুজের ওপর লাল আর কালো ডোরা, লেজের কাছে বাঁকা শিঙের মতো। দেখতে যেমন বিকট, তেমনি সুন্দর।'

'প্রাইভেট-হক মথের শুঁয়াপোকা,' ডাউসন জানালেন।

'এর নাম প্রাইভেট-হক কেন?' রবিন জিজ্ঞেস করলো ভয়ে ভয়ে। কিচ্ছু জানো না বলে যদি আবার গাল দিয়ে ওঠেন ডাউসন?

কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে হাসলেন প্রজাপতি মানব। বোধহয় তিনি মনে করেছেন, খুব বুদ্ধিমান ছেলেটা। 'কেন, হক মথ উড়তে দেখোনি কখনও? ও, দেখোনি। অদ্ভুত ভঙ্গিতে ওড়ে। অনেকটা ওই হক…হক চেনো তো?'

'চিনি। বাজপাখি।'

'গুড। ওই বাজপাখির মতো।'

'কিন্তু প্রাইভেট কেন? একা একা থাকতে পছন্দ করে বুঝি?'

'ঠিক ধরেছো। বুদ্ধিমান ছেলে। তবে এখানে একা থাকার সুযোগ পায় না। অন্যদের সঙ্গে একসাথেই বেড়ে উঠতে হয়।'

প্রজাপতির খামার দেখতে ভালোই লাগছে ওদের।

গুটি কেটে প্রজাপতি বেরিয়ে আসতে দেখে বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠলো মুসার। 'আশ্চর্য! এ-কি যাদু নাকি!'

'আমার কাছেও অনেক সময় যাদুই মনে হয়,' হেসে বললেন ডাউসন। 'ডিম থেকে কিলবিলে শুঁয়াপোকা বেরোনো, সেই পোকার গুটিতে আশ্রয় নেয়া, তারপর সেই গুটি কেটে ডানাওয়ালা চমৎকার রঙিন প্রজাপতি বেরিয়ে আসতে দেখলে অবাক না হয়ে উপায় নেই।'

'কিন্তু ভীষণ গরম এখানে, মিস্টার ডাউসন,' একজিনিস আর বেশিক্ষণ দেখতে ভালো লাগছে না কিশোরের। 'ওদিকে বোধহয় কিছুটা ঠাণ্ডা হবে। ওদিকে গিয়ে বসি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও,' বললেন ডাউসন। 'আমার কাজ আছে। দেখতে ইচ্ছে করলে আবার এসো।'

ওখান থেকে সরে একটা ছায়ামতো জায়গায় চলে এলো ওরা। হঠাৎ পেছনে ভাঙা গলায় কথা বলে উঠলো কেউ, 'যাও, এখানে কি? চলে যাও।'

চার

গরগর করে উঠলো রাফি আর ডবি। পাঁই করে ঘুরলো সবাই। ডাইনীর মতো দেখতে মহিলাটা দাঁড়িয়ে আছে। মুখের ওপর এসে পড়েছে তার পাটের আঁশের মতো ফিনফিনে চুল।

'কি ব্যাপার, মিসেস ডেনভার?' ভদ্রকণ্ঠে বললো কিশোর। 'আমরা খামার দেখতে এসেছি। কিছু নষ্ট করবো না।'

'করো আর না করো, সেটা ব্যাপার না,' দাঁত নেই বলে সমস্ত কথা জড়িয়ে যাচ্ছে মহিলার, স্পষ্ট বোঝা যায় না। 'বাইরের কেউ আসুক এটা আমার ছেলে পছন্দ করে না।'

'কিন্তু এটা নিশ্চয় আপনার ছেলের জায়গা নয়,' অবাক হয়েছে মুসা। 'মিস্টার ডাউসন আর তাঁর বন্ধু...'

'তোমাদেরকে চলে যেতে বলা হয়েছে, চলে যাও, ব্যস,' ওদের দিকে মুঠো তুলে ঝাঁকালো বৃদ্ধা। 'আমার ছেলে পছন্দ করে না।'

এভাবে কথা বলা রাফিরও পছন্দ হলো না। বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠলো সে। তার দিকে আঙুল তুলে গড়গড় করে কি সব বললো মহিলা, প্রায় কিছুই বোঝা গেল না। জিনার মনে হলো, মন্ত্র পড়লো বুড়ি! তাকে আরও অবাক করে দিয়ে ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল রাফি, বসে পড়লো তার পায়ের কাছে।

রেগে উঠতে যাচ্ছিলো জিনা, তার হাত ধরে ইশারায় কথা বলতে নিষেধ করলো জনি। বৃদ্ধার দিকে ফিরে নরম গলায় বললো, 'আপনার ছেলেই তো থাকে না এখানে। কে এলো, না এলো, তাতে তার কি? আপনাকে এভাবে লোক তাড়াতে বলে গিয়েছে কেন?'

চোখে পানি টলমল করতে লাগলো মহিলার। হাড়সর্বস্ব এক হাতের আঙুল আরেক হাতের আঙুলের খাঁজে ঢুকিয়ে চুপ করে রইলো এক মুহূর্ত। ধরা গলায় বললো, 'ওর কথা না শুনলে ও যে আমাকে মারে! হাত মুচড়ে দেয়! আমার ছেলে লোক ভালো না, খুব খারাপ। চলে যাও। তোমাদেরকে দেখলে রেগে যাবে। তোমাদেরও মারবে।'

মহিলার কাছ থেকে সরে এলো ওরা।

জনি বললো, 'বুড়িটা পাগল। আমাদের রাঁধুনী বলে ওর ছেলে খারাপ নয়, অথচ বুড়ি বলে বেড়ায় খারাপ। মেরামতের কাজ খুব ভালো পারে তার ছেলে।

মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসে তো, দেখি। ছাত আর বাড়িঘরের অন্যান্য মেরামতি কাজে ওস্তাদ। আমার মনে হয় বুড়ি বাড়িয়ে বলছে, তবে তার ছেলে খুব একটা ভালো লোকও নয়।'

'মিস্টার ডাউসনের বন্ধুটি কেমন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'ডরি, যাকে দেখলাম না।'

'জানি না। কখনও দেখিনি। বেশির ভাগ সময়ই বাইরে বাইরে থাকে। ব্যবসার দিকটা বোধহয় ও দেখে। এই ডিম, শুঁয়াপোকা, প্রজাপতি বিক্রির ব্যাপারটা।'

'খামারটা আরেকবার দেখতে ইচ্ছে করছে আমার,' মুসা বললো। 'কিন্তু মিস্টার ডাউসন যেরকম করে তাকান, বুকের মধ্যে কাঁপ ধরে যায়। এতো কড়া চোখে চশমার কি দরকার? এমনিই তো দেখতে পারার কথা।'

'মাঝে মাঝে তুমি যে কি ছেলেমানুষের মতো কথা বলো না,' হেসে বললো রবিন। 'চোখের কড়া দৃষ্টির সঙ্গে পাওয়ারের কি সম্পর্ক?'

'না, নেই। এমনি বললাম আরকি।'

'আমি আর যেতে চাই না ওখানে,' জিনা বললো। 'বুড়িটা আস্ত ডাইনী। রাফিকে কিভাবে বশ করে ফেললো দেখলে?...তো এখন কোথায় যাবো?'

'ক্যাম্পে,' কিশোর বললো। 'খিদে লেগেছে। জনি, তুমি আমাদের সাথে যাবে, না বাড়িতে কাজ আছে?'

'না, সব সেরে এসেছি। চলো যাই। তোমাদের সঙ্গে বসে খেতে ভালোই লাগবে।'

'ভাইয়া, আমিও যাবো,' বায়না ধরলো ল্যারি। তার কোলে এখন চুপচাপ রয়েছে ভেড়ার বাচ্চাটা।

'না,' জনি বললো। 'মা চিন্তা করবে। তুমি বাড়ি ফিরে যাবে। চলো, আরেকটু এগিয়ে রাস্তা চিনিয়ে দেবো।'

হ্যাঁ-না আর কিছু বললো না ল্যারি। মুখ গোমড়া করে রাখলো।

যাওয়ার সময় যতোটা সময় লেগেছিলো, ফিরতে লাগলো তার চেয়ে অনেক কম। জিনিসপত্র যেখানে যা রেখে গিয়েছিলো, ঠিক তেমনি রয়েছে। ভাঁড়ারের খাবারেও কেউ হাত দেয়নি।

হাসি-ঠাট্টার মাঝে খাওয়া শেষ করলো ওরা।

হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়লো মুসা। বললো, 'সারাটা বিকেলই তো পড়ে আছে। এরপর কি করবো?'

'গোসল করতে পারলে ভালো হতো,' জিনা বললো। 'যা গরম। বাড়িতে হলে

তো এতোক্ষণে সাগরে থাকতাম।'

'গোসল করতে চাইলে অবশ্য এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি,' জনি বললো। 'বড় একটা পুকুর আছে।'

'পুকুর?' আগ্রহে লাফিয়ে উঠে বসলো মুসা। 'কোথায়?'

'ওই যে এয়ারফীল্ড দেখছো,' হাত তুলে দেখালো জনি, 'ওখানে। এই ঝর্নার পানি কোথায় গিয়ে পড়েছে ভেবেছো একবারও? পাহাড়ের মোড় ঘুরে, উপত্যকা ধরে এগিয়ে গেছে, পথে ছোট ছোট খাঁড়ি তৈরি করেছে কয়েকটা। শেষে গিয়ে পড়েছে ওই পুকুরে। পুকুরটা প্রাকৃতিক, এই ঝর্নার পানি পড়ে পড়েই সৃষ্টি হয়েছে কিনা কে জানে! খুব ঠাণ্ডা পানি। প্রায়ই গিয়ে ওখানে গোসল করি আমি।'

'শুনে তো ভালোই মনে হচ্ছে,' কিশোর বললো। 'চলো না এখনই যাই।'

'এখন?' রবিন বললো। 'এখন তো কাজই সারিনি।' খাবারের বাক্স, টিন গোছাচ্ছে সে আর জিনা। ঠিকঠাক মতো নিয়ে গিয়ে আবার ভাঁড়ারে ভরে রাখছে।

'অসুবিধে কি? আমরা যাই। তোমরা কাজ সেরে এসো।'

'ঠিক আছে,' জিনা বললো, 'যাও।'

এয়ারফীল্ডের দিকে রওনা হলো কিশোর, মুসা আর জনি। সকালে একটা বিমান দেখেছিলো, তারপর আর একটাও দেখা যায়নি। খুব নীরব এয়ারফীল্ড, ভাবলো কিশোর। সেকথা বললো জনিকে।

'নীরব বলছো তো,' জনি বললো হেসে। 'দাঁড়াও, আগে নতুন ফাইটারগুলোর পরীক্ষা শুরু হোক, তারপর বুঝবে। শব্দের জ্বালায় টেকা যাবে না। আমার খালাতো ভাই বলেছে শীঘ্রি পরীক্ষা শুরু হবে।'

'ফাইটার এনে পরীক্ষা করবে?' মুসা বললো। 'তাহলে তো কাম সারা। কান ঝালাপালা করে দেবে। যা আওয়াজ।'

'তোমার খালাতো ভাই আছে যখন,' কিশোর বললো, 'তাকে ধরে একদিন গিয়ে এয়ারফীল্ডটাও দেখে আসতে পারবো। পুরানো বিমান ঘাঁটি দেখার খুব শখ আমার।'

'আমারও,' পেছন থেকে বলে উঠলো জিনা। কাজ সেরে চলে এসেছে।

এক জায়গায় এসে জনি বললো, 'এখান থেকে আমাদের বাড়ি বেশি দূরে না। গিয়ে সুইম-স্যুট নিয়ে আসি। যাবো আর আসবো। এই ডবি, দৌড় দে।'

'আমরা কোন পথে যাবো?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'সোজা চলে যাও। ওই যে দূরে বড় পাইন গাছটা দেখছো,' জনি বললো, 'ওটার দিকে হাঁটো। আমি এই এলাম বলে।'

ডবিকে নিয়ে দৌড় দিলো জনি। অন্যেরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো পাইন গাছটার কাছে। বেশ ভালোই দৌড়ায় জনি, তাড়াতাড়িই ফিরে এলো কাঁধে সুইম-স্যুট নিয়ে। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে।

পাইন গাছটার কাছে পৌঁছলো ওরা।

'ওই যে দেখো,' জনি বললো, 'পুকুর।'

পানির রঙ দেখেই বোঝা গেল পুকুরটা গভীর। ঘন নীল, ঠাণ্ডা, কাঁচের মতো মসৃণ পানির উপরিভাগ। একপাড়ে ঘন গাছের সারি। একেবারে পানির কিনারে নেমে গেছে একধরনের ছোট জাতের উদ্ভিদ।

এগিয়ে গেল দলটা। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো গাছের গায়ে লাগানো একটা নোটিশ দেখে। লেখা রয়েছেঃ

কীপ আউট

ডেনজার

গভার্নমেন্ট প্রোপার্টি

'সরে থাকতে বলছে! বিপদ! সরকারি জায়গা!' অবাক হয়ে বললো মুসা। 'এর মানে কি?'

'দূর,' হাত নাড়লো জনি। 'ওই নোটিশকে পাত্তা দিও না। ও কিছু না।'

পাঁচ

'কি বলো?' কথাটা ধরলো কিশোর, 'কিছু না-ই যদি হবে, তাহলে লিখেছে কেন?'

'ওরকম নোটিশ এই এয়ারফীল্ডের আশেপাশে অনেক দেখতে পাবে,' হালকা গলায় বললো জনি। 'বিপদ আছে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়ে সরে থাকতে বলেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা বিপদও দেখিনি আমি। শুধু প্লেন আছে, কামান-বন্দুক-বোমা কিচ্ছু নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাকি অনেক এয়ারফীল্ডের পাশে মাইন পড়ে থাকতে দেখা গেছে, এখানে তা-ও দেখিনি।'

'তাহলে নোটিশ লিখেছে কেন?' মুসাও ধরলো। 'তোমার খালাতো ভাইকে জিজ্ঞেস করলেই পারো। লিখেছে যখন, নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।'

'বললাম তো, নেই,' জোর দিয়ে বললো জনি। 'জন্মের পর থেকেই ওই নোটিশ দেখে আসছি। একসময় হয়তো লাগিয়েছিলো কোনো কারণে, এখন সেই কারণটা আর নেই। এখানে এসে গোসল করি, যা খুশি করি আমরা। কেউ কিছু বলে না।'

বেশ মেনে নিলাম তোমার কথা,' বললো বটে কিশোর, কিন্তু মানতে যে পারেনি সেটা তার স্বরই জানিয়ে দিলো। 'এখানে নোটিশ লাগানোর কোনো কারণ অবশ্য আমিও দেখছি না। কাঁটাতার নেই, বেড়া নেই, কিছুই নেই। শুধু নোটিশ লিখে রাখলেই কি আর লোকে মানবে?'

'ওসব কথা বাদ দিয়ে এখন এসো, পানিতে নামি।'

সুইম-স্যুট পরে ডাইভ দিয়ে পানিতে পড়লো ওরা। যতোটা ভেবেছিলো, তার চেয়ে গভীর। চমৎকার ঠাণ্ডা, এই গরমে বেশ আরামদায়ক। কুকুরদুটোও তীরে থাকলো না, ঝাঁপিয়ে পড়লো পানিতে। মজা পেয়ে দাপাদাপি করতে লাগলো। রাফি তো উত্তেজনায় চেঁচাতেই শুরু করলো।

'এই রাফি, চুপ!' ধমক দিলো জনি।

'কেন, চুপ করবে কেন?' কিছুটা অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলো জিনা।

'এয়ারফীল্ডে কেউ থাকলে শুনতে পাবে।'

'শুনুক না, অসুবিধে কি? তুমি তো বললে নোটিশ এমনি এমনিই লিখেছে।'

আর কিছু বললো না জনি।

রাফির দেখাদেখি কিছুক্ষণ পর ডবিও চেঁচাতে শুরু করলো। আবার ধমক লাগালো জনি, 'এই ডবি, চুপ করলি! মারবো কষে এক থাপ্পড়!'

কিন্তু ডবি চুপ করার আগেই ঘটে গেল আরেক ঘটনা। ধমক দিলো একটা কণ্ঠ, উঁচু গলায় কথা বলা স্বভাব লোকটার, 'এই, হচ্ছে কি! সরকারি এলাকায় অন্যায় ভাবে ঢুকেছো। নোটিশ দেখোনি?'

চিৎকার থামিয়ে দিলো কুকুর দুটো। কে কথা বলে দেখার জন্যে ঘুরে তাকালো সবাই।

এয়ারফোর্সের ইউনিফর্ম পরা একজন লোক, বিশালদেহী, মোটা, লাল মুখ।

'কি হয়েছে?' লোকটার দিকে সাঁতরে এগোলো কিশোর। 'আমরা গোসল করছি। কোনো ক্ষতি করছি না।'

'নোটিশ দেখোনি?' গাছের দিকে হাত তুললো লোকটা।

'দেখেছি। কিন্তু এখানে তো কোনো বিপদ দেখছি না,' নিজেকে লাথি মারতে ইচ্ছে করলো কিশোরের, নোটিশ দেখেও জনির কথা বিশ্বাস করেছে বলে।

'উঠে এসো!' গর্জে উঠলো লোকটা। 'সব্বাই!'

ধীরে ধীরে পানি থেকে উঠে এলো সবাই। কুকুর দুটো উঠে গা ঝাড়া দিয়ে তাকালো লোকটার দিকে।

'এই কুত্তাদুটোকেই ঘেউ ঘেউ করতে শুনেছি তাহলে? তোমরা তো ছোট নও, নোটিশ বোঝার বয়েস হয়েছে। তারপরেও অমান্য করলে কেন?' উপদেশ দিতে

আরম্ভ করলো লোকটা, যা সব চেয়ে বেশি ঘৃণা করে কিশোর। 'চেঁচামেচি শুনে ভাবলাম, কেউ হয়তো বিপদে পড়েছে। তাই দেখতে এসেছি।'

'এখন তো দেখলেন পড়িনি,' মুখ কালো করে বললো জনি।

'পড়নি, কিন্তু পড়তে পারতে। এই ছেলে, তোমাকে আগেও দেখেছি মনে হয়? তুমি আর ওই কুত্তাটাকে? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। হ্যাঙারের ওধার থেকে বেরিয়ে নিষিদ্ধ এলাকা দিয়ে চলেছিলে।'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম, আমার খালাতো ভাই ফ্লাইট-লেফটেন্যান্ট জ্যাক ম্যানরের সঙ্গে দেখা করতে,' কিছুটা ঝাঁঝের সঙ্গেই বললো জনি। 'সেটা কি দোষের নাকি? সেদিনও বলেছি, আজও বলছি, স্পাইং করতে যাইনি। আর করার আছেই বা কি ওখানে? আমি শুধু আমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম।'

'বেশ, আমিও দেখা করবো তার সাথে। দেখা করে বলবো, ভালোমতো ধোলাই দেয় যেন তোমাকে। বড় বেশি ফড়ফড় করো! চোখের মাথা খেয়েছো নাকি? চারদিকে নোটিশ ছড়িয়ে আছে দেখোনি?'

'তারমানে কি তলে তলে জরুরী কিছু ঘটছে?' ফস করে জিজ্ঞেস করে বসলো জনি।

'ঘটলে যেন বলবো তোমাকে!' বিরক্ত কণ্ঠে বললো লোকটা। 'এখানে বিপদের কিছু নেই আমিও জানি। ঝর্নার পানি এসে জমা হয় এই পুকুরে, মাছ-টাছও জিয়ানো নেই যে নষ্ট হবে। তাছাড়া লোকে এখানে পিকনিক করতে এসে জায়গাটাকে সরগরম করে তুললে ভালোই লাগতো, যা নীরব হয়ে থাকে! কিন্তু সেটা করতে দিতে পারি না। আমার ওপর আদেশ রয়েছে কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়া হয়।'

লোকটা ঠিকই বলছে, ভাবলো কিশোর। জনি তর্ক করছে অযথা। নোটিশ অমান্য করে ওরাই বেআইনী কাজ করেছে। উচিত হয়নি। বললো, 'দেখুন, আমরা সত্যি অন্যায় করেছি। গরম লাগছিলো তো, ঠাণ্ডা পানির কথা শুনে লোভ সামলাতে পারিনি। গোসল করতে চলে এসেছি। ঠিক আছে, আর আসবো না।'

কিশোরের দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালো বিমান বাহিনীর গার্ড। হাসি ফুটলো মুখে। 'বুদ্ধিমান ছেলে। এই গরমের দিনে তোমাদের গোসলটা নষ্ট করলাম বলে খারাপই লাগছে আমার। ওই ছেলেটার মাথায় গোলমাল আছে,' জনির দিকে হাত তুললো সে। 'বেশি গোঁয়ার। এতোই যদি গোসলের শখ ছিলো, তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এলে না কেন? তাহলেই তো আমি আর কিছু বলতাম না। আমার জানা থাকতো, এই সময়ে কুকুরের চিৎকার শোনা যাবে, কিছু হৈ-হট্টগোল শুনতে পাবো। দেখতে আসতাম না।'

'থাক, কিছু মনে করবেন না,' কিশোর বললো। 'আর আসব না। তাছাড়া এখানে থাকছিও না আমরা, যে জ্বালাতে আসবো। মাত্র কয়েকটা দিন, বেড়াতে এসেছি।'

'সো লং' জানিয়ে, অনেকটা স্যালুটের ভঙ্গিতে হাত তুলে, মার্চ করে চলে গেল লোকটা।

'ও ব্যাটা এখানে মরতে এলো কেন?' এখনও মেনে নিতে পারছে না জনি। 'আমাদের গোসলটা নষ্ট করলো! গোপন কোনো ব্যাপার যদি না-ই থাকে...'

'আহ্, চুপ করো!' ওকে থামিয়ে দিলো মুসা। কিশোরের মতো সে-ও খুব লজ্জা পেয়েছে। দোষ তো ওদেরই। নোটিশ দেখার পরেও নামলো কেন পানিতে? 'ও কি বলে গেল শুনলে না? ওর ওপর আদেশ রয়েছে। আমাদের মতো তো আর ইস্কুলের ছাত্র নয় যে অফিসিয়াল আদেশকেও কিছু না বলে উড়িয়ে দেবে। সরকারি চাকরি করে। ইউনিফর্মের একটা দাম তো আছে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। গা মুছে চলো এখন তোমাদের বাড়িতে। তোমার মা'র কাছ থেকে কিছু খাবার চেয়ে নেবো। সাঁতার কেটে সব হজম হয়ে গেছে।' পরিস্থিতি সহজ করার জন্যে হাসলো সে।

কিন্তু হাসি ফোটানো গেল না জনির মুখে। একে তো লোকটার ব্যবহার ভালো লাগেনি, তার ওপর বন্ধুদের কাছে লজ্জা পেয়েছে। বড়মুখ করে এনেছিলো। রাগে, ক্ষোভে এখন মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে।

গা মুছে কাপড় বদলাতে বদলাতে জিজ্ঞেস করলো, 'আমার ভাইয়ের কাছ থেকে অনুমতি যদি নিই, আবার আসবে তো?'

'না,' বললো কিশোর। 'তবে তার সাথে দেখা করতে পারলে খুশি হবো।'

'হুঁ!' আবার চুপ হয়ে গেল জনি।

বাড়ির কাছাকাছি আসতে দেখা গেল, ভেড়ার বাচ্চা কোলে নিয়ে প্রায় ছুটে আসছে ল্যারি।

'ওই যে আসছে,' হেসে বললো জিনা। 'ছড়াকার ভুল করেছেন। ওকে নিয়েই বরং ছড়াটা লিখে ফেলা উচিত ছিলোঃ ল্যারি হ্যাড আ লিটল ল্যাম্ব...'

হেসে উঠলো সবাই।

'ছড়াটা আমিও জানি,' হেসে বললো ল্যারি। 'ম্যারি হ্যাড আ লিটল ল্যাম্ব, ওটা তো?' সুর করে দুলে দুলে ছড়া বলতে আরম্ভ করলো সে।

'বাড়ি থেকে আবার বেরিয়েছো?' জনি বললো।

'বা-রে। মা-ই তো তোমাদের ডাকতে বললো। চায়ের সময় হয়েছে...'

'মোটেও ডাকতে পাঠায়নি মা। তুমি নিজেই এসেছো, মা জানে না...'

'না এসে কি করবো? টোগোটা পালালো। ওকে খুঁজতে খুঁজতেই না…'

'আমাদের কাছে চলে এসেছো?' হেসে ফেললো রবিন।

'আমাদের কি দোষ?' বড় বড় মায়াবী চোখ মেলে রবিনের দিকে তাকালো ল্যারি। 'মা বললো চা হয়েছে। ভাবলাম বুঝি তোমাদের ডাকতে বলছে, তাই…'

'চলে এসেছো, এই তো? খুব ভালো করেছো,' আদর করে তার গাল টিপে দিলো জিনা।

খুশি হয়ে উঠলো আবার ল্যারি। ভেড়ার বাচ্চাটাকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'ওকে আদর করলে না? ও মন খারাপ করবে তো।'

হাসতে হাসতে বাচ্চাটার মাথায়ও হাত বুলিয়ে দিলো জিনা। বললো, 'জনি, তুমি খুব ভাগ্যবান। ইস্, আমার যদি এমন একটা ভাই থাকতো!'

হাসি ফুটলো জনির মুখে। খানিক আগের গোমড়া ভাবটা কেটে গেল। ল্যারির হাত ধরলো, 'চল, বাড়ি চল।'

হাঁটতে হাঁটতে মুসা ঠাট্টা করলো, 'ল্যারি, তোমার বাচ্চাটা খালি পালায়, ওকে বেঁধে রাখতে পারো না?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো, 'রাখতাম তো। কিন্তু ও যে খুব কাঁদে। মা নেই তো, তাই।'

একেবারে চুপ হয়ে গেল মুসা।

জানালা দিয়ে দলটাকে আসতে দেখে বেরিয়ে এলেন মা। 'এসেছো। ভালো করেছো। মেহমান এসেছে বাড়িতে। ভাবলাম, তোমরা এলে দেখা হতো। আলাপ করতে পারতে।'

'কে এসেছে, মা?' ভুরু কোঁচকালো জনি।

'জ্যাক।'

'জ্যাক ভাইয়া! এসেছে! খুব ভালো হয়েছে…!'

কথা শুনে বেরিয়ে এলো এক সুদর্শন তরুণ। লম্বা। হাসি হাসি মুখ। দেখেই তাকে ভালো লেগে গেল তিন গোয়েন্দা আর জিনার।

'হাল্লো!' হেসে বললো জ্যাক। 'তোমাদের কথা খালার কাছে শুনলাম। দেখা হয়ে ভালো হলো।' হাত মেলাতে এগিয়ে এলো সে।

এক এক করে তিন গোয়েন্দা আর জিনা হাত মেলালো।

এগিয়ে এলো রাফিয়ান। জ্যাকের সামনে বসে একটা পা উঁচু করে দিলো।

'আরি, কুকুরটা কি করছে!' অবাক হয়ে বললো সে।

'হাত মেলাতে বলছে,' হেসে বললো জিনা। 'আপনাকে পছন্দ হয়ে গেছে ওর।'

ছয়

খেতে খেতে অনেক কথাই হলো।

শেষে বিদায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে উঠলো জ্যাক। তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলো ছেলেমেয়েরা। টোগোকে নিয়ে ল্যারিও এলো তাদের সঙ্গে।

লম্বা লম্বা পায়ে পাহাড়ের মোড়ে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। তারপর আবার ফিরে এলো বাড়িতে।

ডিম, দুধ, রুটি, মাখন আর পনির ঝুড়িতে ভরে দিলেন মা। সেগুলো নিয়ে, তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার ক্যাম্পে ফিরে চললো তিন গোয়েন্দা আর জিনা।

জনি রয়ে গেল খামারে, তার কাজ আছে। পরদিন আবার যাবে ক্যাম্পে, বলে দিলো সে।

ঢাল বেয়ে উঠছে ওরা। আগে আগে চলেছে রাফি। এই সময় কোথা থেকে যেন উড়ে এসে ফুলের ওপর বসলো বড় একটা প্রজাপতি। এরকম প্রজাপতি আর কখনও দেখেনি ওরা।

'খাইছে! কত্তোবড়!' বলে উঠলো মুসা। 'কি প্রজাপতি?'

মাথা নাড়লো রবিন। 'বলতে পারবো না। কিশোর, তুমি জানো?'

'নাহ্,' কিশোর বললো। 'চেহারা-সুরতে তো দুর্লভ জিনিস বলেই মনে হচ্ছে। ধরে নিয়ে যাবো নাকি ডাউসনের কাছে?'

কিশোরের কথা শেষ হতে না হতেই পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল জিনা। হাত বাড়ালো প্রজাপতিটাকে ধরার জন্যে। শেষ মুহূর্তে উড়ে গেল ওটা। গিয়ে বসলো কাছেই আরেকটা ফুলে। আবার এগোলো জিনা। শেষ মুহূর্তে আবার উড়লো প্রজাপতি। গিয়ে বসলো আরেক ফুলে।

রোখ চেপে গেল জিনার। ধরবেই ওটাকে। প্রজাপতিটাও চালাক। কিছুতেই ধরা পড়তে চাইলো না। গেলও না এলাকা ছেড়ে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে তিন গোয়েন্দা। কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে রাফিয়ান। জিনাকে সাহায্য করতে এগোবে কিনা ভাবছে বোধহয়।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ধরা পড়তে হলো প্রজাপতিটাকে। সাবধানে ওটার দুই পাখা টিপে ধরে রেখে জিনা বললো, 'একটা পনিরের টিন খালি করে ফেলো, জলদি!'

তাড়াতাড়ি টিনের পনির বের করে, একটা প্যাকেটের কাগজ ছিঁড়ে মুড়ে রাখলো রবিন। টিনটা দিলো জিনাকে। সাবধানে ওটার মধ্যে প্রজাপতিটাকে

ভরলো জিনা। চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ফোঁস করে ছেড়ে বললো, 'থাকো এবার আরামসে!' বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি শিওর, এটা দেখে খুব অবাক হবেন মিস্টার ডাউসন।'

'তখন না বললে আর যাবে না ওখানে?' মুসা বললো। 'ডাইনী বুড়িটা আছে...'

'থাকুক। তবুও যাবো।'

'তোমার কখন যে কি মনে হয়,' হাসতে হাসতে বললো কিশোর, 'ঠিক-ঠিকানা নেই।'

'কি বলছো, কিশোর? এতোবড় একটা প্রজাপতি ধরলাম। দুর্লভ কিনা, কি নাম, জানতে ইচ্ছে করছে না তোমার?'

'করছে। তবে তার চেয়েও বেশি ইচ্ছে করছে ডরি আর বুড়ির ছেলের সঙ্গে দেখা করতে। প্রজাপতিটা না ধরলেও ওদের সঙ্গে দেখা করতে যেতামই একবার।'

ঝট করে কিশোরের দিকে তাকালো রবিন। 'তোমার কথায় রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি! কি ব্যাপার, কিশোর?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার গোয়েন্দাপ্রধান। 'এখনও জানি না। তবে এখানে আসার পর থেকেই কতগুলো ব্যাপার বেশ অবাক করেছে আমাকে। তদন্ত করে দেখা দরকার।'

নিজে থেকে কিছু না বললে হাজার চাপাচাপি করেও কিশোরের মুখ থেকে কোনো কথা আদায় করা যাবে না, একথা জানা আছে তিনজনেরই। কাজেই আপাতত আর কোনো প্রশ্ন করলো না। সময় হলে আপনা থেকেই সব বলবে কিশোর।

কাঁচের ঘরগুলোর কাছে মিস্টার ডাউসনের দেখা মিললো না, নেই তিনি ওখানে।

'বোধহয় কটেজে,' কিশোর বললো। 'ডেকে দেখি।'

কটেজের কাছে এসে ডাক দিলো সে, 'মিস্টার ডাউসন! মিস্টার ডাউসন!'

সাড়া দিলেন না প্রজাপতি মানব, বেরিয়েও এলেন না। তবে দোতলার একটা জানালার পর্দা ফাঁক হলো, উঁকি দিলো কেউ। সেদিকে হাত নেড়ে আবার ডাউসনের নাম ধরে ডাকলো কিশোর।

মুসা বললো, 'মিস্টার ডাউসন, আপনার জন্যে একটা দুর্লভ প্রজাপতি নিয়ে এসেছি।'

জানালা খুলে গেল। বেরিয়ে এলো মিসেস ডেনভারের মুখ। জিনার মনে

হলো, একেবারে কার্টুন ছবির ডাইনী, কোনো ভুল নেই।

'মিস্টার ডাউসন নেই,' জবাব দিলো মিসেস ডেনভার।

'তাঁর বন্ধু মিস্টার ডরি কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'তিনি আছেন?'

ওদের দিকে তাকিয়ে কি বললো মহিলা, বোঝা গেল না। জানালার ভেতরে ঢুকে গেল আবার তার মুখ।

অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকালো মুসা। 'এরকম করলো কেন? হ্যাঁচকা টান দিয়ে কেউ সরিয়ে নিলো বলে মনে হলো না?'

'ঘরে তার ছেলেটা নেই তো?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো রবিন।

'কি জানি!' গাল চুলকালো কিশোর। 'চলো, আশপাশটা ঘুরে দেখি ডাউসনকে পেয়েও যেতে পারি।'

কটেজের একটা কোণ ঘুরে উঁকি দিতে একটা ছাউনি চোখে পড়লো। কেউ নেই। ঠিক ওই সময় পেছনে পদশব্দ শুনে ফিরে তাকালো ওরা। একজন লোক আসছে তাদের দিকে। খাটো, রোগাটে, লম্বা মুখ, নাকটা বাঁকা। চোখে কালো চশমা। হাতে একটা প্রজাপতি ধরার জাল। বললো, 'মিস্টার ডাউসন তো নেই। কি চাও তোমরা?'

'আপনি নিশ্চয় মিস্টার ডরি,' কিশোর বললো। 'আমরা একটা দুর্লভ প্রজাপতি ধরে এনেছি। মিস্টার ডাউসনকে দেখাতে।'

'দেখি?' হাত বাড়ালো ডরি।

টিনটা দিলো জিনা। সাবধানে টিনের ঢাকনা খুলে সামান্য ফাঁক করলো ডরি, যাতে প্রজাপতিটা উড়ে যেতে না পারে।

কালো কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখতে দেখতে মাথা ঝাঁকালো ডরি। 'হুঁ, ভালো। এক ডলার দিতে পারি।'

'এক পয়সাও দিতে হবে না, এমনিই নিন,' জিনা বললো। 'শুধু বলুন, এটার নাম কি? কি জাতের?'

'কোনো ধরনের ফ্রিটিল্যারি?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'হতে পারে,' বলে, পকেট থেকে একটা ডলার বের করে তাড়াতাড়ি তার হাতে গুঁজে দিলো লোকটা। 'এই নাও। প্রজাপতি পেয়ে খুশি হলাম। মিস্টার ডাউসন এলে বলবো।'

আর কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আচমকা ঘুরে দাঁড়ালো সে। এক হাতে টিন, আরেক হাতে জাল নিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলো।

অবাক হয়ে হাতের টাকাটার দিকে তাকালো একবার রবিন। তারপর আবার তাকালো লোকটার দিকে।

ডরি চলে গেলে মুসা বললো, 'আজব লোক! এই লোকের সঙ্গে বনিবনা হয় কিভাবে মিস্টার ডাউসনের? টাকাটা কি করবে? এটা দরকার নেই আমাদের।'

'মিসেস ডেনভারকে দিয়ে দেবো,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর। 'তার দরকার। ছেলে তাকে একটা পয়সাও দেয় বলে মনে হয় না।'

আবার কটেজের সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা। আশা করেছিলো মিসেস ডেনভারকে দেখতে পাবে। কিন্তু পেলো না। একমুহূর্ত দ্বিধা করে সামনের দরজায় গিয়ে টোকা দিলো রবিন।

দরজা খুলে গেল। বিড়বিড় করে কি বললো মহিলা, বোঝা গেল না। তারপর বললো, 'তোমরা চলে যাও। আমার ছেলে এসে দেখলে তোমাদের তো গালমন্দ করবেই, আমাকেও মারবে। চলে যাও তোমরা।'

'যাচ্ছি। এই নিন,' বলে টাকাটা মহিলার হাতে গুঁজে দিলো রবিন।

হাতের তালুতে ডলারটা দেখে বিশ্বাসই করতে পারলো না মিসেস ডেনভার। তারপর হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি ছেঁড়া জুতোর ভেতরে ওটা লুকিয়ে ফেললো। আবার যখন সোজা হলো, দেখা গেল তার চোখে পানি টলমল করছে। 'তোমরা খুব ভালো! সে-জন্যেই বলছি, চলে যাও। আমার ছেলেটা মানুষ না! তোমাদেরকেও মেরে বসতে পারে। চলে যাও, প্লীজ!'

নীরবে ওখান থেকে সরে এলো ওরা।

'আজব এক জায়গা!' হাঁটতে হাঁটতে বললো কিশোর। 'দু'জন প্রজাপতি মানব, একসাথে থাকে, অথচ আচার ব্যবহারে একজনের সঙ্গে আরেকজনের আকাশ-পাতাল তফাৎ। একজন মহিলা, তার ব্যবহার আরও অদ্ভুত। ছেলের কথা যা শুনি, ওটা নিশ্চয় আরেক পাগল! বুঝতে পারছি, আবার আসতে হবে এখানে।'

'তারমানে রহস্যের ভূত ঘাড়ে চেপেছে তোমার,' হেসে বললো মুসা।

'কেন, তোমার কাছে রহস্যময় লাগছে না?'

'লাগছে।'

'আমি অবাক হচ্ছি,' রবিন বললো, 'ডরি প্রজাপতিটা চিনতে পারলো না দেখে। প্রজাপতির ব্যবসা করে, অথচ···কি জানি, হয়তো খালি বেচাকেনা নিয়েই থাকে লোকটা। কোনটা কোন প্রজাপতি তার ধার ধারে না।'

'কিন্তু বেচাকেনা করতে গেলে জিনিস চিনতে হয় না?' জিনা প্রশ্ন তুললো। 'লোকে যখন বলে এই জাতের প্রজাপতি দিন, ওই জাতের শুঁয়াপোকা দিন, না চিনলে কি করে দেয়?'

'তা-ও কথা ঠিক,' মাথা দোলালো রবিন। 'নাহ্, পুরো ব্যাপারটাই রহস্যময়!'

ক্যাম্পে ফিরে এলো ওরা। এসেই সোজা ভাঁড়ারের দিকে রওনা হলো

রাফিয়ান। হাত নেড়ে রবিন বললো, 'না না, রাফি, যাসনে। খাবার সময় হয়নি এখনও।'

'এখন কি করবো?' শুয়ে পড়েছে মুসা। 'সুন্দর বিকেল।'

'তা ঠিক। কিন্তু রাতে আর সুন্দর থাকবে বলে মনে হয় না,' কিশোর বললো পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে। 'মেঘ জমছে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে।'

'আমারও মনে হয়,' জিনা বললো। সাগরের তীরে বাড়ি। কখন বৃষ্টি আসে না আসে মোটামুটি আঁচ করতে পারে। 'দূর! আর একটা হপ্তা অপেক্ষা করতে পারলো না আকাশ! এখন বৃষ্টি এলে উপায় আছে? সারাদিন তাঁবুতে বসে থাকতে হবে। ক্যাম্পিঙের আর কোনো মানে হবে না।'

'যখন আসে আসবে,' রবিন বললো। 'এখন ওসব ভেবে লাভ নেই। বৃষ্টি এলে বসে থাকবো কেন? গুহাগুলো দেখতে চলে যাবো। এখন এসো, মিউজিক শুনি। আবহাওয়ার খবর খারাপ হলে তা-ও জানতে পারবো।'

'বেশ, চলো তাহলে মিউজিকই শুনি,' জিনা বললো। 'আজ বিকেলে কোনো এক সময়ে প্যাসট্রোল সিমফনি বাজানোর কথা। ঘোষণা শুনেছি, তবে সময়টা ঠিক মনে নেই। এখানে, এই পাহাড়ী গাঁয়ে, ওই মিউজিক শুনতে দারুণ লাগবে। তবে অবশ্যই ভলিউম কমিয়ে শুনতে হবে। জোরে শুনতে ভালো লাগে না ওই বাজনা।'

'বাবারে, একেবারে কবি হয়ে যাচ্ছে দেখি আমাদের জিনা বেগম,' হেসে ঠাট্টা করলো মুসা।

পানি-নিরোধক খাপ থেকে রেডিওটা বের করলো কিশোর। সুইচ টিপে স্টেশন টিউন করতেই শোনা গেল মোটা কণ্ঠ, 'সংবাদ এখনকার মতো শেষ হলো। ধন্যবাদ।'

'আহ্হা, শেষ হয়ে গেল,' বললো কিশোর। 'আবহাওয়ার খবরটা শোনা উচিত ছিলো। যাকগে, পরের বার শুনবো।'

শোনা গেল ঘোষকের গলা। হ্যাঁ, জিনা ঠিকই বলেছে, প্যাসট্রোল সিমফনিই শোনানো হবে। নরম, হালকা লয়ে শুরু হলো বাজনা। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো যেন পাহাড়ী প্রকৃতি জুড়ে। যেন এই পরিবেশে শোনার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে ওই মিউজিক। রেডিওটা সামনে রেখে আরাম করে জাঁকিয়ে বসলো চারজনে। কারো মুখে কথা নেই। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে পশ্চিম আকাশে অপরূপ রঙের খেলা। ধীরে ধীরে দিগন্তে নামছে সূর্য।

ওদিকে একই দিগন্তের কোল থেকে উঠে আসছে মেঘের স্তর। সূর্যটা হারিয়ে গেল তার ওপাশে। মন খারাপ হয়ে গেল ওদের।

ঠিক এই সময়, বাজনা ছাপিয়ে সোনা গেল আরেকটা শব্দ। বিমান।

এতো আচমকা আর এতো জোরে হলো শব্দটা, চমকে গেল শ্রোতারা। ঘেউ ঘেউ শুরু করলো রাফিয়ান।

'কোথায় ওটা?' দেখতে না পেয়ে অবাক হয়েছে মুসা। 'কাছেই মনে হচ্ছে, অথচ দেখছি না! জনির ভাই জ্যাক ওড়াচ্ছে না তো?'

'ওই যে,' কিশোর হাত তুললো।

পাহাড় পেরিয়ে উড়ে আসতে দেখা গেল ছোট বিমানটাকে। ওদের মাথার ওপর একবার চক্কর দিয়ে চলে গেল এয়ারফীল্ডের দিকে।

ছন্দপতন ঘটালো এই বিকট আওয়াজ। বাজনা শুনতে আর ভালো লাগলো না ওদের।

সাত

রাতের খাওয়ার জন্যে তৈরি হতে লাগলো ওরা। রবিন আর জিনা গিয়ে খাবার নিয়ে এলো ভাঁড়ার থেকে। রাফিয়ান গেছে সাথে, যদি কোনো সাহায্য করতে পারে এই আশায়। কিন্তু মুখে ঝুলিয়ে আনার মতো কিছু না থাকায় খালিমুখেই ফিরতে হয়েছে তাকে।

খেতে বসে বার বার অস্বস্তিভরে পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাতে লাগলো কিশোর। 'নাহ্, বৃষ্টিটা বোধহয় আসবেই। দেখো, ইতিমধ্যেই অর্ধেক আকাশ ছেয়ে ফেলেছে মেঘে। সূর্য তো সেই যে ঢুকেছে মেঘের মধ্যে, আর বেরোচ্ছে না। মনে হয় আজ তাঁবু খাটাতেই হবে।'

'হ্যাঁ,' একমত হয়ে মাথা দোলালো জিনা।

'করলে তাড়াতাড়ি করতে হবে,' মুসা বললো। 'বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। রাতে আজ শীতই লাগবে।'

'চলো, তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে ঝোপের ভেতর থেকে বের করে ফেলি,' রবিন বললো। 'চারজনে হাত লাগালে বেশিক্ষণ লাগবে না তাঁবু খাটাতে।'

সত্যিই তাই। এক ঘণ্টাও লাগলো না। বিশাল ঝোপের ধারে খাটিয়ে ফেলা হলো তাঁবু।

'ভালোই খাটিয়েছি, কি বলো,' তাঁবু দেখতে দেখতে নিজেদের তারিফ করলো মুসা। 'সাধারণ বাতাস তো দূরের কথা, হারিকেন এলেও উড়িয়ে নিতে পারবে না। আরামেই থাকবো ভেতরে। এখন বিছানা করে ফেলা দরকার। কম্বল আজ গায়ে দিতে হবে, কাজেই বিছানো চলবে না। খড় আর পাতা দিয়েই বিছানা

করতে হবে।'

কাছেই গমের খেতের ফসল সবে কাটা হয়েছে। সেখান থেকে খড় তুলে আনলো ওরা। ঝোপের অভাব নেই, পাতারও অভাব হলো না। প্রচুর পাতা জোগাড় করে আনা হলো। সেসব বিছিয়ে তৈরি করে ফেলা হলো চমৎকার পুরু আর নরম গদির মতো বিছানা। তার ওপর যার যার অ্যানারাক বিছিয়ে দিয়ে চাদরের কাজ সারলো।

কাজ সেরে বাইরে এসে আরেকবার তাকালো আকাশের দিকে। নাহ্, বৃষ্টি আসবেই, আর কোনো সন্দেহ নেই। সেই সাথে ঝড়ও আসতে পারে। তবে—ওদের আশা—সকালে থেমে যাবে বৃষ্টি। আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। আবার বাইরে বেরোতে পারবে ওরা। আর যদি না-ই হয়, কি আর করা, চলে যাবে গুহা দেখতে।

মেঘ করায় স্বাভাবিক সময়ের আগেই অন্ধকার হয়ে গেছে। তাঁবু খাটানো হয়েছে দুটো, কিন্তু ঘুমানোর আগে এক তাঁবুতে বসে গল্প করবে ঠিক করলো ওরা। রেডিও শুনবে। তাঁবুতে ঢুকে চালু করে দিলো রেডিও। রাফিকে ডাকলো জিনা। কিন্তু ভেতরে এলো না কুকুরটা, বাইরেই শুয়ে থাকলো। বোধহয় আরাম লাগছে ওখানেই।

রেডিওটা সবে অন করেছে কিশোর, এই সময় ঘেউ ঘেউ করে উঠলো রাফিয়ান। সঙ্গে সঙ্গে সুইচ অফ করে দিলো সে।

'নিশ্চয় কেউ আসছে,' জিনা বললো। 'কে?'

'হয়তো জনি,' আন্দাজ করলো মুসা। 'আকাশের অবস্থা খারাপ দেখে আমাদেরকে বাড়িতে নিয়ে যেতে আসছে।'

'নাকি আঁধার রাতে মথ খুঁজতে বেরোলেন মিস্টার ডাউসন,' হেসে বললো রবিন।

হাসলো কিশোর। মুসার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললো, 'বলা যায় না, মিসেস ডেনভারও হতে পারে। ঝড়ের রাতে কাউকে যাদু করতে বেরিয়েছে হয়তো।'

'দূর, বাজে কথা বলো না তো,' গায়ে কাঁটা দিল মুসার। 'আল্লাহ না করুক। মিসেস ডেনভার ভালো মানুষ, ডাইনী নয়। তাছাড়া পৃথিবীতে ডাইনী বলে কিছু নেই...'

'তা-ই নাকি? আরে, আমাদের মুসা আমান বলে কি? ভূতপ্রেতের ওপর থেকে বিশ্বাস তাহলে উঠে যাচ্ছে তোমার। আশ্চর্য!'

ভূতের কথায় আরও কুঁকড়ে গেল মুসা।

কিশোরের সঙ্গে সঙ্গে রবিন আর জিনাও হাসতে আরম্ভ করলো।

ওদিকে ডেকেই চলেছে রাফিয়ান।

'কে এলো, দেখতে হয়।' বলে তাঁবুর দরজা দিয়ে মাথা বের করে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'এই রাফি, কে-রে?'

মুখও ফেরালো না রাফিয়ান। কিশোরের কথা যেন কানেই যায়নি। একই দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করে চলেছে। নিশ্চয় কিছু দেখতে পেয়েছে।

'শজারু-টজারু হবে,' ভেতর থেকে বললো জিনা।

'কি জানি। তবে আমার মনে হয় ওকে নিয়ে গিয়ে দেখা উচিত কি দেখেছে। জানা দরকার। অন্য কিছুও হতে পারে।'

তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লো কিশোর। 'আয়, রাফি। কি দেখেছিস? দেখা তো আমাকে।'

লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটলো রাফিয়ান। পেছনে প্রায় দৌড়ে এগোলো কিশোর। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। গাছের শেকড়ে কিংবা লতায় লেগে হোঁচট খাচ্ছে। টর্চ আনা উচিত ছিলো, ভাবলো সে। এখন আর আনার সময় নেই। অনেকখানি চলে এসেছে।

ঢাল বেয়ে দৌড়ে চললো কিছুক্ষণ রাফিয়ান, এয়ারফীল্ডের দিকে মুখ। তারপর বার্চ গাছের একটা জটলার পাশ কাটিয়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল। আরও জোরে চিৎকার করতে লাগলো।

আবছামতো একটা ছায়া নড়তে দেখলো কিশোর। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এই, কে?'

'আমি...আমি...,' জবাব দিলো একটা দ্বিধান্বিত কণ্ঠ। 'ডরি।'

ছায়ার হাতে লম্বা লাঠির মাথায় জালের মতো দেখতে পেলো কিশোর।

'আমাদের ফাঁদগুলো দেখতে এসেছি,' আবার বললো ডরি। 'ঝড় আসছে তো। ভাবলাম, দেখেই যাই কোনো মথ-টথ পড়লো কিনা। বৃষ্টি এলে সব ধুয়ে চলে যাবে, পরে এসে কিছুই পাবো না।'

'ও,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। 'আমি ভেবেছিলাম না জানি কি। তা মিস্টার ডাউসনও বেরিয়েছেন নাকি?'

'হ্যাঁ! রাতে প্রায়ই বেরোই আমরা, মথ শিকারে। কাজেই যদি তোমাদের কুকুরটা রাতে ডেকে ওঠে, যখনই ডাকুক, ধরে নেবে আমরা।...চেঁচিয়ে তো কান ঝালাপালা করে দিলো ওটা! থামাও না! বড় পাজি কুকুর মনে হচ্ছে!'

'এই রাফি, চুপ!' ধমক দিয়ে বললো কিশোর। 'লোক চিনতে পারিস না?'

চুপ হয়ে গেল বটে রাফি, কিন্তু তার অস্বস্তি দূর হলো না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে

দেখতে লাগলো ছায়াটাকে।

'আরেকটা ফাঁদ দেখতে যাচ্ছি আমি,' ডরি বললো। 'তোমরা যাও। কুকুরটার মুখ বন্ধ রাখতে বলবে।'

টর্চ জ্বলে উঠলো ডরির হাতে। হাঁটার তালে নেচে নেচে এগিয়ে চললো আলোটা।

'আমরা এই পাহাড়েই ক্যাম্প করেছি,' কিশোর বললো। 'এই তো, বড় জোর শ'খানেক গজ হবে। ইস্, টর্চ আনলে আপনার সঙ্গে যেতে পারতাম। রাতে মথ ধরা দেখতে ইচ্ছে করছে। নিশ্চয় খুব ভালো লাগতো।'

জবাব দিলো না লোকটা। চলে যাচ্ছে। যতোই দূরে সরছে, ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে টর্চের আলো।

ফিরে চললো কিশোর। অন্ধকারে দিক ঠিক রাখাই মুশকিল। আরও নানারকম অসুবিধে তো রয়েছেই। একশো গজ যেতেই পথ হারালো সে। ক্যাম্পের কাছ থেকে অনেক ডানে সরে গেল। অবাক হলো রাফি। কিশোরের শার্টের হাতা কামড়ে ধরে আস্তে টান দিলো।

'কি-রে!' দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'পথ ভুল করলাম নাকি? সর্বনাশ, তুই না থাকলে তো এই অন্ধকারে সারারাত ঘুরে মরতাম! তাঁবু কিছুতে খুঁজে পেতাম না! যা, পথ দেখা।'

পথ দেখিয়ে তাকে নিয়ে চললো রাফিয়ান। কিছুদূর এগিয়ে তিনটে টর্চের আলো চোখে পড়লো কিশোরের। তার দেরি দেখে বেরিয়ে পড়েছে রবিন, মুসা আর জিনা।

'কিশোওর, তুমি?' শোনা গেল রবিনের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ। 'এতোক্ষণ কি করছিলে?'

'আর বলো না, পথ হারিয়েছিলাম। টর্চ ছাড়া বেরোনোই উচিত হয়নি। রাফি সাথে না থাকলে আজ আর তাঁবুতে ফিরতে পারতাম না।'

'কি দেখে চেঁচামেচি করল' জানতে চাইলো জিনা।

'প্রজাপতি মানব, ডরি। ও বললো মিস্টার ডাউসনও নাকি বেরিয়েছেন।'

'কেন?' মুসা বললো। 'ঝড় আসছে দেখছে না? মথ-টথ কি আর বেরোবে নাকি এখন। নিশ্চয় বাসায় ঢুকে বসে আছে।'

'মথ-ধরা ফাঁদ দেখতে বেরিয়েছে নাকি। যদি ধরা-টরা পড়ে থাকে?' কিশোর জানালো। 'কোথায় যেন পড়েছি, গাছের ডালে মধু মাখিয়ে রাখা হয়। সেই মধুর গন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে মথ এসে সেখানে পড়ে। তখন ওগুলোকে ধরা মোটেই কঠিন না।'

'তাই নাকি? মজার ব্যাপার তো,' মুসা বললো। 'দেখতে যেতে পারলে হতো।...এহ্হে, বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে আরম্ভ করেছে। ডরি আর তার মথ, সবাই ভিজবে। চলো চলো, তাঁবুতে চলো।'

এবার আর বাইরে থাকতে চাইলো না রাফিয়ান। পানির বড় বড় ফোঁটা ভালো লাগলো না মোটেও। সবার আগেই ঢুকে পড়লো তাঁবুর ভেতর। বসলো রবিন আর জিনার পাশে।

'জায়গা তো সব তুইই দখল করে ফেললি, রাফি,' হেসে বললো জিনা। 'আরেকটু ছোট হতে পারলি না।'

জবাবে জিনার হাঁটুতে মাথা রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললো রাফি। যেন তার দুঃখ বুঝতে পেরেছে।

তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে জিনা বললো, 'কাণ্ড দেখো। ওরকম বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছিস কেন? তোর আবার কিসের দুঃখ? ও, বুঝেছি। বাইরে বসে শজারু দেখতে পারবি না, হাঁকডাক করতে পারবি না, এই জন্যে?'

'বসে বসে কি করি? ঘুমও তো আসছে না,' কিশোর বললো। তার টর্চটা জ্বেলে, শুইয়ে রেখেছে রেডিওর ওপর। 'রেডিওতেও বোধহয় শোনার মতো কিছু নেই।'

'গল্প করা ছাড়া আর কি করার আছে?' জিনা বললো। 'এক কাজ করো, তোমাদের *অথৈ সাগর* ভ্রমণের গল্পটা আরেকবার বলো। অনেক মজা করে এসেছো।'

'মজা না ছাই,' গজগজ করলো মুসা। 'ছাইভস্ম কতো কি যে খেলাম! শুঁয়াপোকাও বাদ দিইনি!'

'ওই শুঁয়াপোকাই বলতে গেলে জান বাঁচালো আমাদের,' রবিন বললো। 'ওগুলো খেয়ে খানিকটা শক্তি পেয়েই না আবার খাবার খুঁজতে পেরেছি। নইলে তো মরেছিলাম। আরিব্বাপরে, যা রোদ আর গরম ছিলো, জিনা, কি বলবো! কুমালো ওদিকে গুলি খেয়ে বেহুঁশ, মরে মরে অবস্থা। পানি নেই। বড় বাঁচা বেঁচে এসেছি। জীবনে আর ওমুখো হচ্ছি না আমি।'

'আমার কিন্তু অতো খারাপ লাগেনি,' কিশোর বললো। 'দ্বীপটা ছেড়ে আসতে শেষে কষ্টই হয়েছে।'

'বলোই না আরেকবার গল্পটা,' অনুরোধ করলো জিনা।

গুছিয়ে গল্প বলায় ওস্তাদ রবিন। কেস-ফাইল লিখতে লিখতে এটা রপ্ত করেছে। সে-ই আরম্ভ করলো।

বাইরে ভালোমতোই শুরু হয়েছে ঝড়-বৃষ্টি। ছোট্ট তাঁবুটাকে হ্যাঁচকা টানে

উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে প্রবল বাতাস।

গল্প বলে চলেছে রবিন। মুসাকে অক্টোপাসে ধরে মারার উপক্রম করেছে, সেই জায়গাটায় এসেছে, তন্ময় হয়ে শুনছে সবাই, এই সময় নিতান্ত বেরসিকের মতো ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিলো রাফিয়ান। চমকে দিলো সবাইকে। শুধু চেঁচিয়েই ক্ষান্ত হলো না। তাঁবুর ফাঁকে নাক ঢুকিয়ে ঠেলে মাথাটা বের করে দিলো বাইরে। আরও জোরে চেঁচাতে লাগলো।

'মরেছে! আরেকটু হলেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতো আমার,' বলে উঠলো মুসা। 'এই রাফি, তোর হলো কি?...আরে আরে দেখো, আবার বেরিয়ে গেল! এই, ভিজে ঠাণ্ডা লাগাবি তো। কি দেখতে গেছিস? দুটো পাগলকে? ওরা মথ ধরতে এসেছে...আয়, আয়।'

কিন্তু ফিরেও এলো না রাফি, চিৎকারও থামালো না। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে চলেছে। কিশোর গিয়ে টেনে আনার চেষ্টা করলে তার দিকে তাকিয়ে রেগে উঠলো। শেষে জিনা গিয়ে তাকে ধরে আনলো।

'ব্যাপারটা কি?' কিছুটা অবাকই হয়েছে কিশোর। 'এই রাফি, চুপ কর না। কানের পর্দা ফাটিয়ে দিলি তো।'

'কোনো কিছু উত্তেজিত করেছে তাকে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো জিনা। 'অস্বাভাবিক কিছু!...এই শোনো, শোনো, একটা চিৎকার শুনলে?'

কান পাতলো সবাই। কিন্তু ঝড়ো বাতাস আর তাঁবুর গায়ে আছড়ে পড়া বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে আর কিছু শোনার উপায় নেই।

'কিছু থাকলেও এখন যাওয়া সম্ভব না,' মুসা বললো। 'ভিজে চুপচুপে হয়ে যাবো। আর এই বৃষ্টিতে খুঁজে বের করাও মুশকিল হবে। রাফি, চুপ কর। যেতে পারবো না।'

তবু থামলো না রাফি।

শেষে রেগে গেল জিনা। ধমক লাগালো, 'এই, চুপ করলি! হতচ্ছাড়া কুত্তা কোথাকার!'

রেগে এভাবে তাকে খুব কমই গালি দেয় জিনা। অবাক হয়ে চুপ করলো সে। ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগলো জিনার মুখের দিকে।

'হয়েছে, আর ওরকম করে তাকাতে হবে না, পাজি কোথাকার! চুপ, একদম চুপ! ইঁদুর, ছুঁচো যা দেখবে চেঁচাতে শুরু করবে! আর একটা চিৎকার করলে চড়িয়ে দাঁত ফেলে দেবো...'

জিনার কথা শেষ হলো না। ঝড়ের গর্জন আর মুষলধারে বৃষ্টির ঝপঝপ ছাপিয়ে শোনা গেল আরেকটা ভারি গোঁ গোঁ আওয়াজ। ইঞ্জিনের।

চট করে পরস্পরের দিকে তাকালো চারজনে।

'খাইছে! এরোপ্লেন!' ফিসফিস করে বললো মুসা, যেন বিমানটা শুনতে পাবে তার কথা। 'এই ঝড়বৃষ্টির মাঝে বেরোলো! ব্যাপারটা কি?'

আট

অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলো ওরা। এমন কি জরুরী ব্যাপার ঘটলো যে এই দুর্যোগের মাঝেও উড়তে হলো বিমানটাকে?

'ঝড়ের মাঝে ওড়ার ট্রেনিং দিচ্ছে?' নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনালো যুক্তিটা। 'না, তা হতে পারে না।'

'এখান থেকে ওড়েনি,' রবিন বললো। 'হয়তো অন্য কোনোখান থেকে এসেছে। কিংবা উড়ে যাচ্ছিলো এখান দিয়ে। আবহাওয়া বেশি খারাপ হয়ে যাওয়ায় ল্যান্ড করছে।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে,' একমত হলো মুসা। 'আশ্রয় খুঁজছে।'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'না, আমার তা মনে হয় না। এয়াররুট থেকে অনেক দূরে এই এয়ারফীল্ড। তাছাড়া এটাকে ঠিক এয়ারপোর্টও বলা যায় না, অতি সাধারণ একটা এক্সপেরিমেন্টাল স্টেশন। আর যদি আবহাওয়া খারাপের কারণে নামতে বাধ্যই হয়, এখানে কেন? ধারেকাছেই প্রথম সারির বিমান বন্দর রয়েছে, ওখানে যাবে। আশ্রয়, সাহায্য সবই পাওয়া যাবে ওখানে।'

'তাহলে হয়তো মহড়াই দিচ্ছে,' জিনা বললো। 'জনির ভাই। ঝড়ের মাঝে উড়ে হাত পাকিয়ে নিচ্ছে।'

যা-ই হোক, এঞ্জিনের শব্দ হারিয়ে যেতেই ব্যাপারটা গুরুত্ব হারালো ওদের কাছে, আপাতত। হাই তুললো রবিন, 'শোয়া দরকার। ঘুম পাচ্ছে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। ঘড়ি দেখলো। 'রবিন, রাফিকে নিয়ে তুমি আর জিনা এটাতেই থাকো। আমি আর মুসা চলে যাচ্ছি ওটাতে। দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দরজার ফাঁক বন্ধ করে দেবে। কিছু দরকার হলে, কিংবা অসুবিধে হলে ডাকবে আমাদের।'

'আচ্ছা,' মাথা কাত করলো রবিন।

বৃষ্টির মাঝে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল কিশোর আর মুসা। দরজার ফাঁকটা শক্ত করে আটকে দিয়ে এসে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো রবিন।

জিনাও শুলো। তার পাশ ঘেঁষে শুয়ে পড়লো রাফিয়ান। সারা রাতে একটা শব্দও করলো না আর।

পরদিন সকালেও মুখ গোমড়া করে রইলো আকাশ। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে মুসা বললো, 'আবহাওয়ার পূর্বাভাস শোনা উচিত ছিলো। আজও পরিষ্কার হবে কিনা সন্দেহ। ক'টা বাজে, কিশোর?'

'আটটা! আজকাল ঘুম খুব বেড়ে গেছে আমাদের। চলো দেখি, ওরা উঠলো কিনা। অ্যানারাক পরে নাও, নইলে ভিজবে।'

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে তখনও। ঝর্না থেকে হাতমুখ ধুয়ে এলো ওরা। নাস্তা করতে বসলো। তাঁবুর মধ্যে গাদাগাদি করে খেতে ভালো লাগছে না। রোদ নেই, ফলে মনও বিষণ্ন হয়ে যায়। ভাবছে, দিনটা যদি কিছু পরিষ্কার হতো, জনিদের ফার্মে অন্তত যাওয়া যেতো।

নাস্তার পরে মুসা বললো, 'যে-রকম অবস্থা, গুহায়ই বোধহয় ঢুকতে হবে আমাদের। বাইরে কোথাও যেতে পারবো না।'

'তা-ই চলো,' জিনা বললো।

'ম্যাপ দেখে নেয়া দরকার,' পরামর্শ দিলো কিশোর। 'গুহার কোনো একটা মুখ নিশ্চয় রাস্তা-টাস্তার কাছে বেরিয়েছে। পাহাড়ের গোড়ার দিকেই কোথাও হবে।'

'থাকলে থাক না থাকলে নেই,' মুসা বললো, 'গেলেই দেখতে পাবো। আর না থাকলেই বা কি? আসল কথা, এখন বসে থাকতে ভাল্লাগছে না, একটু হাঁটাহাঁটি করতে চাই, ব্যস।'

ঘাস, ঝোপঝাড়, সব ভেজা। ওগুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটতেই বিরক্ত লাগে। লাফিয়ে লাফিয়ে আগে আগে চলছে রাফিয়ান।

'সবাই টর্চ নিয়েছো তো?' মনে করিয়ে দিলো রবিন। 'গুহার ভেতরে কিন্তু দরকার হবে।'

হ্যাঁ, রাফি ছাড়া সবাই নিয়েছে। তার অবশ্য দুটো প্রাকৃতিক টর্চই আছে, চোখ, গুহার অন্ধকারেও দেখতে পাবে। তাছাড়া রয়েছে প্রখর ঘ্রাণশক্তি আর শ্রবণশক্তি, মানুষের নাক-কানের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ওর যন্ত্রগুলো।

ঢাল বেয়ে কিছুক্ষণ নেমে উত্তরে মোড় নিলো ওরা। হঠাৎ করেই এসে পড়লো একটা চওড়া পথে, ঘাস আর আগাছা নেই ওখানে, কেটে সাফ করা।

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'নিশ্চয় কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই পথ।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' রবিন বললো। 'চকের খনিটনি আছে বোধহয়।' রাস্তায় পড়ে থাকা একটা খড়িমাটির ডেলায় লাথি মারলো সে।

'চলো না এগিয়ে দেখি,' বললো জিনা।

পথের একটা মোড় ঘুরতেই নোটিশ চোখে পড়লো। ওটার বাংলা করলে

দাঁড়ায়ঃ *গুহা এদিকে। দড়ি লাগানো পথগুলো ধরে গেলে ভালো। যেগুলোতে দড়ি নেই সেগুলোয় ঢুকলে পথ হারানোর ভয় আছে। সাবধান!*

'ভালোই তো মনে হচ্ছে,' উত্তেজনা ফুটলো কিশোরের কণ্ঠে। 'জনিও বলেছিলো বটে, ওগুলোতে বিপদ আছে। চলো, ঢুকেই দেখা যাক।'

'হাজার হাজার বছরের পুরানো এগুলো,' রবিন বললো। 'স্ট্যালাগমাইট আর স্ট্যালাকটাইট জমে থাকে এসব গুহায়।'

'শুনেছি,' জিনা বললো, 'ছাত থেকে নাকি ঝুলে থাকে জমাট বরফ। নিচে থেকেও বরফের স্তম্ভ উঠে যায় ওপর দিকে, ওপরেরগুলোকে ধরার জন্যে।'

'আমিও শুনেছি,' মুসা বললো। 'নাকি ভূগোল বইয়ে পড়লাম, মনে নেই। ছাত থেকে যেগুলো নামে ওগুলোকে বলে স্ট্যালাকটাইট, আর মেঝে থেকে যেগুলো ওঠে ওগুলোকে স্ট্যালাগমাইট।'

'বইয়েই বোধহয় পড়েছি।' হাত নাড়লো জিনা, 'কি জানি, কোনটাকে কি বলে।'

গুহার কাছাকাছি এসে পথের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল। আলগা খড়িমাটি পড়ে নেই। রুক্ষও নয়, বেশ মসৃণ। প্রবেশপথটা মাত্র ছয় ফুট উঁচু, তার ওপরে একটা সাদা রঙ করা বোর্ডে বড় বড় কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে মাত্র দুটো শব্দঃ বাটারফ্লাই কেভস।

রাস্তার মোড়ে যে হুঁশিয়ারিটা দেখেছিলো, সেরকমই আরেকটা নোটিশ দেখা গেল গুহা-মুখের ঠিক ভেতরে।

ওটার দিকে রাফিয়ানকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেসে জিনা বললো, 'পড়ে নে ভালোমতো। আমাদের কাছাকাছি থাকবি।'

টর্চ জ্বেলে ঢুকে পড়লো ওরা। চারটে টর্চের আলোয় ঝলমল করে উঠলো চারপাশের দেয়াল। অবাক হয়ে চিৎকার শুরু করে দিলো রাফি। বদ্ধ গুহায় প্রতিধ্বনি তুললো সেই ডাক, বিকট হয়ে এসে কানে বাজলো।

রাফির নিজেরই পছন্দ হলো না সেই শব্দ। চিৎকার থামিয়ে জিনার গা ঘেঁষে এলো। হাহ্ হাহ্ করে হাসলো জিনা। 'দূর, বোকা, এটা তো গুহা। জীবনে কম গুহা দেখেছিস, ভয় পাচ্ছিস যে এখন?…এই, সাংঘাতিক ঠাণ্ডা তো এখানে! ভাগ্যিস অ্যানারাক এনেছিলাম!'

গোটা দুই ছোট আর সাধারণ গুহা পেরিয়ে বড় একটা গুহায় ঢুকলো ওরা। যেখানে সেখানে বরফ চমকাচ্ছে। কিছু ঝুলে রয়েছে ছাত থেকে, কিছু উঠে গেছে মেঝে থেকে। ওপরের বরফের সঙ্গে নিচের কোনো কোনোটা মিলে গিয়ে তৈরি হয়েছে থাম, দেখে মনে হয় এখন গুহার ছাতের ভার রক্ষা করছে ওগুলো।

'দারুণ!' বিড়বিড় করলো রবিন। 'দেখার মতো জিনিস!'

'সুন্দর, কিন্তু কেমন যেন গা ছমছমে,' কিশোর বললো। 'বলতে পারবো না কেন। এসো, পরের গুহাটা দেখি।'

পরেরটা আবার ছোট। তবে বরফ আছে। টর্চের আলো ঠিকরে পড়ছে ওগুলোতে। সৃষ্টি করছে রামধনুর সাত রঙ। 'আরিব্বাবা!' চোখ বড় বড় করে ফেললো জিনা। 'একেবারে পরীর রাজ্য!'

পরের গুহাটায় কোনো রঙ নেই। দেয়াল, মেঝে, ছাত, থাম সবকিছু একধরনের ফ্যাকাসে সাদা, টর্চের আলো ঠিকরে এসে চোখে লাগে। আসলে স্ট্যালাকটাইট আর স্ট্যালাগমাইট এতো বেশি লেগে গেছে এখানে, থাম এতো ঘন, মাঝের ফাঁক দিয়ে অন্যপাশ দেখাই কঠিন।

মোট তিনটে সুড়ঙ্গমুখ দেখা গেল এই গুহাটায়। একটাতে দড়ি আছে, দুটোতে নেই। যে দুটোতে নেই, ওগুলোর মুখের কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিলো অভিযাত্রীরা। ভেতরটা অন্ধকার, নিস্তব্ধ। তাকিয়ে থাকতে থাকতে গায়ে কাঁটা দিলো ওদের। যদি ঢুকে পথ হারায়, আর কোনোদিন বেরোতে পারবে কিনা সন্দেহ!

'দড়িওয়ালাটা দিয়েই ঢোকা যাক,' জিনা প্রস্তাব দিলো। 'ওমাথায় কি আছে দেখে ফিরে আসবো। কি আর থাকবে, হয়তো আরও কিছু গুহা।'

দড়ি ছাড়া একটা গুহামুখের ভেতরে ঢুকে শুঁকতে আরম্ভ করলো রাফিয়ান। তাড়াতাড়ি ডাক দিলো তাকে জিনা, 'এই, জলদি বেরিয়ে আয়! হারিয়ে যাবি!'

কিন্তু ফিরলো না রাফি, ঢুকে গেল আরও ভেতরে। ঘন কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত হলো সবাই।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'কি দেখে গেল ওখানে? রাফি, এইই রাফি!' বিকট প্রতিধ্বনি উঠলো গুহার দেয়ালে দেয়ালে।

ঘেউ ঘেউ করে সাড়া দিলো রাফি। মনে হলো, মুহূর্তে ওই ডাকে ভরে গেল সমস্ত গুহা আর সুড়ঙ্গ। বিচিত্র আওয়াজ! সহ্য করতে না পেরে কানে আঙুল দিলো রবিন।

'ঘাউ! ঘাউ! ঘাউ! ঘাউ!' ডেকেই চলেছে যেন একাধিক কুকুর। অথচ রাফি ডেকেছে মাত্র দু'বার। ছুটে বেরিয়ে এলো সে। সাংঘাতিক অবাক হয়েছে! বিশ্বাসই করতে পারছে না যেন এই শব্দের স্রষ্টা সে নিজে।

'গলায় শেকল পরিয়ে আনা উচিত ছিলো তোকে,' বকা দিলো জিনা। 'খবরদার, আর কাছ থেকে সরবি না!'

কথা শুনলো এবার রাফি। কাছে কাছেই রইলো। গুহা থেকে গুহায়, সুড়ঙ্গ

থেকে সুড়ঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলো দলটা। দড়ি লাগানো জায়গাগুলোতেই শুধু ঘুরছে ওরা। অনেক সুড়ঙ্গ দেখলো, যেগুলোতে দড়ি নেই। ভেতরে কি আছে দেখার লোভও হলো, কিন্তু জোর করে দমন করলো কৌতূহল। অযথা বিপদে পড়ার কোনো মানে হয় না।

একটা গুহায় একটা ডোবামতো দেখা গেল। পানি জমে বরফ হয়ে আছে। আয়নার কাজ করছে ওটা। ছাতের সব কিছুর প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে ওর ভেতর। ঠিক এই সময় একটা অদ্ভুত শব্দ কানে এলো ওদের। চিনতে পারলো না কিসের শব্দ। সোজা হয়ে কান পাতলো সবাই।

কাঁপা কাঁপা, তীক্ষ্ণ শব্দটা যেন ক্রমান্বয়ে ভরে দিতে লাগলো সব গুহা, সুড়ঙ্গ। একবার বাড়ছে, আবার কমছে…বাড়ছে…কমছে…

বেশিক্ষণ চুপ থাকতে পারলো না রাফি। ঘেউ ঘেউ করে চেঁচিয়ে উঠলো সে। যেন তার ডাকের জবাবেই আরও জোরে হলো আগের বিচিত্র শব্দটা।

এ-কি ভূতুড়ে কাণ্ড! ভয়ে ভয়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গের দিকে তাকিয়ে রইলো মুসা।

'ব্যাপারটা কি!' ফিসফিসিয়ে বললো জিনা, জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে। 'চলো, এখানে আর এক মুহূর্তও না!'

কানে আঙুল দিয়ে ছুটলো ওরা। দৌড়ে চললো প্রবেশপথের দিকে। যেন হাজারখানেক বুনো কুকুর একসঙ্গে তাড়া করেছে ওদেরকে।

নয়

প্রবেশপথের বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলো দলটা। শব্দ শুনে ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছে বলে এখন গাধা মনে হচ্ছে নিজেদের।

'বাবারে বাবা!' কপালের ঘাম মুছে বললো মুসা। 'মনে হচ্ছিলো কানের ফুটো দিয়ে একেবারে মগজে ঢুকে যাচ্ছে!'

'ভয়ানক শব্দ!' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জিনার মুখ। 'ওই গুহায় আর ঢুকছি না আমি! চলো, ক্যাম্পে যাই।'

খড়িমাটি বিছানো রাস্তা ধরে তাঁবুতে ফিরে চললো ওরা। বৃষ্টি থেমেছে। মেঘও কাটতে শুরু করেছে।

ক্যাম্পে ফিরে একটা তাঁবুতে ঢুকে আলোচনায় বসলো ওরা।

'ওরকম শব্দ প্রায়ই শোনা যায় কিনা,' মুসা বললো, 'জিজ্ঞেস করতে হবে জনিকে। আশ্চর্য! দর্শকদের এভাবেই স্বাগত জানায় নাকি ওই গুহা!'

'সে যা-ই হোক,' কিশোর বললো, 'বেশি ছেলেমানুষী করে ফেলেছি আমরা।'

রীতিমতো লজ্জা পাচ্ছে এখন সে।

'এক কাজ করা যাক তাহলে,' পরামর্শ দিলো জিনা, 'আবার ফিরে গিয়ে চিৎকারের জবাবে আমরাও চিৎকার শুরু করি। দেখবো কি হয়?'

'ওসব করে আর লাভ নেই,' আরও বেশি ছেলেমানুষী করতে রাজি নয় কিশোর। 'চিৎকার-প্রতিযোগিতায় কিছু হবে না।' কম্বলের তলা হাতড়ে ফীল্ডগ্লাস বের করে গলায় ঝোলালো সে। 'এয়ারফীল্ডের অবস্থা দেখতে যাচ্ছি আমি।'

বাইরে বেরিয়ে ফীল্ডগ্লাস চোখে লাগিয়ে, একবার দেখেই চিৎকার করে উঠলো কিশোর। 'ওরেব্বাবা, কতো লোক! হচ্ছেটা কি ওখানে? প্লেনও এসেছে অনেকগুলো। নিশ্চয় আজ সকালে আমরা যখন গুহায় ছিলাম তখন এসেছে।'

এক এক করে ফীল্ডগ্লাস চোখে লাগিয়ে দেখলো সবাই। ঠিকই বলেছে কিশোর। কিছু একটা ঘটছে এয়ারফীল্ডে। তাড়াহুড়া আর উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে মানুষগুলোর মাঝে। এই সময় শোনা গেল ইঞ্জিনের শব্দ।

'আরেকটা প্লেন আসছে,' মুসা বললো।

'জ্যাক ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারলে হতো,' রবিন বললো। 'সে বলতে পারবে কি হচ্ছে।'

'লাঞ্চের পর ফার্মে গিয়ে জনিকে জিজ্ঞেস করতে পারি,' মুসা প্রস্তাব দিলো। 'হয়তো সে কিছু জানে, ভাইয়ের কাছ থেকে শুনে থাকতে পারে।'

'যাক, বাঁচা গেল, আবার রোদ উঠছে,' খুশি খুশি গলায় বললো জিনা। মেঘের ফাঁকে উঁকি দিয়েছে সূর্য, একঝলক সোনালি উষ্ণ রোদ ছড়িয়ে দিয়েছে বৃষ্টিভেজা প্রকৃতির ওপর। ইতিউতি ছুটে চলা ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ছে এখন নীল আকাশ। 'এরকম কড়া রোদ থাকলে শীঘ্রি শুকিয়ে যাবে ঝোপঝাড়। চলো, রেডিও শুনি, আবহাওয়া অফিস কি বলে? অযথা অ্যানারাক বয়ে বেড়াতে রাজি না আমি।'

রেডিও অন করলো ওরা। কিন্তু অল্পের জন্যে মিস করলো আবহাওয়ার খবর।

'দূর!' বলে বন্ধ করে দিতে গিয়েও থমকে গেল মুসা। দুটো শব্দ কানে এসেছে, 'বাটারফ্লাই হিল'। বাড়ানো হাতটা মাঝপথেই ঝুলে রইলো তার, কান পেতে আছে আরও কথা শোনার জন্যে। ঘোষক বলছে, 'বাটারফ্লাই হিল থেকে চুরি যাওয়া প্লেন দুটো খুব দামী, ভেতরে অনেক টাকার যন্ত্রপাতি লাগানো। হয়তো ওগুলোর জন্যেই চুরি হয়েছে প্লেন। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, ওগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেছে আমাদের দু'জন সেরা পাইলট। ওরা হচ্ছে ফ্লাইট-লেফটেন্যান্ট জ্যাক ম্যানর আর ফ্লাইট-লেফটেন্যান্ট রিড বেকার। দুটো প্লেনই একেবারে গায়েব, কোনো খোঁজ নেই। হারিয়েছে কাল রাতে ঝড়ের সময়।'

এক মুহূর্ত থেমে আরেক খবরে চলে গেল ঘোষক। রেডিও বন্ধ করে দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে অন্যদের দিকে তাকালো মুসা।

'জ্যাকের মতো মানুষ এরকম একটা কাণ্ড করলো!' বিড়বিড় করলো কিশোর। আনমনে চিমটি কাটলো একবার নিচের ঠোঁটে। 'বিশ্বাস হচ্ছে না!'

'প্লেন উড়ে যেতে কিন্তু শুনেছি আমরা,' মুসা বললো। 'দুটোই। পুলিশকে গিয়ে সব জানানো উচিত। ইস্, জ্যাক একাজ করলো! হায়রে, দুনিয়ায় কাকে বিশ্বাস করবো?'

'ঠিক,' মাথা দোলালো রবিন।

'রাফিও কিন্তু বিশ্বাস করেছিলো ওকে,' জিনা মনে করিয়ে দিলো। 'আর লোক চিনতে সাধারণত সে ভুল করে না।'

'জনি খুব দুঃখ পাবে,' মুসা বললো। 'বেচারা ভাই-বলতে অজ্ঞান…'

হঠাৎ আবার চেঁচাতে শুরু করলো রাফি। এবার আনন্দের ডাক। কে আসছে দেখার জন্যে ফিরে তাকালো কিশোর। জনি।

কাছে এসে ওদের পাশে বসে পড়লো জনি। মুখচোখ শুকনো। হাসার চেষ্টা করলো। 'খুব খারাপ খবর আছে,' কেমন ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর।

'জানি,' মুসা বললো। 'এইমাত্র শুনলাম রেডিওতে।'

সবাইকে অবাক করে দিয়ে কাঁদতে শুরু করলো জনি। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে পানি। মোছার চেষ্টা করলো না। পানি যে পড়ছে সেটাই যেন টের পাচ্ছে না। কে কিভাবে সান্ত্বনা দেবে বুঝতে পারলো না। শুধু রাফি গিয়ে চেটে দিতে লাগলো তার ভেজা গাল। বিচিত্র কুঁই কুঁই আওয়াজ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে। কুকুরটার গলা জড়িয়ে ধরে অবশেষে বললো সে, 'জ্যাক ভাইয়া হতেই পারে না! সে এরকম কাজ করবে না! আমি বিশ্বাস করি না! তোমরা তো দেখেছো তাকে, তোমাদের কি মনে হয়?'

'আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না,' গলায় সহানুভূতি মিশিয়ে বললো কিশোর। 'মাত্র একবার দেখেছি, তা-ও অল্প সময়ের জন্যে। আমার মনে হয় না তোমার ভাই খারাপ লোক।'

'সে আমার কাছে হিরো,' বলে ভেজা গাল মুছলো জনি। 'আজ সকালে যখন মিলিটারি পুলিশ প্রশ্ন করতে এসেছিলো বাবাকে, কি যে মনের অবস্থা হয়েছিলো আমার, বলে বোঝাতে পারবো না। জ্যাক ভাইয়াকে চোর বলায় এতো রেগে গিয়েছিলাম, ঘুসি তুলে মারতে গিয়েছিলাম পুলিশকে। শেষে জোর করে ধরে আমাকে ঘর থেকে বের করে দিলো মা।'

'শুধু ওই দু'জন পাইলটই তো?' জানতে চাইলো কিশোর। 'নাকি আরও কেউ

নিখোঁজ হয়েছে?'

'না, ওই দু'জনই। আজ সকালে রোলকলের সময় অন্য সবাই হাজির ছিলো। শুধু আমার ভাই আর রিড ভাইয়া বাদে। ওরা দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'কেসটা আরও খারাপ হয়েছে সে-জন্যেই,' মুসা বললো।

'কিন্তু আমি বলছি ওরা চুরি করেনি!' জোর দিয়ে বললো জনি। মুসার দিকে তাকালো ভুরু কুঁচকে। 'তুমিও ওদেরকে চোর ভাবছো নাকি?'

'প্রশ্নই ওঠে না। ওদেরকে…,' রাফিয়ানকে দৌড় দিতে দেখে থেমে গেল মুসা। 'আবার কে আসছে?'

প্রচণ্ড চিৎকার করতে লাগলো রাফি। মোটা, ভারি একটা কণ্ঠ আদেশ দিলো, 'চুপ! চুপ! এই, তোর বন্ধুরা কোথায়?'

উঠে এগিয়ে গেল কিশোর।

ঢাল বেয়ে উঠে আসছে দু'জন মোটাসোটা ইউনিফর্ম পরা লোক। মিলিটারি পুলিশ।

'এই রাফি, চুপ কর,' ডেকে বললো কিশোর। 'আসতে দে।'

দৌড়ে তার কাছে ফিরে এলো রাফি। উঠে এলো লোক দু'জন। 'এখানেই ক্যাম্প করেছো, না?' বললো একজন। 'কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। কাল রাতে তো এখানেই ছিলে?'

'হ্যাঁ,' বললো কিশোর। 'আসুন। আপনারা কি জিজ্ঞেস করবেন, জানি।'

'ভেরি গুড। বসো সবাই। এখানেই বসি, নাকি?'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। গোল হয়ে বসলো সবাই। যা যা জানে, সব জানালো ওরা। বেশি কিছু বলতে পারলো না অবশ্য। শুধু দুটো প্লেন উড়ে যাওয়ার কথা ছাড়া।

'সন্দেহজনক আর কিছুই শোনোনি কাল রাতে?' জিজ্ঞেস করলো প্রথম লোকটা।

'না,' জবাব দিলো কিশোর।

'কেউ আসে-টাসেনি এদিকে?' নোটবুক থেকে মুখ তুললো দ্বিতীয়জন।

'অ্যাঁ…ও হ্যাঁ, একজনকে দেখেছি। মিস্টার ডরি। প্রজাপতি ধরে।'

'তুমি শিওর, মিস্টার ডরিকেই দেখেছো?'

'নাম তো তা-ই বললো। হাতে প্রজাপতি ধরার জাল ছিলো। চোখে কালো চশমা, আবছা অন্ধকারেও কাঁচ চকচক করতে দেখেছি। মিস্টার ডাউসনকে দেখিওনি, তাঁর কথাও শুনিনি। মিস্টার ডরি বললো, দু'জনেই বেরিয়েছে, মথ শিকারে।'

'আর কিছু জানো না, না?'

'না,' মাথা নাড়লো কিশোর।

'হুঁ,' বলে নোটবুক বন্ধ করলো লোকটা। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। যাই, ওই দু'জনের সঙ্গেও কথা বলা দরকার। রাতে বেরিয়েছিলো যখন, কিছু দেখলেও দেখতে পারে। কোথায় থাকে ওরা?'

'চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি,' জনি উঠে দাঁড়ালো। তার সঙ্গে অন্যেরাও উঠলো। হাঁটতে হাঁটতে পুলিশদেরকে বললো, 'দেখুন, আপনারা হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না। তবু আমি বলছি, জ্যাক ম্যানর চোর নয়। হতে পারে না।'

'ও তোমার কে হয়?' জিজ্ঞেস করলো একজন পুলিশ।

'ভাই।'

'ও। দেখা যাক তদন্ত করে, কি বেরোয়।'

প্রজাপতির খামারটা দেখা গেল। হাত তুলে ভাঙা কটেজটা দেখিয়ে জনি বললো, 'ওখানেই থাকেন মিস্টার ডাউসন আর ডরি। আমাদের কি আর আসার দরকার আছে?'

'না। তোমরা যাও। থ্যাংক ইউ।'

'একটা কথা, স্যার,' অনুরোধ জানালো জনি। 'জ্যাক ম্যানর চুরি করেনি, একথাটা জানতে পারলে দয়া করে কি একটা খবর দেবেন আমাদেরকে? দেখবেন, যখনি সে জানবে তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে, যোগাযোগ করবে আপনাদের সঙ্গে।'

'তোমার ভাই, না?' দ্বিতীয় লোকটা বললো। 'কোনো আশা নেই, বুঝলে। কাল রাতে একটা প্লেন জ্যাক ম্যানরই উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কোনো সন্দেহ নেই তাতে।'

দশ

পাহাড় বেয়ে নেমে খামারের দিকে এগিয়ে গেল দু'জন পুলিশ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো ছেলেমেয়েরা। রাফিও দু'পায়ের ফাঁকে লেজ ঢুকিয়ে দিয়ে চেয়ে রয়েছে। সে জানে না কি হয়েছে, কিন্তু বুঝতে পারছে খারাপ কিছু ঘটেছে।

'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই,' কিশোর বললো। 'প্রজাপতি মানবদের কাছে কিছু পাবে না। মথ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়বে না ওদের। সামনে দিয়ে হাতি হেঁটে গেলেও না।'

যাবার জন্যে সবে ঘুরেছে ওরা, এই সময় কানে এলো তীক্ষ্ণ চিৎকার। থমকে দাঁড়িয়ে কান পাতলো সবাই। 'নিশ্চয় মিসেস ডেনভার,' মুসা বললো। 'তার আবার

কি হলো?'

'চলো তো দেখি,' বলে এগোলো কিশোর। তার পেছনে সবাই এগিয়ে চললো কটেজের দিকে।

কাছে এসে শুনতে পেলো একজন পুলিশের গলা। বলছে, 'আহ্হা, এতো ভয় পাচ্ছেন কেন? আমরা শুধু কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।'

'যাও! ভাগো!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো আবার বৃদ্ধা। কাঠির মতো সরু হাতটা নাড়ছে জোরে জোরে। 'তোমরা এখানে কিজন্যে এসেছো? যাও, যাও!'

'শুনুন, মা,' শান্তকণ্ঠে বোঝানোর চেষ্টা করলো আরেকজন, 'আমরা মিস্টার ডাউসন আর মিস্টার ডরির সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। তাঁরা কি নেই?'

'কে? কার কথা বললে? ও, পাগল দুটো। বেরিয়ে গেছে, জাল নিয়ে,' মহিলা বললো। 'আমি ছাড়া আর কেউ নেই এখন। অপরিচিত লোক দেখলে আমি ভয় পাই। যাও, যাও!'

'শুনুন,' বললো আরেকজন, 'মিস্টার ডাউসন আর মিস্টার ডরি কাল রাতে পাহাড়ে কোথায় গিয়েছিলো বলতে পারবেন?'

'রাতে তো আমি ঘুমাচ্ছিলাম। কি করে বলবো? যাও। আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও?'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো দুই পুলিশ। মহিলাকে প্রশ্ন করে লাভ নেই। কিছু জানা যাবে না।

'বেশ, যাচ্ছি আমরা,' একজন আলতোভাবে বৃদ্ধার কাঁধ চাপড়ে দিলো। 'অযথাই ভয় পেয়েছেন। ভয়ের কিছু নেই তো।'

ওদের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল কিশোরদের।

কিশোর বললো, 'মহিলার চিৎকার শুনে দেখতে এলাম কি হয়েছে।'

'জাল নিয়ে বেরিয়ে গেছে তোমাদের প্রজাপতি মানব,' বললো একজন পুলিশ, 'দু'জনেই। আজব লোক, আজব জীবন! এতোসব কিলবিলে শুঁয়াপোকার মাঝে যে কি করে বাস করে···করুক, যেভাবে খুশি। হ্যাঁ, যা বুঝতে পারছি, কাল রাতে বোধহয় ওরা কিছু দেখেনি। আর দেখার আছেই বা কি? দু'জন পাইলট দুটো প্লেন উড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে। এটা দেখলেই বা কার সন্দেহ হবে?'

'তবে ওই দু'জনের একজন যে আমার ভাই জ্যাক নয়, এ-ব্যাপারে আমি শিওর,' জনি বললো।

শ্রাগ করলো লোক দু'জন। তারপর হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

আবার পাহাড়ের ঢালে এসে উঠলো ছেলেমেয়েরা। নীরব। অবশেষে কথা বললো কিশোর, 'কিছু খাওয়া দরকার। লাঞ্চের সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ

আগে। জনি, এসো, আমাদের সাথেই খাও।'

'না ভাই, আমি কিছুই মুখে দিতে পারবো না।'

ক্যাম্পে ফিরে রবিন আর জিনাকে খাবার বের করতে বললো কিশোর। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে সবারই, জনি বাদে। জোর করে তার হাতে একটা স্যাণ্ডউইচ তুলে দিলো মুসা। সেটা চিবানোর চেষ্টা করতে লাগলো জনি।

অর্ধেক খাওয়া হয়েছে, এই সময় চিৎকার শুরু করলো রাফি। কে এলো দেখার জন্যে ফিরে তাকালো সবাই। কিশোরের মনে হলো, নিচে একটা ঝোপের ভেতরে কি যেন নড়লো। তাড়াতাড়ি ফীল্ডগ্লাস বের করে চোখে লাগালো সে।

'মনে হয় মিস্টার ডাউসন,' দেখতে দেখতে বললো কিশোর। 'জাল দেখতে পাচ্ছি। প্রজাপতি ধরছেন বোধহয়।'

'ডাকি, কি বলো?' মুসা বললো। 'তাঁকে জানাই, মিলিটারি পুলিশেরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলো।'

গলা চড়িয়ে ডাকলো কিশোর।

সাড়া এলো।

'আসছেন,' বললো মুসা।

মিস্টার ডাউসনকে এগিয়ে আনতে গেল রাফিয়ান। ঢাল বেয়ে উঠে এলেন প্রজাপতি মানব, পরিশ্রমে হাঁপ ধরে গেছে।

'তোমাদের কাছেই আসছিলাম,' ডাউসন বললেন। 'বনেবাদাড়ে ঘোরাঘুরি করো, হয়তো চোখে পড়ে যেতে পারে, সেকথা বলতে। সিনাবার মথ, দেখলেই আমাকে খবর দেবে। পারলে ধরে নিয়ে যাবে কটেজে। দেখতে কেমন বলে দিচ্ছি। পাখার নিচটা…'

'চিনি,' বাধা দিয়ে বললো কিশোর। 'একটু আগে দু'জন মিলিটারি পুলিশ গিয়েছিলো আপনার সাথে কথা বলতে। কাল রাতে কোথায় ছিলেন, জিজ্ঞেস করার জন্যে। ভাবলাম, মিসেস ডেনভার তো বুঝিয়ে বলতে পারবে না, আমরাই বলি।'

শূন্য দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকালেন ডউসন। 'মিলিটারি পুলিশ গিয়েছিলো আমার বাড়িতে?'

'হ্যাঁ, কাল রাতে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েছে কিনা আপনার জিজ্ঞেস করার জন্যে। মথ শিকারে বেরিয়েছিলেন তো তখন। দুটো এরোপ্লেন…'

তাকে কথা শেষ করতে দিলেন না ডাউসন। 'মথ শিকারে! আমি বেরিয়েছিলাম? পাগল নাকি! ঝড় আসছিলো তখন। শুধু আমাদের এই এলাকা কেন, দুনিয়ার কোনো অঞ্চলেই ওরকম সময়ে মথ বেরোয় না। রাতের বেলা

হলেও না। আবহাওয়া খারাপ হলে মানুষের অনেক আগেই বুঝতে পারে ওরা।'

ডাউসনের কথা শুনে অবাক হলো কিশোর। 'কিন্তু আপনার বন্ধু ডরি যে বললো, দু'জনেই মথ শিকারে বেরিয়েছেন?'

এবার ডাউসনের অবাক হওয়ার পালা। 'ডরি? কাকে দেখতে কাকে দেখেছো! ও তো আমার সাথেই ছিলো বাড়িতে। দু'জনে মিলে নোট লিখেছি।'

চুপ হয়ে গেল কিশোর। ভাবছে। ব্যাপার কি? মিস্টার ডাউসন কি কিছু ধামাচাপা দিতে চাইছেন? কাল রাতে যে বেরিয়েছিলেন কোনো কারণে স্বীকার করতে চাইছেন না?

'দেখুন, স্যার,' শেষে বললো সে, 'কাল রাতে আমি মিস্টার ডরিকেই দেখেছিলাম। অন্ধকার ছিলো বটে, কিন্তু জাল আর চোখের চশমা লুকাতে পারেনি। কালো কাঁচের চশমা।'

'ডরি কালো কাঁচের চশমা পরে না,' আরও অবাক হয়ে বললেন ডাউসন। 'কি সব আবল-তাবল বকছো!'

'না, স্যার, আবল-তাবল নয়,' এবার কথা বললো মুসা। 'কাল নিজের চোখে দেখে এসেছি তাকে, কালো কাঁচের চশমা পরতে। একটা প্রজাপতি ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম, বিকেলে। আমাদের কাছ থেকে ওটা নিয়ে একটা ডলার দিলো।'

'তোমাদের মাথা খারাপ! নাকি ইয়ার্কি মারছো আমার সঙ্গে!' রেগে গেলেন ডাউসন। 'অযথা সময় নষ্ট! আমার বন্ধু, আমি জানি না? ডরি কালো কাঁচের চশমা পরে না। কাল বিকেলে বাড়িতেও ছিলো না সে। আমার সঙ্গে বেরিয়েছিলো। দু'জনেই শহরে গিয়েছিলাম কিছু দরকারী জিনিস কিনতে। আর তোমরা বলছো কাল তার সাথে দেখা হয়েছে, প্রজাপতি নিয়ে এক ডলার দিয়েছে, রাতে পাহাড়েও আবার কথা বলেছো!'

'রাগ করবেন না, স্যার,' মোলায়েম গলায় বললো কিশোর। 'কিন্তু আমরা সত্যিই...'

'আবার বলছো সত্যি!' গর্জে উঠলেন প্রজাপতি মানব।

চমকে গেল রাফিয়ান। গরগর করে উঠলো।

আর দাঁড়ালেন না ওখানে মিস্টার ডাউসন। গটমট করে নেমে যেতে লাগলেন ঢাল বেয়ে। রাগতঃ ভঙ্গিতে বিড়বিড় করছেন আপনমনে।

খুব অবাক হয়েছে সবাই। তাকালো একে অন্যের দিকে।

'মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না!' দু'হাত নাড়লো কিশোর। 'কাল রাতে কি তাহলে স্বপ্ন দেখলাম নাকি? একজনকে যে দেখেছি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাফিও দেখেছে। হাতে জাল, চোখে চশমা। কথা বলেছি। মথ না ধরলে ওরকম

ঝড়ের রাতে কি করতে বেরিয়েছিলো সে?'

জবাবটা দিলো জনি, 'হয়তো প্লেন চুরির সঙ্গে ওই লোকের কোনো সম্পর্ক আছে।'

কিশোরও একই কথা ভাবছে। চুপ করে তাকিয়ে রইলো জনির দিকে।

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়লো মুসা, 'আমার তা মনে হয় না। কাল দেখলাম তো কটেজে। ওই লোক আর যা-ই করুক, প্লেন চুরি করতে পারবে না। দেখে ওরকম মনে হয় না।'

'কিন্তু আমাদেরকে যে টাকা দিয়েছে, সে যদি সত্যিই ডরি না হয়ে থাকে?' প্রশ্ন তুললো রবিন।

'নাকি ওই ব্যাটাই মিসেস ডেনভারের ছেলে?' জিনা বললো।

'দেখতে কেমন?' জনি জানতে চাইলো। 'মিসেস ডেনভারের ছেলেকে আমি চিনি। বলেছি না, আমাদের ওখানে মাঝে মাঝে কাজ করতে যায়। ওর ওপর মোটেই বিশ্বাস রাখা যায় না। বলো তো কেমন চেহারা, টেড কিনা বুঝতে পারবো।'

'খাটো, রোগাটে, চোখে কালো কাঁচের চশমা,' বলে চেহারার বর্ণনা দিলো মুসা।

'ও টেড ডেনভার নয়,' মাথা নাড়লো জনি। 'টেড লম্বা, মোটা, ঘাড় এতো মোটা, নাড়তেই কষ্ট হয়। কোনো রকম চশমাই পরে না।'

'ব্যাটা তাহলে কে? নিজেকে ডরি বলে চালিয়ে দিলো?' সবার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো মুসা।

কেউ তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারলো না। হঠাৎ তার চোখ পড়লো খাবারের দিকে। 'আরি, আরি, সব তো নষ্ট হয়ে গেল! অর্ধেক খাওয়াই এখনও বাকি!'

নীরবে খেয়ে চললো সকলে।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো জনি। 'প্লেন চুরির সঙ্গে এ-সবের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা বুঝতে পারছি না...'

'থাক বা না থাক,' ঘোষণা করলো যেন কিশোর, 'ওই প্রজাপতির খামারের ওপর চোখ রাখতে হবে আমাদের। রহস্যময় কিছু একটা ঘটছে ওখানে, আমি এখন শিওর!'

এগার

প্রায় সারাটা বিকেল বিমান চুরি আর কালো চশমা পরা লোকটার কথা আলোচনা

করেই কাটালো ওরা। একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছে না, নিজেকে ডরি বলে চালাতে গেল কেন সে? এতো বড় বোকামি কেন করলো? তার বোঝা উচিত ছিলো, কারো সন্দেহ হলে, আর সামান্য খোঁজ করলেই ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাবে।

'হয়তো ব্যাটা পাগল,' মুসা বললো। 'নিজেকে ডরি ভাবতে ভালোবাসে। এ-জন্যেই, ডরি নয় বলেই ব্যাটা আমাদের প্রজাপতিটা চিনতে পারেনি।'

'এক কাজ করলে কেমন হয়?' জিনা প্রস্তাব দিলো, 'আজ রাতে গিয়ে লুকিয়ে থেকে চোখ রাখবো প্রজাপতির খামারের ওপর। নকল ডরি, আসল ডরি, ডাউসন, কে কি করে দেখে আসা যাবে।'

'আমিও এই কথাই ভাবছি,' কিশোর বললো। 'যাবো, তবে সবাই নয়। আমি আর মুসা। তোমরা ক্যাম্পে থাকবে। সবার একসাথে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'আমিও যাবো,' জনি বললো।

'না, দল ভারি করে লাভ নেই। ধরা পড়ার ভয় আছে।'

'তাহলে রাফিকে নিয়ে যাও,' জিনা বললো। 'তোমাদের বিপদটিপদ হলে...'

'ও গিয়ে ঝামেলা আরও বাড়াবে,' মুসা বললো। 'কিছু দেখলেই চিৎকার শুরু করবে। অযথা শব্দ করবে। তারচে আমরা দু'জনই যাই। ভয় নেই, আমাদের কিছু হবে না। যদি বুড়িটা সত্যি সত্যি ডাইনী না হয়ে থাকে...'

হেসে উঠলো জনি। অন্যেরাও হেসে ফেললো মুসার কথা শুনে।

'আমি তাহলে বাড়িতেই যাই,' জনি উঠে দাঁড়ালো। 'অনেক কাজ। শোনো, আবারও বলছি, আমাকে নিয়ে যাও। এই এলাকা তোমাদের অচেনা, আমার চেনা। রাতের বেলা আমি সাথে থাকলে সুবিধে হবে...কি বলো?'

চুপ করে এক মুহূর্ত ভাবলো কিশোর। তারপর মাথা কাত করলো। 'ঠিক আছে। তবে খুব সাবধানে থাকবে। এধরনের কাজ করে তোমার অভ্যাস নেই তো...'

'আমি কোনো বিপদে ফেলবো না তোমাদের, কথা দিলাম। তা কখন রওনা হতে চাও?'

'এই দশটা নাগাদ। নাকি এগারোটা? এগারোটা হলেই বোধহয় ভালো হয়। অন্ধকার থাকবে তখন।'

'ঠিক আছে। খামারের পেছনের ওক গাছটার কাছে দেখা হবে। দেখেছো তো, বড় গাছটা? ওটার নিচেই থাকবো আমি।'

'আচ্ছা।'

জনিকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে এলো রাফি।

'চা-টা চলবে নাকি, মুসা?' রবিন জিজ্ঞেস করলো। 'বানাবো?'

'বানাও,' হাত ওল্টালো মুসা। 'তবে আর কিছু না। দুপুরের খাওয়াটা দেরিতে হয়ে গেছে। খিদে নেই। এখন আর নাস্তার ঝামেলা না করে রাতে একবারেই খাবো।'

'ও হ্যাঁ,' কিশোর মনে করিয়ে দিল, 'ছ'টার খবর শোনা দরকার। চুরি যাওয়া প্লেনের কথা কিছু বলতে পারে।'

ছ'টা বাজার মিনিটখানেক আগে রেডিও অন করলো সে। খবরের জন্যে কান পেতে রইলো। অবশেষে শুরু হলো খবর। নানারকম খবর পড়ছে সংবাদ পাঠক। ওরা যখন হতাশ হয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছে প্লেনের কথা কিছু বলবেই না, তখনই বলা হলোঃ কাল রাতে বাটারফ্লাই হিল এয়ারপোর্ট থেকে চুরি যাওয়া বিমান দুটো পাওয়া গেছে। দুটোই সাগরে পড়েছে। ওগুলোকে পানির তলা থেকে টেনে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। দুই পাইলটের একজনকেও পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, পানিতে ডুবে মারা গেছে ওরা।...

অন্য খবরে চলে গেল সংবাদ পাঠক।

রেডিও বন্ধ করে দিয়ে সবার মুখের দিকে তাকালো কিশোর। 'পড়লো কিভাবে? নিশ্চয় ঝড়ে। তাহলে চোরেরা আর যন্ত্র বিক্রি করতে পারলো না।'

'কিন্তু জনির ভাই তো মারা পড়লো!' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জিনার চেহারা।

'চোরই যদি হয়ে থাকে জ্যাক ম্যানর,' রবিন বললো, 'তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই।'

'কিন্তু সে চোর নয়,' প্রতিবাদ করলো জিনা। চোরের মতো লাগেনি।'

'আমার কাছেও লাগেনি,' মুসা বললো।

'রবিন ঠিকই বলেছে,' কিশোর বললো। 'চোর হলে দুঃখ করে লাভ নেই। আর চোর না হয়ে থাকলে তো প্লেনেও থাকবে না, মরেওনি, দুঃখ করার প্রয়োজনই হবে না আমাদের। তবে মারা গিয়ে থাকলে জনি বেচারা খুব কষ্ট পাবে। জ্যাক তার কাছে আর হিরো থাকবে না।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালো রবিন। 'জ্যাক সত্যি সত্যি মারা গিয়ে থাকলে আর আমাদের এখানে থাকা চলবে না। সারাক্ষণ মন খারাপ করে থাকবে জনি, আমাদের মজা নষ্ট হবে। আর কোনো আনন্দ পাবো না এখানে থেকে।'

'ভুল বললে,' কিশোর বললো, 'মারা গিয়ে থাকলে আরও বেশিদিন এখানে থাকা উচিত আমাদের। জনিকে খুশি রাখার জন্যে। আমরা চলে গেলে সান্ত্বনা দেয়ার কেউ থাকবে না, ও আরও বেশি মনমরা হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো তুমি,' একমত হলো মুসা। 'দুঃখের দিনে পাশেই যদি না থাকলো, বন্ধুবান্ধব কিসের জন্যে?'

'সে-ও নিশ্চয় খবরটা শুনেছে,' জিনা বললো। 'কি মনে হয়, তোমাদের জন্যে ওক গাছের নিচে অপেক্ষা করবে আর?'

'জানি না,' কিশোর বললো। 'না থাকলেও অসুবিধে নেই। আমাদের তো দু'জনেরই যাবার কথা ছিলো। ও তো জোর করে ঢুকলো। যা খুশি ঘটুক, খামারের রহস্যের কিনারা না করে আমি যাচ্ছি না এখান থেকে।'

বসে থাকলে সময় কাটতে চায় না, তাই পাহাড়ের ওদিকে ঘুরতে বেরোলো ওরা। ফিরে এলো কিছুক্ষণ পর। আটটায় রাতের খাওয়া শেষ করে আবার রেডিও অন করলো। ন'টার সংবাদ শুনবে।

'কিন্তু ন'টার সংবাদে আর নতুন কিছু বললো না। ছ'টায় যা বলেছিলো, তা-ই বললো।

রেডিও বন্ধ করে দিয়ে ফীল্ডগ্লাস চোখে লাগিয়ে এয়ারফীল্ডে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে চললো কিশোর।

'লোকজনের চলাফেরা আর খুব একটা দেখা যাচ্ছে না,' বললো সে। 'শান্ত হয়ে আসছে সব। জ্যাক আর রিডের বন্ধুরা বোধহয় খুব শক পেয়েছে খবর শুনে।'

'আচ্ছা, আমরা শুনলাম, অথচ ওরা কেউ কাল রাতে প্লেন দুটো উড়তে শুনলো না?' প্রশ্ন তুললো জিনা।

'না শোনার তো কথা নয়,' রবিন বললো।

'তাহলে বাধা দিলো না কেন?'

'ঝড়ের জন্যে হয়তো প্রথমে বুঝতে পারেনি কিছু। তারপর তো উড়েই চলে গেল। তখন আর কিছু করার ছিলা না।'

'তা-ই হবে,' মাথা ঝাঁকালো জিনা।

'আমরা সাড়ে দশটায় রওনা হবো,' কিশোর বললো। 'তোমরা শোয়ার ব্যবস্থা করছো না কেন?'

'সে করা যাবে, যাও না আগে তোমরা,' জিনা বললো। 'রাফিকে নিয়েই যাও, বুঝেছো? ওই ডাইনী বুড়িটা কি করে বসে ঠিক নেই! তার ওপর রয়েছে কালো চশমাওয়ালা লোকটা। পাজি লোক।'

'তোমরা এই পাহাড়ে একা থাকবে, রাফিকে তোমাদেরই বেশি দরকার। আমাদের কিছু হবে না। বারোটার মধ্যেই ফিরে আসবো।'

খোলা আকাশের নিচে বসে কথা বলছে ওরা। আজ আর মেঘ নেই, ফলে তাঁবুতে ঢোকারও দরকার নেই। ঝকঝকে তারাজ্বলা আকাশের দিকে তাকিয়ে এখন কল্পনাই করা যায় না, গত রাতে এই সময় কি প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি ছিলো।

ঘড়ি দেখলো কিশোর। 'যাবার সময় হয়েছে। মুসা, ওঠো।'

রবিন আর জিনাকে সাবধানে থাকতে বলে রওনা হলো দু'জনে। আকাশ পরিষ্কার বটে, কিন্তু অন্ধকার যথেষ্ট আছে। খোলা অঞ্চলে এমনিতেই অন্ধকার কিছুটা কম লাগে, কিন্তু তারপরেও যা আছে, অনেক।

'তবু সাবধানে থাকতে হবে আমাদের,' নিচু গলায় বললো কিশোর। 'কেউ যাতে দেখে না ফেলে।'

সোজা চলে এলো ওরা খামারের পেছনের বড় ওক গাছটার কাছে। জনি নেই। তবে মিনিট দুয়েক পরেই খসখস শব্দ শোনা গেল। জনি এলো। হাঁপানো দেখেই অনুমান করা গেল ছুটে এসেছে।

'সরি, দেরি হয়ে গেল,' ফিসফিস করে বললো সে। 'ছ'টার খবর শুনেছো?'

'শুনেছি,' জবাব দিলো কিশোর। 'খুব খারাপ লেগেছে আমাদের।'

'আমাদের লাগেনি,' জনি বললো। 'আমি জানি, জ্যাক ভাইয়া আর রিড ওগুলোতে ছিলো না। যদি মরেই থাকে, দুটো চোর মরেছে। চোরের জন্যে দুঃখ করতে যাবো কেন?'

'না, কোনো কারণ নেই,' কিশোর বললো। মনে মনে অবশ্য সে জনির মতো নিশ্চিত হতে পারলো না যে বিমান দুটোতে ওই দুইজন ছিলো না।

'তা এখন কি করবে, ভেবেছো কিছু?' জনি জিজ্ঞেস করলো। 'কটেজের জানালায় আলো দেখছি, পর্দা টানেনি বোঝাই যায়। গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পারি ভেতরে কি হচ্ছে।'

'তা-ই করবো। এসো। সাবধান, একটু শব্দও যেন না হয়। আমার পেছনে, একসারিতে এসো।'

পা টিপে টিপে কটেজের দিকে এগিয়ে চললো ওরা।

বার

নিঃশব্দে কটেজের কাছে চলে এলো তিনজনে।

'জানালার বেশি কাছে যাবে না,' সতর্ক করলো কিশোর, ফিসফিস করে কথা বলছে। 'যতোটা না গেলে নয় ঠিক ততোটা। আমরা দেখবো, কিন্তু আমাদের যেন দেখে না ফেলে।'

'ওটা বোধহয় রান্নাঘরের জানালা,' মুসা বললো। 'মিসেস ডেনভার হয়তো ওখানেই থাকে। ঘুমিয়েছে কিনা কে জানে!'

জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো ওরা। পর্দা নেই। একটা মাত্র মোম জ্বলছে ঘরে। আলোর চেয়ে ছায়াই বেশি।

ঘুমায়নি মিসেস ডেনভার। বাদামী রঙের একটা রকিং চেয়ারে বসে ধীরে ধীরে দুলছে সামনে পেছনে। পরনে ময়লা ড্রেসিং গাউন। মুখ দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট, তবু কিশোরের মনে হলো, ভয় পাচ্ছে মহিলা। কোনো কারণে অস্বস্তিতে ভুগছে। বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে মাথাটা। মাঝে মাঝে কাঁপা হাতে সরিয়ে দিচ্ছে মুখের ওপর এসে পড়া ধোঁয়াটে চুল।

'নাহ্, ডাইনী নয়!' ফিসফিসিয়ে বললো মুসা। 'এখন শিওর হলাম। ডাইনী হলে ওভাবে ভয় পেতো না। এখন বসে বসে তপজপ করতো। আসলে ও অতি সাধারণ এক বৃদ্ধা।'

'এতো রাত পর্যন্ত জেগে রয়েছে কেন?' নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করলো কিশোর। 'কারো অপেক্ষা করছে নিশ্চয়।'

'আমারও সেরকমই মনে হচ্ছে,' জনি বললো। 'আরও হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাদের।' বলে চট করে একবার পেছনে তাকিয়ে নিলো সে, পেছন থেকে এসে ঘাড়ের ওপর কেউ পড়ছে কিনা দেখলো।

'চলো, ঘুরে বাড়ির সামনের দিকে চলে যাই,' মুসা বললো।

সামনের দিকেও একটা আলোকিত জানালা দেখা গেল। রান্নাঘরের চেয়ে অনেক বেশি আলো এখানে। কারও চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে কাঁচের শার্সির কাছ থেকে দূরে রইলো ওরা। টেবিলের সামনে বসে থাকতে দেখা গেল দু'জন লোককে, একগাদা কাগজ ঘাঁটাঘাঁটি করছে।

'মিস্টার ডাউসন,' নিচু গলায় বললো কিশোর। 'অন্য লোকটা নিশ্চয় তাঁর বন্ধু ডরি। চোখে চশমা তো সত্যিই নেই। এই লোকের সঙ্গে দেখা হয়নি আমাদের, টাকাও এই লোক দেয়নি। যে দিয়েছিলো তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।'

লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিনজনে। অতি সাধারণ চেহারা, আর দশজনের মাঝখান থেকে আলাদা করে চেনা যাবে না। ছোট গোঁফ, কালো চুল, বড় নাক।

'কি করছে?' জনির প্রশ্ন।

'কোনো কিছু লিস্ট করছে,' কিশোর বললো। 'বোধহয় কাস্টোমারদের। বিলটিল বানাবে আরকি। মিস্টার ডাউসন ঠিকই বলেছিলেন, আমাদেরকে যে টাকা দিয়েছে সে ডরি নয়। তারমানে কাল রাতে পাহাড়ে জাল হাতে এই লোককে দেখিনি।'

'তাহলে সে কে?' বলে জানালার কাছ থেকে টেনে দু'জনকে সরিয়ে আনলো মুসা, সহজভাবে কথা বলার জন্যে। 'আর কেনই বা জাল হাতে পাহাড়ে গেল সে? মথ শিকারের মিথ্যে গল্প শোনালো? আর যে রাতে প্লেনগুলো চুরি গেল, ঠিক সেই

রাতেই কেন?'

'ঠিক, কেন?' মুসার সুরে সুর মেলালো জনি। আরও আস্তে কথা বলার জন্যে তাকে কনুইয়ের গুঁতো লাগালো কিশোর। 'কাল রাতে নিশ্চয় রহস্যময় কিছু ঘটেছিলো পাহাড়ে,' আস্তেই বললো সে। 'এমন কিছু, যে ব্যাপারে লোকে কিছুই জানে না। কিশোর, তোমরা তো গোয়েন্দা। ধরো না ওই লোকটাকে, যে নিজেকে ডরি বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। খুঁজে বের করো তাকে। জিজ্ঞেস করো এসবের মানে কি?'

'করবো,' কথা দিলো কিশোর। 'এখন দেখি, আর কোনো জানালায় আলো আছে কিনা?...আছে, ওই যে একটায়। ছাতের ঠিক নিচে। কে থাকে ওখানে?'

'হয়তো বুড়ির ছেলে,' আন্দাজ করলো মুসা।

'থাকতেও পারে,' জনি বললো। 'কিন্তু দেখবো কিভাবে?'

'উপায় আছে,' কিশোর বললো, 'দিনের বেলায় দেখেছি।' পলকের জন্যে টর্চ জ্বেলেই নিভিয়ে ফেললো সে, যাতে কাছেই ছাউনির বেড়ায় ঠেস দিয়ে রাখা মইটা ওরা দেখতে পারে।

'হ্যাঁ, দেখা যাবে,' মুসা বললো। 'তবে খুব আস্তে আস্তে আনতে হবে ওটা। শব্দ করা চলবে না। মই লেগে সামান্য ঘষার আওয়াজ হলেও ওঘরে যে আছে, উঁকি দিয়ে দেখতে আসবে।'

'তিনজনে মিলে বয়ে আনবো, শব্দ হবে কেন? জানালাটা বেশি ওপরে না, মইটাও লম্বা না যে বেশি ভারি হবে।'

সত্যি বেশি ভারি না মইটা। বয়ে এনে আস্তে করে কটেজের দেয়ালে ঠেকাতে কোনো অসুবিধেই হলো না ওদের। শব্দ হলো না।

'আমি আগে উঠি,' কিশোর বললো। 'মইটা শক্ত করে ধরে রাখো। আর আশেপাশে নজর রাখবে। কারও সাড়া পেলে কিংবা কাউকে আসতে দেখলে সতর্ক করে দেবে আমাকে। মইয়ের ওপর আটকে থেকে বিপদে পড়তে চাই না।'

দু'দিক থেকে মইটাকে শক্ত করে ধরে রাখলো জনি আর মুসা। বেয়ে ওপরে উঠলো কিশোর। জানালার চৌকাঠের কাছে পৌঁছে সাবধানে মাথা তুললো।

এই ঘরেও মাত্র একটা মোম জ্বলছে। খুব ছোট ঘর। আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। অগোছালো। বিছানায় বসে আছে একজন বিশালদেহী মানুষ। চওড়া কাঁধ, ভীষণ মোটা ঘাড়।

লোকটার দিকে একনজর তাকিয়েই নিশ্চিত হয়ে গেল কিশোর, হ্যাঁ, এই লোক মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেই পারে। ভয়ানক নিষ্ঠুর চেহারা। মনে পড়লো বৃদ্ধার কথাঃ আমাকে মারে সে! হাত মুচড়ে দেয়! খুব খারাপ লোক!

মোমের কাছে ধরে একটা খবরের কাগজ পড়ছে লোকটা।

কিছুক্ষণ পর পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করে সময় দেখলো। বিড়বিড় করে কি বললো, বোঝা গেল না। তারপর উঠে দাঁড়ালো লোকটা। ভয় পেয়ে গেল কিশোর, জানালার কাছে চলে আসবে না তো সে? আর এখানে থাকা যায় না। শব্দ না করে যতো তাড়াতাড়ি পারলো নেমে এলো মই বেয়ে।

'মিসেস ডেনভারের ছেলে,' বন্ধুদেরকে জানালো সে। 'ও জানালার কাছে আসবে এই ভয়ে তাড়াহুড়ো করে নেমেছি। জনি, তুমি গিয়ে একবার দেখে এসো। তাহলে পুরোপুরি শিওর হওয়া যাবে যে ওই লোকটাই টেড ডেনভার।'

মই বেয়ে উঠে গেল জনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এলো আবার। 'হ্যাঁ, টেডই। আশ্চর্য! এতোখানি বদলে গেল! শয়তানের মতো লাগছে আজ। অথচ কয়েক দিন আগেও এতোটা খারাপ লাগেনি। মা সন্দেহ করতো, খারাপ লোকের সঙ্গে ওঠাবসা আছে তার। অনেক বেশি মদ খায়। ওই করে করেই এরকম চেহারা হয়েছে।'

'এমনভাবে ঘড়ি দেখলো,' কিশোর বললো, 'যেন কারো আসার অপেক্ষা করছে। আমাদেরকে যে টাকা দিলো, কাল রাতে পাহাড়ে গেল, সেই চশমা পরা লোকটার জন্যে নয় তো? নিশ্চয় কোনো খারাপ মতলব আছে ব্যাটাদের। নইলে মিথ্যে কথা বলবে কেন?'

'এসো,' জনি বললো, 'কোথাও লুকিয়ে থাকি। দেখবো, কি করে?'

'হ্যাঁ। ওই গোলাঘরটায় চলো।'

নিঃশব্দে ভাঙা বাড়িটার কাছে চলে এলো ওরা। ছাতের অনেকখানি নেই। দেয়ালও বেশির ভাগই ধসে পড়েছে। পুরোপুরি ধসে পড়ার অপেক্ষাতেই যেন এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে ভাঙা বাড়িটা। ভাপসা গন্ধ। নোংরা। বসার কোনো পরিষ্কার জায়গাই নেই। আশাও করেনি কিশোর। ধুলো লেগে থাকা কয়েকটা পুরানো বস্তা এককোণে টেনে নিয়ে গিয়ে বসে পড়লো তার ওপরেই।

'খাইছে! কি গন্ধরে বাবা!' নাক সিঁটকালো মুসা। 'আলু পচেছে। এখানে বসা যাবে না। চলো, আর কোথাও যাই।'

'শ্‌শ্‌!' হুঁশিয়ার করলো কিশোর। 'একটা শব্দ শুনলাম!'

চুপ করে বসে কান পাতলো ওরা। শব্দটা তিনজনেই শুনতে পাচ্ছে। খুব হালকা পায়ে এগিয়ে আসছে কেউ। পায়ে রবার সোলের জুতো, সে-জন্যেই বেশি শব্দ হচ্ছে না। চলে গেল গোলাঘরের পাশ দিয়ে। তারপর শোনা গেল মৃদু শিস।

উঠে দাঁড়িয়ে ভাঙা জানালা দিয়ে উঁকি দিলো কিশোর। 'দু'জন লোক,' জানালো সে। 'টেডের জানালার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের জন্যেই নিশ্চয়

অপেক্ষা করছিলো টেড। ওই যে, টেড নামছে মনে হয়। এখানে না আবার কথা বলতে চলে আসে!'

সরে যাওয়া উচিত। কিন্তু আর সময় নেই। কটেজের সামনের দরজা খোলার আওয়াজ হলো। বেরিয়ে এলো টেড। এখনও তাকিয়েই রয়েছে কিশোর। সামনের জানালা দিয়ে মিস্টার ডাউসনের ঘর থেকে এসে পড়া ম্লান আলোয় আবছামতো দেখতে পাচ্ছে লোকগুলোকে।

গোলাঘরের দিকে এলো না ওরা। কটেজের কোণ ঘুরে নিঃশব্দে চলে গেল তিনজনেই।

'এসো,' জরুরী গলায় বললো কিশোর, 'পিছু নেবো। ব্যাটাদের কথা শুনতে হবে। তাহলে বোঝা যাবে কি করছে।'

'কটা বাজে?' মুসা বললো। 'আমাদের দেরি দেখলে রবিনরা না আবার চিন্তা করে।'

'বারোটা বেজে গেছে,' ল্যুমিনাস ডায়াল ঘড়ি দেখে বললো কিশোর। 'ওরা বুঝবে, জরুরী কোনো কাজে জড়িয়ে গেছি আমরা।'

পা টিপে টিপে কটেজের অন্যপাশে বেরিয়ে এলো ওরা। লোকগুলোকে দেখা গেল কাঁচের ঘরের ওপাশে কয়েকটা গাছের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কথা বলছে, কিন্তু এতো নিচু গলায়, কিছু বোঝা যায় না এখান থেকে।

তারপর গলা চড়ালো একজন লোক। জনি চিনতে পারলো, 'টেড ডেনভার। কোনো কারণে রেগে গেছে। খুব বদমেজাজী। যদি বোঝে তাকে ঠকানোর চেষ্টা হচ্ছে, তাহলে আর এক মুহূর্ত শান্ত থাকতে পারে না।'

অন্য দু'জন তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো। কিন্তু লাভ হলো না। চিৎকার করে বললো টেড, 'আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না। আমি আমার টাকা চাই। তোমরা যা যা করতে বলেছো, তাই করেছি। তোমাদের সাহায্য করেছি, এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছি। কাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন আমার টাকা দাও।'

এতো জোরে কথা বলছে সে, ভয় পেয়ে গেল অন্য দু'জন। তারপর ঠিক কি ঘটলো, বুঝতে পারলো না ছেলেরা। কানে এলো, একটা ঘুসির শব্দের পর পড়ে গেল একজন। তারপর আরেকটা ঘুসি, আরেকজন পড়ে গেল। খিকখিক করে হেসে উঠলো টেড। কুৎসিত হাসি।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই কটেজের জানালায় দেখা দিলো মিস্টার ডাউসন আর ডরির মুখ। শোনা গেল উদ্বিগ্ন কণ্ঠ, 'কে ওখানে? কি হয়েছে?'

ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙলো। বড় একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে কাঁচের ঘর সই করে ছুঁড়েছে টেড। এতো জোরে হলো আওয়াজ চমকে গেল কিশোররা।

'কিছু না, স্যার,' চেঁচিয়ে জবাব দিলো টেড। 'কে যেন ঘোরাফেরা করছিলো এখানে। চোর মনে করে দেখতে বেরোলাম। ঠিকই আন্দাজ করেছি। আমার সাড়া পেয়েই বোধহয় দৌড়ে পালাতে গিয়ে কাঁচের ঘরের ওপর পড়ে কাঁচ ভেঙেছে।'

'ধরতে পারলে না?'

'চেষ্টা তো করলাম। পালালো।' তারপর যেন ভাগ্য তার প্রতি সদয় হয়েই দেখিয়ে দিলো তিন কিশোরকে। টর্চ জ্বাললো সে। আর আলো এসে পড়লো একেবারে কিশোরদের ওপর। চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'কে? এই তো, পেয়েছি! তোমরাই, অ্যাঁ? তাহলে তোমরাই এসেছো চুরি করতে? কাঁচের ঘরের দেয়াল ভেঙেছো? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!'

তের

পালানোর চেষ্টা করলে অবশ্য সবাই ধরা পড়তো না, কিন্তু সে চেষ্টা করলো না ওরা। জনি আর মুসার কব্জি চেপে ধরলো টেড। অবাক হলো মুসা। সাংঘাতিক জোর লোকটার গায়ে। হাতই নাড়াতে পারছে না সে, এতো জোরে ধরেছে।

বেরিয়ে এলেন মিস্টার ডাউসন আর ডরি। কিশোরকে ধরলেন।

'এখানে কি করছো? কাঁচের ঘর ভাঙলে কেন?' রেগেমেগে বললো ডাউসন। 'ভাঙা ফোকর দিয়ে এখন আমাদের সমস্ত প্রজাপতি বেরিয়ে যাবে!'

'ছাড়ুন, হাত ছাড়ুন,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলো কিশোর। 'আমরা ভাঙিনি।'

'ও-ই ভেঙেছে!' চিৎকার করে বললো টেড। 'আমি দেখেছি!'

'মোটেই দেখোনি, মিথ্যুক কোথাকার! ভাঙলে তো তুমি! এখন বলছো আমাদের নাম!' পাল্লা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো জনি। 'ছাড়ো আমাকে! আমি জোনার কলিনউড। ভালো চাইলে ছাড়ো আমাকে, নইলে আমার বাবা তোমার মুণ্ডু চিবিয়ে খাবে!'

'ও জনি,' দাঁত বের করে হাসলো টেড। 'জোনার কলিনউড। যার বাবা টেডকে খারাপ লোক বলে ফার্মে চাকরি দিতে চায় না। অথচ দিনমজুরী করাতে বাধে না। দাঁড়াও, এইবার পেয়েছি সুযোগ। অপমানের প্রতিশোধ নেবো আমি। মুরগী চুরি করতে আসার অপরাধে পুলিশ যখন তার ছেলেকে কান ধরে টেনে নিয়ে যাবে, তখন টের পাবে কে খারাপ আর কে ভালো।'

ডাউসনকে বোঝানোর চেষ্টা করলো কিশোর, কিন্তু তিনিও কিছুই শুনতে চাইলেন না।

মুসা আর জনিকে টানতে টানতে ছাউনির দিকে চললো টেড। ডাউসন আর ডরিকে বললো, 'ওদেরকেও নিয়ে আসুন। সারারাত অন্ধকার ঘরে বন্দী থাকলে সকালে আপনিই তেজ কমে যাবে।'

হাত ছাড়ানোর কোনো চেষ্টাই করলো না কিশোর।

এই সময় শোনা গেল কুকুরের ঘেউ ঘেউ।

রাফিয়ান! শান্তকণ্ঠে কিশোর বললো, 'কামড় খেতে না চাইলে হাত ছাড়ুন।'

'রাফি! রাফি!' চেঁচিয়ে ডাকলো মুসা। 'এদিকে আয়! আমরা এখানে!'

এমন বিকট গর্জন করে উঠলো রাফিয়ান, টেড পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। লাফিয়ে কাছে চলে এলো। কামড় বসানোর আগে টেডের পায়ের কাছে মুখ এনে খটাস করে বন্ধ করলো হাঁ। ভয় দেখানোর জন্যে। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেয়ে যে আওয়াজ হলো, তাতেই ভয়ে সিঁটিয়ে গেল টেড। কখন যে ছেড়ে দিলো মুসা আর জনিকে নিজেই বলতে পারবে না। ডাউসন আর ডরি কিশোরকে ছেড়ে দিয়ে আগেই দৌড় দিয়েছে দরজার দিকে।

টেডও তাদের পিছু নিলো। তেড়ে গেল রাফি।

'চলো দেখি,' কিশোর বললো, 'লোক দুটোর কি হলো?'

কিন্তু নেই ওরা। ঘুসি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু গোলমালের সুযোগে গা ঢাকা দিয়েছে।

'পালিয়েছে!' জনি বললো। 'তো, এখন? আর তো কিছু করার নেই এখানে?'

'না,' কিশোর বললো। 'আমরা ক্যাম্পে ফিরে যাবো। খুব একটা কিছু জানতে পারলাম না। শুধু জানা গেল, ডাউসন সত্যি কথাই বলেছেন, চশমাওয়ালা লোকটা ডরি নয়। টেড ডেনভার খারাপ লোক, বাজে লোকের সঙ্গে তার মেলামেশা...'

'এবং ওদেরকে কোনোভাবে সাহায্য করেছে,' কিশোরের কথাটা শেষ করলো মুসা। 'ওদেরকে এখানে এনে লুকিয়েছে। কাজের বিনিময়ে পয়সা পায়নি। কিন্তু কাজটা কি করেছিলো?'

'জানি না। মাথা আর কাজ করছে না এখন। চলো, গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। কাল এসব নিয়ে ভাববো। জনি, বাড়ি চলে যাও।'

অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে রবিন আর জিনা। কিশোরদেরকে দেখেই বলে উঠলো, 'কি ব্যাপার? কি হয়েছিলো? এতো রাত করলে? রাফি তাহলে ঠিকমতোই খুঁজে পেয়েছে তোমাদের?'

'একেবারে সময়মতো,' হেসে বললো মুসা। 'আমাদের দেরি দেখে পাঠিয়েছিলে, না?'

'হ্যাঁ,' জিনা বললো। 'আমরাও যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু রবিন বললো, আগে

রাফিই যাক। ও যদি না ফেরে তাহলে আমরা যাবো। তা হয়েছিলো কি?'

সব কথা ওদেরকে জানালো মুসা আর কিশোর।

'অবাক কাণ্ড!' রবিন বললো। 'হচ্ছেটা কি ওই প্রজাপতির খামারে! টেড ওই লোক দুটোকে কি সাহায্য করেছে? কিভাবে বের করা যায়, বলো তো?'

'হাজার চেষ্টা করেও টেডের কাছ থেকে জানা যাবে না,' কিশোর বললো। 'দেখি, কাল আবার যাবো খামারে। টেড যদি তখন না থাকে, তার মাকে ফুসলে-ফাসলে কিছু কথা আদায়ের চেষ্টা করবো।'

'হ্যাঁ, ওই মহিলা নিশ্চয় অনেক কিছু জানে,' রবিন বললো। 'দু'জন লোককে কটেজে লুকিয়ে রেখেছিলো তার ছেলে। এর মানে ওদের খাওয়া মিসেস ডেনভারকেই জোগাতে হয়েছে। কিন্তু বলবে তো?'

'সেটা কাল দেখা যাবে। কথা বলতে আর ভাল্লাগছে না এখন। আমি ঘুমাতে যাচ্ছি।'

পরদিন বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙলো ওদের।

ভাঁড়ারে গিয়ে দেখা গেল, খাবার ফুরিয়েছে। কিশোর আশা করলো, জনি ওদের জন্যে খাবার নিয়ে আসবে। আর যদি না-ই আসে, ওরাই যাবে ফার্মে, খাবার আনতে। রুটি, মাখন আর সামান্য পনির দিয়ে নাস্তা সেরে বসে রইলো জনির অপেক্ষায়।

'এখান থেকে সোজা প্রজাপতির খামারে যাবো আমরা,' কিশোর বললো। 'রবিন, মিসেস ডেনভারের সঙ্গে কথাবার্তা তুমিই বলবে। তোমার কথার জবাব হয়তো দিতে পারে। কারণ টাকাটা তুমিই তার হাতে দিয়েছো। কাজেই চক্ষুলজ্জার খাতিরে হলেও কিছু বলে ফেলতে পারে।'

'ঠিক আছে,' মাথা কাত করলো রবিন। 'তা যাবো কখন? এখনই?'

'দেখি আরেকটু। জনি আসে কিনা।'

জনি এলো না। প্রজাপতির খামারে রওনা হলো গোয়েন্দারা।

কটেজের কাছে এসে সাবধান হলো ওরা। টেড-এর সামনে পড়তে চায় না। কিন্তু কটেজে সে আছে বলে মনে হলো না। এমনকি প্রজাপতি মানবদেরও দেখা গেল না।

'প্রজাপতি ধরতে বেরিয়েছে হয়তো,' মুসা বললো। 'ওই যে, মিসেস ডেনভার। কতগুলো কাপড় ধুয়েছে দেখেছো? খুব পরিশ্রম হয়েছে বোধহয়। দড়িতে টানাতেই হাত কাঁপছে এখন। রবিন, যাও, ওকে সাহায্য করো।'

মহিলার কাছে চলে এলো রবিন। মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'এই যে মিসেস ডেনভার, কেমন আছেন?...আহ্‌হা, অনেক কষ্ট হচ্ছে তো আপনার। দিন, আমি মেলে দিই।' মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো। ডান চোখের

চারপাশ কালো হয়ে ফুলে উঠেছে। 'আরে, আপনার চোখে কি হলো?'

মিসেস ডেনভারের কাছ থেকে কাপড়ের বালতিটা নিয়ে নিলো রবিন। বাধা দিলো না মহিলা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রবিনের কাজ দেখতে লাগলো।

'মিস্টার ডাউসন আর মিস্টার ডরি কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

বিড়বিড় করে যা বললো মহিলা, বুঝতে বেশ অসুবিধে হলো রবিনের। কথার মর্মোদ্ধার করতে পারলো শুধু, দু'জনে প্রজাপতি ধরতে বেরিয়েছে।

'আপনার ছেলে টেড কোথায়?' আবার প্রশ্ন করলো রবিন।

হঠাৎ ফোঁপাতে আরম্ভ করলো মহিলা। নোংরা অ্যাপ্রন তুলে মুখ ঢেকে এগোলো রান্নাঘরের দিকে।

'আশ্চর্য!' আনমনে বিড়বিড় করলো রবিন। 'হলো কি আজ মহিলার!' কাপড় মেলা বাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি তার পেছনে পেছনে গেল সে। ধরে বসিয়ে দিলো রকিং চেয়ারটায়।

মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে রবিনের দিকে তাকালো মহিলা। 'তুমিই আমাকে ডলারটা দিয়েছিলে; না?' রবিনের হাতে আলতো চাপড় দিয়ে বললো, 'খুব ভালো ছেলে তুমি। মনটা খুব নরম। জানো, কেউ ভালো ব্যবহার করে না আমার সঙ্গে। আর আমার ছেলেটা তো একেবারেই না। যখন তখন শুধু মারে।'

'আপনার চোখে ঘুসি মেরেছিলো, না?' নরম গলায় সহানুভূতির সুরে বললো রবিন। 'কবে? কাল?'

'হ্যাঁ। টাকা চাইছিলো। ও সব সময় আমার কাছে টাকা চায়।' আবার ফুঁপিয়ে উঠলো মহিলা। 'টাকা দিতে পারিনি বলে মেরেছে। তারপর পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল ওকে।'

'কি বললেন! পুলিশ! নিশ্চয় আজ সকালে!' অবাক হয়ে গেছে রবিন। পায়ে পায়ে অন্যেরাও এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে, তাদের কানেও গেছে কথাটা।

'পুলিশ বললো, সে নাকি চোর,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো মিসেস ডেনভার। 'মিস্টার হ্যারিসনের হাঁস চুরি করেছে। আগে এরকম ছিলো না আমার ছেলে। ওই শয়তান লোকগুলো এসেই তার সর্বনাশ করেছে, তাকে বদলে দিয়েছে।'

'কোন লোক?' মহিলার হাড্ডি-সর্বস্ব হাতে হাত বুলিয়ে দিয়ে রবিন বললো, 'আমাদেরকে সব খুলে বলুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা আপনাকে সাহায্য করবো।'

'ওই লোকগুলো তাকে নষ্ট করেছে!'

'কোন লোক? কোথায় থাকে ওরা? এখনও কি এখানে লুকিয়ে আছে?'

'ওরা চারজন,' এতো নিচু গলায় বললো মহিলা, শোনার জন্যে মাথা নিচু করে কান পাততে হলো রবিনকে। 'আমার ছেলেকে এসে বললো, ওদেরকে যদি খামারে লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়, তাহলে অনেক টাকা দেবে। বদলোক ওরা, নিশ্চয় কোনো খারাপ মতলব আছে, তখনই বুঝেছি। ওপরে আমার শোবার ঘরে বসে কানাকানি, ফিসফাস করতো ওরা, দরজায় আড়ি পেতে সব শুনেছি।'

'মতলবটা কি ওদের, জানেন?' হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে গেছে রবিনের।

'কোনো কিছুর ওপর নজর রাখছিলো ওরা। পাহাড়ের ওদিকের কোনো কিছুর ওপর। কখনও দিনে, কখনও রাতে। আমার শোবার ঘরটাও দখল করেছিলো ওরা, এখানে ঘুমাতো। আমি ওদের খাবার রেঁধে দিতাম। কিন্তু এর জন্যে একটা পয়সাও দেয়নি আমাকে। জঘন্য লোক!'

আবার কাঁদতে লাগলো মহিলা। সবাই এসে ঘরে ঢুকেছে। কোমল গলায় সান্ত্বনা দিলো কিশোর, 'কাঁদবেন না, মিসেস ডেনভার। এর একটা বিহিত আমরা করবোই।'

বাইরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল এই সময়। জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন মিস্টার ডাউসন। 'তোমরা! আবার এসেছো!' কিশোর আর মুসার ওপর চোখ পড়তে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'তোমাদের শাস্তির ব্যবস্থাও হয়েছে। পুলিশকে সব বলে দিয়েছি। আজ সকালে টেডকে যখন নিতে এসেছিলো তখন। রাতের বেলা আমার প্রজাপতির ঘর ভাঙো! মজা টের পাবে। কত্তোবড় সাহস, আবার এসেছো এখানে!'

চোদ্দ

'চলো যাই,' জিনা বললো। 'এখানে আর কথা বলা যাবে না। মিসেস ডেনভারও বোধহয় আর কিছু জানে না। ওর ছেলেটাকে ধরে নিয়ে যাওয়ায় খুব খুশি হয়েছি আমি। আর এসে মাকে মারতে পারবে না। এমন বদমাশ ছেলে, মাকে মারে...'

'তোমরাও কি কম নাকি?' জানালার বাইরে থেকে বললেন ডাউসন।

'চুপ করুন!' রেগে গেল জিনা। 'আপনার সঙ্গে কে কথা বলে? না বুঝে বক বক করেন...'

'এই মেয়ে, মুখ সামলে কথা বলবে!' ধমকে উঠলেন ডাউসন।

জিনাকে আর কিছু বলতে হলো না। প্রচণ্ড ঘাউ করে উঠে লাফিয়ে গিয়ে জানালার কাছে পড়লো রাফি। পারলে জানালা দিয়ে মুখ বের করেই ডাউসনকে কামড়ায়। আর দাঁড়ালেন না ওখানে প্রজাপতি মানব। ঘুরেই দিলেন দৌড়।

রান্নাঘর থেকে বেরোতেই দেখা গেল কাঁচের ঘরগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে আছেন ডাউসন।

'আমরা যাচ্ছি,' শীতল গলায় বললো কিশোর। 'পুলিশের সাথে দেখা হলে ভালোই হয়। আমাদেরও কথা আছে ওদের সঙ্গে। এখানে অনেক কিছু ঘটছে, আপনি এর কিছুই জানেন না। প্রজাপতি ছাড়া আপনার চোখে আর কিচ্ছু পড়ে না।'

'তাতে তোমার কি, বেয়াদব ছেলে!'

'আমার কিছু না, আপনারই ক্ষতি হচ্ছে। আপনি কি জানেন, এই বাড়িতে কি সব কাণ্ড ঘটছে? জানেন, টেড ডেনভার তার মাকে ধরে ধরে মারে? চোখে যে কালশিরা পড়েছে মহিলার, আজ সকালে তা-ও নিশ্চয় আপনার চোখে পড়েনি। পুলিশ আপনাকেও ধরবে। আপনার এখানে যে চার চারটে মানুষ লুকিয়ে থাকতো, দিনরাত আনাগোনা করতো, পুলিশ আপনাকে সেসব কথা জিজ্ঞেস করবে না ভেবেছেন?'

'কি বলছো তুমি, বদমাশ ছেলে?' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল ডাউসনের মুখ। 'মানুষ? কেত্থেকে এলো? কারা?'

'জানি না। তবে জানতে পারলে ভালো হতো।' আর কোনো কথা না বলে দলবল নিয়ে পাহাড়ের দিকে এগোলো কিশোর। পেছনে তাকালে দেখতে পেতো, এখনও হাঁ করে রয়েছেন বিস্মিত প্রজাপতি বিশেষজ্ঞ।

'কি মানুষরে বাবা!' ঝাঁঝালো কণ্ঠে জিনা বললো। 'একই বাড়িতে থাকে, অথচ কিছুই দেখে না, খেয়াল করে না! বিজ্ঞানীগুলো সব এক। আমার বাবাকে দেখো না, খালি থাকে গবেষণা নিয়ে, বাইরের আর কিচ্ছু চোখে পড়ে না।'

'এখন কথা হলো,' অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল রবিন, 'লোকগুলো কে? পাহাড়ে উঠে কিসের ওপর চোখ রাখতো? কেন? কিশোর, ঝড়ের রাতে ওদেরই একজনকে দেখেছিলে। নিজেকে ডরি বলে চালিয়েছে। হাতে ছিলো প্রজাপতি ধরার জাল, যাতে তার এই রাতে ঘোরাঘুরির ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন না তোলে।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো,' কিশোর বললো। 'চোখ রেখেছিলো ওরা এয়ারফীল্ডের ওপর। আমি একটা আস্ত গর্দভ! আগে কেন ভাবলাম না কথাটা? রাতদিন পাহারা দিয়েছে ওরা। দু'জন রাতে, দু'জন দিনে। দু'জন করে লুকিয়ে থেকেছে মিসেস ডেনভারের শোবার ঘরে।'

'কিশোর,' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে জিনা, 'প্লেন চুরির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই তো?'

'নিশ্চয় আছে। এছাড়া আর কি? কিন্তু এর সাথে রিড আর জ্যাককে কিভাবে

জড়ালো, সেটাই বুঝতে পারছি না। পুলিশকে জানানো দরকার। তবে তার আগে জানানো দরকার, বড় কাউকে। পুলিশ আমাদের কথা বিশ্বাস না-ও করতে পারে। এখানে একমাত্র জনির বাবাকেই বলা যায়।'

'আমারও তাই মনে হয়,' রবিন বললো।

'চলো।'

পাহাড়ী পথ ধরে প্রায় ছুটে চললো ওরা।

ফার্মের চত্বরে ঢুকেও কাউকে চোখে পড়লো না। একেবারে নির্জন।

জনির নাম ধরে ডাকলো মুসা।

গোলাঘরের দরজায় দেখা দিলো জনি। চেহারা ফ্যাকাসে। রাতে নিশ্চয় ভালো ঘুম হয়নি। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার? খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে?'

'তোমার বাবা কোথায়?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো। 'জরুরী কথা আছে।'

দীর্ঘ এক মহূর্ত কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো জনি। আর কোনো প্রশ্ন করলো না। মাঠের দিকে তাকিয়ে—যেখানে লাল-সাদা গরুগুলো চরছে—চেঁচিয়ে বাবাকে ডাকলো সে।

ডাক শুনে তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে এলেন মিস্টার কলিনউড। 'কি ব্যাপার?'

'বাবা, কিশোর কি যেন বলবে তোমাকে।'

এক এক করে ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকালেন কলিনউড। বললেন, 'তোমরাই তাহলে জনির বন্ধু। গুড। তা কি বলবে?'

'আপনি নিশ্চয় খুব ব্যস্ত,' কিশোর বললো। 'বেশি দেরি করাবো না।' সংক্ষেপে সব কথা বলতে লাগলো সে। প্রজাপতির খামারে কাকে কাকে দেখেছে, পাহাড়ের ওপর কাকে দেখেছে, খামারের বৃদ্ধা মহিলা আর তার ছেলের কথা···টেডের কথায় আসতেই মাথা ঝাঁকালেন কলিনউড। 'অতো খারাপ ছিলো না আগে। বছরখানেক আগে থেকে শুরু হয়েছে, যখন অসৎ-সঙ্গে পড়লো।'

'ওর সঙ্গীদের কয়েকজনের সাথে দেখা হয়েছে কাল রাতে,' গতরাতের অভিযানের কথা খুলে বললো কিশোর। সকালে খামারে গিয়েছিলো, মিসেস ডেনভারের সাথে কি কি কথা হয়েছে, তা-ও জানালো।

'খারাপ কাজ করলে শাস্তি পেতেই হবে,' আনমনে বললেন কলিনউড। 'সব কথা বলতে হবে তাকে, কাকে কাকে জায়গা দিয়েছিলো, কেন দিয়েছিলো, ওরা কারা, সঅব। আমারও মনে হচ্ছে প্লেন চুরির সঙ্গে এসবের সম্পর্ক আছে।'

উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে জনির মুখ। 'বাবা, আমার মনে হয় ওই লোকগুলোই প্লেন চুরি করেছে! চারজন তো। সহজেই জ্যাক ভাইয়া আর রিডকে

ধরে, বেঁধে সরিয়ে ফেলতে পারে। তারপর দু'জনে দুটো প্লেন উড়িয়ে নিয়ে যাওয়াটা কিছু না, প্লেন চালানো জানলেই হলো। সেটা তো আজকাল অনেকেই জানে। নিয়েছে ওই হারামজাদারা, মাঝখান থেকে দোষী হলো আমার ভাই।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো,' বাবাও একমত হলেন। 'এখন তাড়াতাড়ি পুলিশকে জানানো দরকার। টেডকে চাপ দিলেই গড়গড় করে সব বলে দেবে। জ্যাক আর রিডকে কোথায় রেখেছে, তা-ও জানা যাবে।'

আনন্দ, উত্তেজনায় প্রায় লাফাতে শুরু করলো জনি। 'আমি জানতাম! তখনই বলেছিলাম, আমার ভাই হতেই পারে না! বাবা, বলেছি না তোমাকে! জলদি চলো, পুলিশকে জানাতে হবে।'

দ্রুত ঘরের দিকে রওনা হলেন কলিনউড। টেলিফোন করলেন থানায়। তারপর রিসিভার রেখে দিয়ে বললেন, 'ওরা খুব সিরিয়াসলি নিয়েছে। টেডকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে। আধ ঘন্টা পর এখানে ফোন করবে বললো।'

ওই আধ ঘন্টা যেন আর কাটতেই চাইলো না। বার বার ঘড়ি দেখছে কিশোর। স্থির হয়ে বসতে পারছে না কেউই। সব চেয়ে বেশি অস্থির হয়ে আছে জনি। ল্যারি আর তার ভেড়ার বাচ্চাটাকে এতোক্ষণে একবারও দেখা গেল না। গেল কোথায়?—অবাক হয়ে ভাবলো জিনা।

টেলিফোনের শব্দ যেন বোমা ফাটালো ঘরে, খুব জোরে বেজেছে বলে মনে হলো ওদের কাছে। প্রায় ছুটে গিয়ে রিসিভার তুললেন কলিনউড। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি...খবর কি?...ও, হ্যাঁ...হ্যাঁ...' রিসিভার কানে ঠেসে ধরেছেন তিনি। 'তাই নকি?...থ্যাঙ্ক ইউ। গুড-বাই।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরলেন তিনি।

'জ্যাক ভাইয়া চুরি করেনি, তাই বললো না?' জনি জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ।'

হাত তালি দিয়ে বাচ্চা ছেলের মতো লাফাতে শুরু করলো জনি। 'বলেছিলাম না! বলেছিলাম না! ও চোর হতেই পারে না, হতেই পারে না...'

'খারাপ খবরও আছে,' বাবা বললেন।

'কী?' থমকে গেল জনি।

'টেড স্বীকার করেছে,' কলিনউড বললেন, 'প্লেন চুরি করতেই এসেছিলো চারজন লোক। ওদের দু'জন খুব ভালো পাইলট। বিদেশী। অন্য দু'জন সাধারণ অপরাধী, ওদেরকে আনা হয়েছে ঝড়ের রাতে রিড আর জ্যাককে কিডন্যাপ করার জন্যে। ওদেরকে বেহুঁশ করে ধরে এনে এয়ারফীল্ডের বাইরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে কোথাও। ওদেরকে সরিয়ে ফেলার পর দুই পাইলট গিয়ে প্লেন নিয়ে উড়ে গেছে।

এয়ারফীল্ডের লোকেরা টের পেলো যখন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'তারমানে, সাগরে পড়ে যারা মারা গেছে, তারা রিড আর জ্যাক নয়, ওই দু'জন বিদেশী পাইলট?' কিশোর বললো।

'হ্যাঁ। তবে ওদের জন্যে ভাবছি না আমি। আমার উদ্বেগ রিড আর জ্যাককে নিয়ে। ওদেরকে কোথায় লুকানো হয়েছে, টেড জানে না। তাকে বলা হয়নি। তাকে টাকা দেয়নি, কারণ প্লেন দুটো সাগরে পড়ে গেছে, তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি।'

'পাইলট দু'জন মরেছে,' বাবার উদ্বেগের কারণ বুঝে উদ্বিগ্ন হলো জনিও, 'আর চোর দুটোও নিশ্চয় পালিয়েছে! এমন কোথাও রেখে গেছে বন্দিদেরকে, যেটা কোনোদিনই জানা যাবে না!'

'ঠিক তাই,' বাবা বললেন। 'এখন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব দু'জনকে খুঁজে বের করতে হবে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে অনেক, অনেক কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয় ওদের। হাত-পা বাঁধা থাকলে, খাবার আর পানি না পেলে মরে যাবে। চোর দুটো যদি পালিয়ে থাকে কে ওদেরকে খাবার দিয়ে আসবে?'

আতঙ্কিত হয়ে বললো জনি, 'ওদেরকে খুঁজে বের করতেই হবে, বাবা!'

'কিন্তু কোথায় খুঁজতে হবে জানি না আমরা। পুলিশও জানে না।'

বিড়বিড় করে কি বললো কিশোর, বোঝা গেল না। নিচের ঠোঁটে ঘনঘন চিমটি কাটতে শুরু করলো সে।

পনের

থমথমে নীরবতা। 'কেউ জানে না কোথায় খুঁজতে হবে!' কথাটা যেন প্রচণ্ড আঘাত করে স্তব্ধ করে দিয়েছে সবাইকে। সবার মনেই এক প্রশ্নঃ কোথায় আছে রিড আর জ্যাক?

'এতো সহজে কব্জা হয়ে গেল দু'জনে?' মুসা মুখ খুললো। 'নিশ্চয় এয়ারফীল্ডে বিশ্বাসঘাতক রয়েছে, চোরগুলোকে সাহায্য করেছে যে।'

'থাকতে পারে,' কলিনউড বললেন। 'খুব ধীরেসুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে এই কাজ করেছে। নিশ্চয় নতুন ধরনের কিছু ছিলো প্লেনের ভেতর, যেগুলোর নকশার জন্যেই প্লেন চুরি করেছিলো বিদেশী ওই পাইলটেরা। পালিয়ে তো প্রায় গিয়েই ছিলো। ওদের কপাল খারাপ, পড়লো ঝড়ের মুখে।'

'ওরা ভেবেছিলো,' জিনা বললো, 'ঝড়ের সময় চুরি করাটাই ভালো। আন্দাজ ঠিকই করেছিলো। তখন ওদেরকে প্লেন চুরি করতে বাধা দিতে আসেনি কেউ।

গার্ডেরা নিশ্চয় গিয়ে সবাই ঘরে ঢুকে বসেছিলো।'

'আমার অবাক লাগছে,' কিশোর বললো, 'এতো কিছু ঘটে গেল ডাউসন আর ডরির নাকের ডগা দিয়ে, অথচ ওরা কিছুই জানলো না?'

'প্রজাপতি ছাড়া ওদের মাথায় আর কিচ্ছু নেই,' বিরক্ত গলায় বললো জনি। 'পুলিশ সহজে ছাড়বে না ওদেরকে। এতো বেকুব যে মানুষ হয়, না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না।'

'এখন কথা হলো,' ভ্রূকুটি করলো কিশোর, 'আমরা কি করতে পারি? এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে তো ইচ্ছে করছে না।' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কলিনউডের দিকে তাকালো সে।

'তোমরা আর কি করবে?' তিনি বললেন। 'পুলিশের কাছে খবর এসেছে, দু'জন লোক খুব দ্রুত একটা ভ্যান চালিয়ে চলে গেছে। ওদের গতিবিধি সন্দেহজনক ঠেকেছে দু'চারজন পথচারীর কাছে। গাড়ির নম্বরও টুকে নিয়েছে ওরা। হতে পারে চোরদুটোই। ওদেরকে যদি পুলিশ ধরে ফেলে, জ্যাক আর রিড কোথায় আছে জানা যাবে। আর তো কোনো উপায় দেখি না।'

হতাশায় গুঙিয়ে উঠলো কেউ কেউ। কিছুই করার নেই ওদের। এখানে মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে থাকা আদিম প্রকৃতিতে কোথায় খুঁজবে দু'জন বন্দি মানুষকে? খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার চেয়েও কঠিন কাজ, প্রায় অসম্ভব।

'এখানে বসে বসে ভাবলে তো আর সমস্যার সমাধান হবে না,' উঠলেন মিস্টার কলিনউড। 'আমি কাজে যাই। তোর মা কোথায়, জনি?'

'বাজার করতে গেছে,' ঘড়ির দিকে তাকালো জনি। 'ডিনারের আগেই ফিরবে।'

'ল্যারিটাও কি ওর সঙ্গে গেল নাকি? ওর কোনো সাড়াশব্দই নেই। বাচ্চাটাকেও নিশ্চয় নিয়ে গেছে?'

'ও-কি ওটাকে ছাড়া নড়ে নাকি?'

'হুঁ!' বেরিয়ে গেলেন কলিনউড।

তিন গোয়েন্দা আর জিনার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে পড়লো জনির, 'আরে, ভুলেই গিয়েছিলাম! তোমাদের নিশ্চয় খাবারে টান পড়েছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা নাড়লো কিশোর। জনির মনের এই অবস্থা, এ-সময়ে তার কাছে খাবার চাইতে লজ্জাই লাগছে তার। ভাগ্যিস পয়সা দিয়ে কিনে নেয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলো, নইলে এখন আরও খারাপ লাগতো।

'রবিন, তুমি আমার সাথে এসো,' জনি বললো। 'যা যা লাগে, নিয়ে নাও।'

রান্নাঘরের দিকে চলে গেল দু'জনে।

খানিক পরে খাবারের ঝুড়ি নিয়ে ফিরে এলো।

'জনি,' কিশোর বললো, 'সকালটা আজ তোমার সাথেই থাকি আমরা, কি বলো? তোমার কাজে সাহায্য করবো।'

'তাহলে তো খুব ভালোই হয়,' উজ্জ্বল হলো জনির মুখ। কাজে সাহায্যের চেয়ে এখন বেশি প্রয়োজন তার বন্ধুদের সঙ্গ। 'বাবাকে কথা দিয়েছিলাম আজ মুরগীর ঘরগুলো পরিষ্কার করবো। তোমরাও হাত লাগালে ডিনারের আগেই সেরে ফেলতে পারবো।'

'ঠিক আছে, চলো। তোমার কাজ শেষ হয়ে গেলে আমাদের সাথে বেরোতে পারবে। বিকেলে কোথাও একসাথে ঘুরতে যেতে পারবো আমরা।'

মুরগীর খোঁয়াড়ের কাছে শুয়ে থাকতে দেখা গেল ডবিকে। সোজা তার দিকে এগিয়ে গেল রাফিয়ান। সাথী পেয়ে গিয়ে খেলা জুড়ে দিলো দুটোতে।

সারাটা সকাল কঠোর পরিশ্রম করলো ছেলেরা। জিনা ওদেরকে খোঁয়াড় পরিষ্কারের কাজে সাহায্য করতে পারলো না, ওর এসব নোংরা লাগে। সে গিয়ে জনিদের বাগানে ফুল দেখলো। কিছু গাছের মরা পাতা বাছলো। বেড়ে ওঠা পাতা কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দিলো। ফুল গাছের পরিচর্যা করতে খুব ভালো লাগে তার।

ওদের কাজও শেষ হয়েছে, এই সময় গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ কানে এলো।

'নিশ্চয় আন্টি আসছেন,' কিশোর বললো। 'চলো, দেখি।'

হাত ধুয়ে ছেলেরা এসে দেখলো, ইতিমধ্যেই যা বলার স্ত্রীকে বলে ফেলছেন মিস্টার কলিনউড। শুনে জনির মা-ও উদ্বিগ্ন হলেন। 'বের করতে না পারলে মরবে তো!' পায়ের আওয়াজ শুনে মুখ তুললেন। 'ও, তোমরা। আমি ভাবলাম ল্যারি।'

'ল্যারি?' ভুরু কোঁচকালো জনি। 'গাড়িতেই বসিয়ে এসেছিলে নাকি?'

'গাড়িতে?' অবাক হলেন মিসেস কলিনউড। 'তাকে পাবো কোথায় বসানোর জন্যে? আমার সঙ্গে যায়নি তো। বাড়িতেই আছে।'

'কই, বাড়িতে তো নেই। আমরা তো ভাবলাম তোমার সাথে গেছে।'

'বলিস কি!' ভয় দেখা দিলো মায়ের চোখে। 'আমি তো ভেবেছি তোর কাছে আছে!'

'আর আমরা ভেবেছি তোমার সাথে গেছে!' গলা কাঁপছে জনির।

'জনি, পুকুর!' প্রায় কেঁদে ফেললেন মা। 'জলদি গিয়ে দেখ পানিতে পড়লো কিনা! ল্যারি, ল্যারি, বাপ আমার, কোথায় গেলি···!' বলতে বলতে মা-ই ছুটে বেরোলেন ঘর থেকে।

মিস্টার কলিনউড বললেন তিন গোয়েন্দাকে, 'তোমরা পাহাড়ের দিকে চলে যাও। হয়তো ভেড়ার বাচ্চাটা ছুটে গিয়েছিলো। ওটাকে খুঁজতে গিয়ে পথ হারিয়ে

থাকতে পারে।'

ষোল

ল্যারির নাম ধরে ডাকতে ডাকতে পুকুরের দিকে চলে গেল জনি। মাঝখানটা বেশ গভীর ওটার, আর ল্যারি সাঁতার জানে না।

রাফিয়ানকে নিয়ে জিনা আর তিন গোয়েন্দা ছুটলো গেটের দিকে।

খাড়া ঢাল বেয়ে ওঠার সময় এদিক ওদিক তাকালো ওরা, বার বার ডাকতে লাগলো ল্যারির নাম ধরে। কিন্তু ছেলেটার ছায়াও নেই। কেন যেন কিশোরের মনে হচ্ছে, ফার্মে নেই ল্যারি। ভেড়ার বাচ্চাটাই হারিয়েছিলো, তাকে খুঁজতে খুঁজতে দূরে কোথাও চলে গেছে সে।

'আমাদের ক্যাম্পে হয়তো গিয়ে বসে আছে,' মুসা বললো। 'ওখানে যাবার খুব ইচ্ছে ওর, দেখলাম সেদিন।'

'গিয়ে থাকলে তো ভালোই,' কিশোর বললো। 'আমার মনে হয় না। একা একা অতদূরে যায়নি সে কখনও। চেন্নার কথা নয়।'

'কি যে শুরু হলো আজ! খালি লোক হারানোর খবর শুনছি!' জিনা বললো। 'প্রথমে গেল রিড আর জ্যাক, কোথায় আছে কেউ জানে না। এখন ল্যারি নিখোঁজ!'

'কোনো ছুটিই কি আরামে কাটাতে পারবো না আমরা?' রবিনের প্রশ্ন। 'যেখানেই যাই, উত্তেজনা আর রহস্য যেন আমাদের পায়ে পায়ে গিয়ে হাজির।'

'খালি উত্তেজনা আর রহস্য হলে তো কোনো কথা ছিলো না,' মুসা বললো। 'বিপদ আসে যে! সেটাই মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে।'

ক্যাম্পে এসে পৌঁছলো ওরা। ল্যারি আর টোগোর ছায়াও নেই।

'এবার কোথায় যাই?' জিনা বললো।

'যাবো যেখানেই হোক,' মুসা বললো। 'বলা যায় না কতোক্ষণ লাগবে খুঁজতে। এক কাজ করা যাক, কিছু মুখে দিয়ে নিই। খালি পেটে খুঁজতে বেরিয়ে আমরাও সুবিধে করতে পারবো না।'

'কথাটা মন্দ বলোনি। কিভাবে কোথায় খুঁজবো, ইতিমধ্যে একটা প্ল্যানও করে ফেলা যাবে,' একমত হলো কিশোর।

খাবার, অর্থাৎ শুধু স্যান্ডউইচ তৈরি করতে বসলো জিনা আর রবিন। হাত কাঁপছে জিনার। কোনো জিনিসই ঠিকমতো ধরে রাখতে পারছে না। বললো, 'গেল কোথায় ছেলেটা! কোনো ক্ষতি না হয়ে যায়, আল্লাহ না করুক! সারা সকাল ধরে

নিখোঁজ!'

স্যান্ডউইচ তৈরি হলো।

রবিন ডাকলো, 'এসো, বসে যাও। তা কি ঠিক করলে? কিভাবে কোথায় খুঁজবো?'

'আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়বো আমরা,' কিশোর একটা স্যান্ডউইচ হাতে তুলে নিলো। কিছু টম্যাটো আর গাজর নিয়ে পকেটে ভরলো। 'পাহাড়ের আশেপাশে খুঁজবো। একটু পর পরই ল্যারির নাম ধরে ডাকবো। তোমরা যাবে পাহাড়ের ওই দিকটায়,' রবিন আর জিনাকে বললো সে। 'একজন খুঁজতে খুঁজতে ওপর দিকে উঠবে, আরেকজন নামবে। এই পাশটায় খুঁজবো আমি আর মুসা, একইভাবে। তারপর আমরা দু'জন চলে যাবো প্রজাপতির খামারে। ওখানেও যেতে পারে।'

স্যান্ডউইচ হাতে নিয়েই উঠে পড়লো ওরা। দুই দল চলে গেল দু'দিকে। রাফি একবার গেল এদলের কাছে, আরেকবার ওদলের কাছে। এমনি করে সারা পাহাড়ময় ছুটে বেড়াতে লাগলো সে। একটা কাজ পাওয়া গেছে। সে-ও বুঝে গেছে, ল্যারি হারিয়েছে। ছেলেটা আর টোগোর গন্ধ তার চেনা। বাতাস শুঁকে সেই গন্ধ বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রজাপতির খামারে গিয়ে দেখা গেল, সেখানে কেউ নেই। কারো চিহ্নই নেই খামারে। এমনকি মিসেস ডেনভারও কটেজে নেই, বাইরে কোথাও গেছে। আর দুই প্রজাপতি মানবের তো এ-সময় থাকারই কথা নয়। প্রজাপতি ধরতে বেরিয়েছে।

ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রবিন আর জিনার। দূর থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, একটা পাঁচ বছরের ছেলে আর একটা ভেড়ার বাচ্চাকে দেখেছে কিনা।

জবাব এলো, দেখেনি।

'রেগে রয়েছে এখনও,' জিনা বললো রবিনকে। 'দেখেছো কেমন কাটা কাটা জবাব দিলো? প্রজাপতি না খুঁজে এখন ওরাও আমাদের সাহায্য করলে কাজ হতো।'

আবার আগের জায়গায় জমায়েত হলো তিন গোয়েন্দা, জিনা আর রাফি। প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে ওরা। ল্যারিকে পাওয়া যায়নি। এরপর কি করবে, এই নিয়ে আলোচনা করছে ওরা, এই সময় হঠাৎ কান খাড়া করে ফেললো রাফিয়ান। তারপর চেঁচিয়ে উঠলো উত্তেজিত হয়ে। যেন বোঝানোর চেষ্টা করছে, 'আমি একটা জিনিস বোধহয় পেয়েছি!'

বুঝে ফেললো জিনা। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি, কি পেয়েছিস রাফি?'

কান আরও খাড়া করে ফেললো রাফিয়ান।

'যা যা এগো,' নির্দেশ দিলো জিনা। 'দেখ কি পেয়েছিস!'

চলতে আরম্ভ করলো রাফিয়ান। মাঝে মাঝেই থেমে গিয়ে কান পাতে, শোনে, তারপর আবার চলে। ওরাও শোনার চেষ্টা করছে, কিন্তু কুকুরের মতো প্রখর নয় ওদের শ্রবণশক্তি। কিছুই শুনতে পেলো না।

'আরি!' কিশোর বললো। 'ও তো গুহার দিকে চলেছে! ওদিকে গেছে ল্যারি? ফার্ম থেকে অনেক দূরে, পথও খুব জটিল। কি করে এলো!'

'কি জানি! বুঝতে পারছি না,' জিনা বললো। 'কিন্তু রাফির তো ভুল হওয়ার কথা নয়?'

'যেভাবেই যাক,' মুসা বললো, 'সেটা পরেও জানা যাবে। এখন ছেলেটাকে খুঁজে পেলেই হয়।'

মিনিটখানেক পরেই শোনা গেল একটা ক্লান্ত কণ্ঠ, 'টোগো! টোগো! কোথায় তুই?'

'ল্যারিইইই!' প্রায় একসঙ্গে চিৎকার করে উঠে ছুট লাগালো চারজনে।

অবশ্যই সবার আগে পৌঁছলো সেখানে রাফিয়ান। তিন গোয়েন্দা আর জিনা পৌঁছে দেখলো ছেলেটার মাথা চাটছে সে, তার গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছে ল্যারি। গুহার ঠিক বাইরে বসে আছে। ভেড়ার বাচ্চাটা নেই সাথে।

'ল্যারি! ল্যারি!' বলে চিৎকার করে ছুটে গেল জিনা। কোলে তুলে নিলো তাকে।

বাদামী চোখ মেলে সকলের দিকে তাকালো ল্যারি। মোটেই অবাক হয়নি ওদেরকে দেখে। শান্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলো যেন, 'টোগো পালিয়েছে। ওই ওখানে গিয়ে লুকিয়েছে।' গুহাটা দেখালো সে।

'গেছে, যাক,' মুসা তার গাল টিপে দিয়ে বললো। 'তুমি যে যাওনি, এটাই বুদ্ধিমানের কাজ করেছো। ঢুকলে আর কোনোদিন পাওয়া যেতো না তোমাকে।'

'চলো ওকে বাড়ি নিয়ে যাই,' রবিন বললো।

কিন্তু জিনার কোলে থেকেই লাথি মারতে শুরু করলো ল্যারি। চিৎকার করে বললো, 'না, না, আমি যাবো না! টোগোকে ফেলে যাবো না! টোগো! টোগো!'

'শোনো, ল্যারি,' বোঝানোর চেষ্টা করলো কিশোর। 'গুহার ভেতরে থেকে থেকে শীঘ্রি বিরক্ত হয়ে যাবে টোগো। তখন আপনাআপনিই বেরিয়ে আসবে। তোমার মা তোমার জন্যে কাঁদছেন।'

'কাঁদুক,' সাফ জবাব দিয়ে দিলো ল্যারি। 'আমি টোগোকে ছাড়া যাবো না।'

'তোমার খিদে পায়নি?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

এই উত্তেজনার মুহূর্তেও মুসার কথায় হেসে ফেললো সবাই।

ল্যারি বললো, 'পেয়েছে। কিন্তু টোগোকে ছাড়া খাবো না। টোগো! টোগো! জলদি আয়। আমরা বাড়ি যাবো।'

'ওকে এখুনি নিয়ে যাওয়া দরকার,' রবিন বললো। 'বাড়িতে নিশ্চয় সবার পাগল হওয়ার অবস্থা। টোগো ঢুকতে যখন পেরেছে, বেরিয়েও আসতে পারবে। জন্তুজানোয়ারের অনুভূতি খুব প্রখর। আর যদি বেরোতে না-ই পারে, দুঃখ করা ছাড়া আর কি করার আছে? দড়ি ছাড়া গুহাগুলোয় ঢোকা কোনোমতেই উচিত হবে না।'

'চলো, ল্যারি,' জিনা বোঝালো ওকে। 'টোগো সময় হলেই আসবে। খেলতে গেছে তো ভেতরে। খেলা শেষ হলেই বেরিয়ে আসবে।' ধীরে ধীরে গুহার কাছ থেকে সরে আসতে লাগলো সে। 'তোমার মা যে কাঁদছে, খারাপ লাগছে না তোমার?'

'লাগছে তো।'

'তাহলে চলো বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে টোগোকে নিতে আসবো আমরা আবার।'

অবশেষে রাজি হলো ল্যারি।

খড়িমাটির পথ বেয়ে ফিরে চললো দলটা। সবাই খুশি। ল্যারিকে খুঁজে পাওয়ার উত্তেজনায় জ্যাক আর রিডের কথা ভুলেই গেছে ওরা।

ছেলেকে দেখে ছুটে এলেন মিসেস কলিনউড। জিনার কোল থেকে নিয়ে নিলেন তাকে। জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে কেঁদে বললেন, 'কোথায় চলে গিয়েছিলি তুই, ল্যারি? ওই ভেড়ার বাচ্চাটাই তোর সর্বনাশ করলো! গেল কই হতচ্ছাড়াটা!'

'ওকে গাল দিচ্ছো কেন? ওর খেলতে ইচ্ছে করে না? গুহার ভেতরে খেলতে গেছে।'

সব শুনে শিউরে উঠলেন মিসেস কলিনউড। ওই গুহায় ল্যারি ঢুকলে কি সর্বনাশ হতো সেকথা আর ভাবতে চাইলেন না তিনি।

'খাবার দাও, মা, খিদে পেয়েছে,' ল্যারি বললো।

সে বসলো খেতে, আর টেবিল ঘিরে সবাই বসলো তার খাওয়া দেখতে। আজ যেন ল্যারির খাওয়াটাই এক নতুন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গপগপ করে খেতে লাগলো ল্যারি। তার খাওয়া দেখেই বোঝা গেল কি প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে।

খাওয়া শেষ করেই চেয়ার থেকে নেমে পড়লো ল্যারি, 'আমি টোগোকে আনতে যাবো।'

'না না, তোমার যাবার দরকার নেই,' তাড়াতাড়ি ছেলের হাত ধরলেন মা।

'আমি কেক বানাতে যাচ্ছি, তুমি আমার কাছে বসে থাকবে। সময় হলে আপনিই ফিরে আসবে টোগো।'

সত্যিই ফিরে এলো টোগো। তিন গোয়েন্দা, জিনা আর জনি বসে কথা বলছে তখন পুকুর পাড়ে। নাচতে নাচতে চত্বরে ঢুকলো বাচ্চাটা। মানুষ দেখেই ব্যা ব্যা করে উঠলো।

'টোগো, এসেছিস! আয়, আয়, এদিকে আয়!' চিৎকার করে ডাকলো জনি। 'আর, তোর পিঠে লিখলো কে?'

ভুরু কোঁচকালো কিশোর।

লেখাটা পড়ার চেষ্টা করে পারলো না মুসা। বললো, 'শয়তান লোকের কাজ। বাচ্চাটাকে একা পেয়ে তার পিঠে কি লিখে দিয়েছিলো। মুছে গেছে।'

'ওর সাদা রঙটাই নষ্ট করে দিয়েছে,' জিনা বললো জনিকে, 'ধুয়ে ফেলো। বিচ্ছিরি লাগছে দেখতে।'

'দাঁড়াও!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো কিশোর। জে আর এম-এর মতো লাগছে আমার কাছে। আর ওই দুটো অক্ষর বোধহয় আর এবং পি, না না, বি! নিচের অংশটা মুছে যাওয়ায় পি-এর মতো লাগছে।'

'জে এম! আর বি!' উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে যাবে যেন জনির। কোটর থেকে চোখ প্রায় ঠিকরে বেরোনোর অবস্থা। 'তার মানে কি জ্যাক ম্যানর আর রিড বেকার! কে লিখলো?'

'আরও অক্ষর আছে ওর পিঠে, ছোট ছোট করে লেখা!' কিশোর বললো, 'শক্ত করে ধরে রাখো ওকে। পড়ার চেষ্টা করি। আমার বিশ্বাস জ্যাক আর রিডই ওকে দিয়ে মেসেজ পাঠিয়েছে। ওদের কাছেই চলে গিয়েছিলো বাচ্চাটা!'

প্রায় মুছে যাওয়া অক্ষরগুলো পড়ার চেষ্টা করতে লাগলো সবাই। মোট চারটা অক্ষর আছে বলে মনে হচ্ছে। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এসেছে বোধহয় বাচ্চাটা, পাতার ঘষায় ঝাপসা হয়ে গেছে অক্ষর।

'শব্দটা কেভ!' দেখতে দেখতে বললো কিশোর। 'প্রথম অক্ষরটাকে জি. ও. সি. যা খুশি ধরা যায়। কিন্তু তৃতীয় শব্দটা ভি, কোনো সন্দেহ নেই। আমি শিওর লেখাটা কেভ, মানে গুহা। আর গুহার ভেতরেই ঢুকেছিলো টোগো।' মুখ তুললো সে। 'তাহলে ওখানেই নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে জ্যাক আর রিডকে আর আমরা কিনা ভাবছিলাম···তোমার বাবা কোথায়, জনি?'

গোলাঘরের পেছনে পাওয়া গেল কলিনউডকে। কাজ করছেন। ভেড়ার বাচ্চা আর ওটার পিঠের লেখা দেখানো হলো তাঁকে।

'কি করবো এখন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'গুহায় ঢুকবো? না পুলিশকে

ফোন করবেন?'

'পুলিশকে অবশ্যই জানানো দরকার,' কলিনউড বললেন। 'তোমরা গুহায় চলে যাও। সাথে করে দড়ি নিয়ে যাও বেশি করে। দড়িওয়ালা গুহাগুলোয় ওদেরকে রাখার সম্ভাবনা কম, কারণ ওগুলোতে প্রায়ই লোক ঢোকে দেখার জন্যে। দড়ির একমাথা ধরে সুড়ঙ্গের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে একজন। আরেক মাথা ধরে অন্যেরা ভেতরে ঢুকবে। এতে হারানোর ভয় থাকবে না। বুঝতে পেরেছো আমার কথা?'

মাথা কাত করলো কিশোর। 'আপনি না বললেও তা-ই করতাম। তাছাড়া রাফিকে তো নিয়েই যাচ্ছি। ও অনেক সাহায্য করতে পারবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পুলিশে ফোন করতে চলে গেলেন কলিনউড।

'জনি,' কিশোর বললো, 'জলদি গিয়ে দড়ি নিয়ে এসো। আর টর্চ, যে ক'টা পারো। মোমবাতি আর দেশলাইও আনবে। গুহায় ঢুকে বিপদে পড়তে চাই না।'

সতের

ঝাড়-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে প্রায় দৌড়ে চলেছে দলটা। ভেড়ার বাচ্চাটা মুসার কোলে। ওটা বুঝতেই পারছে না ব্যাপারটা কি? মানুষগুলো এরকম করছে কেন? আর সে-জন্যেই যেন থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে ব্যা ব্যা করে। শরীর মুচড়ে, লাথি মেরে নেমে পড়তে চাইছে কোল থেকে, কিন্তু কেউ তার আবেদন কানে তুলছে না। দরকার আছে বলেই নিয়েছে ওকে।

অবশেষে গুহায় যাবার খড়িমাটি বিছানো পথে এসে পড়লো ওরা। জুতোর ঘায়ে বিচিত্র শব্দ করে ছিটকে কিংবা গড়িয়ে পড়ছে আলগা খড়িমাটির টুকরো। ওরা এসে দাঁড়ালো প্রবেশপথের কাছে, যেটার কপালে লেখা রয়েছে সাবধান-বাণী।

ভেড়ার বাচ্চাটাকে মাটিতে নামিয়ে শক্ত করে ধরে রাখলো মুসা। জিনা ডাকলো, 'রাফি, এদিকে আয়। শোঁক টোগোকে। গন্ধটা মনে রাখ। তারপর ওর পিছে পিছে যাবি, যেখানেই যায়। দেখতে না পেলে গন্ধ শুঁকে শুঁকে এগোবি।'

অযথা এসব কথা বললো জিনা। কিভাবে অনুসরণ করতে হয় খুব ভালোই জানা আছে রাফিয়ানের। টোগোর গন্ধ তার পরিচিত, তবু জিনার কথায় আরেকবার ভেড়ার বাচ্চাটার আগা-পাশ-তলা শুঁকলো সে।

টোগোকে ছেড়ে দিলো মুসা। রাফিকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে বললো জিনা। জানে পারবে, তবু নিশ্চিত হতে চায় টোগোর গন্ধ শুঁকে ঠিকমতো এগোতে

পারে কিনা রাফি। মাটি আর বাতাস শুঁকতে শুঁকতে প্রায় ছুটে চললো কুকুরটা। প্রথম গুহাটায় এসে ঢুকলো। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিরে তাকালো জিনার দিকে।

'যা যা, এগো রাফি,' আদেশ দিলো জিনা। 'বুঝতে পারছি, টোগোর পিছু নিয়ে এই অদ্ভুত গুহায় তোকে ঢুকতে বলায় তোর অবাক লাগছে। কিন্তু ঢুকতে বলার কারণ আছে। আমরা জানতে চাই, বাচ্চাটা কোথায় যায়।' এতো কথা বললো সে এই জন্যে, তার আশঙ্কা হচ্ছে বিরক্ত হয়ে না আবার এই 'মজার খেলাটা' বন্ধ করে দেয় রাফি।

কিন্তু বন্ধ করলো না রাফিয়ান। আবার মাটি শুঁকলো।

সেই গুহাটায় এসে ঢুকলো সে, যেটাতে রঙের সৃষ্টি করেছে বরফের ঝাড় আর স্তম্ভ। চকচকে উজ্জ্বল রঙিন থামের মতো লাগছে কোনো কোনোটাকে। ওটা পেরিয়ে ঢুকলো আরেকটা গুহায়, যেটাতে সব চেয়ে বেশি রঙ। রামধনুর সাত রঙের বাহার দেখা যায় যেখানে। যেটাকে পরীর রাজ্য মনে হয়েছিলো জিনার। সেটা পেরিয়ে ঢুকলো আরেক গুহায়, যেখানে দড়ি ছাড়া সুড়ঙ্গ রয়েছে কয়েকটা।

'এই যে, তিনটে সুড়ঙ্গ,' জিনা বললো। 'আমার মনে হয় না, দড়িওয়ালা সুড়ঙ্গ ধরে ঢুকবে রাফি…'

তার কথা প্রমাণ করতেই যেন একটা দড়িছাড়া সুড়ঙ্গের মুখের কাছে মাটি শুঁকতে শুরু করলো রাফি। বাঁয়ের একটা পথ, যেটাতে সেদিন আচমকা ঢুকে গিয়েছিলো সে, তারপর অনেক ডাকাডাকি করে বের করে আনতে হয়েছে।

ঢুকে পড়লো সবাই। প্রত্যেকের হাতেই টর্চ জ্বলছে।

'আমিও ভেবেছিলাম…,' বলেই থেমে গেল জিনা। তার কথার প্রতিধ্বনি উঠলো সুড়ঙ্গের দেয়ালে বাড়ি খেয়েঃ আমিও ভেবেছিলাম, আমিও ভেবেছিলাম… ভেবেছিলাম…ছিলাম… ছিলাম…ইলাম…

'সেদিনকার চিৎকারের মানে এখন বুঝতে পারছি,' প্রতিধ্বনির ভয়ে কণ্ঠস্বর একেবারে খাদে নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। 'ডাকাতগুলো চিৎকার করেছে, জোরে জোরে শিস দিয়েছে। সুড়ঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওই শব্দ হয়ে উঠেছিলো ভয়ঙ্কর। আমার বিশ্বাস রাফির ঘেউ ঘেউ ওরা শুনতে পেয়েছিলো। ঘাবড়ে গিয়েছিলো মানুষ আসছে ভেবে। কাজেই ভয় দেখিয়ে আমাদেরকে তাড়ানোর জন্যে ওরকম শব্দ করেছিলো।'

'আর সত্যি…' বলেই প্রতিধ্বনি শুনে গলার স্বর নামিয়ে ফেললো রবিন, 'আমরা ভয় পেয়ে পালিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো, ওই শয়তানগুলো ওরকম আওয়াজ করেছিলো। এছাড়া ওরকম অদ্ভুত আওয়াজের আর কোনো ব্যাখ্যা নেই।… আরিব্বাবারে, কি লম্বা সুড়ঙ্গ! আর কি রকম এঁকেবেঁকে ঘুরে ঘুরে

গেছে!...আরে, সামনে দেখি আবার দুই মুখ! কোনটা দিয়ে যাবো?'

'সেটা রাফিই বলে দেবে,' জিনা বললো। একটা সুড়ঙ্গের মুখের কাছের মাটি ইতিমধ্যেই শুঁকতে আরম্ভ করেছে রাফি, এবারও বাঁয়েরটা।

'দড়ি আনার দরকারই ছিলো না,' জনি বললো। 'রাফি যেভাবে পথ চিনে এগোচ্ছে, আমাদের অসুবিধে হতো না। ঠিক বের করে নিয়ে আসতো।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'দড়ির চেয়ে অনেক ভালো পথপ্রদর্শক সে। তবে ও না থাকলে দড়ি অবশ্যই ব্যবহার করতে হতো। নইলে এই সুড়ঙ্গ আর গুহার গোলকধাঁধা থেকে বেরোনো মুশকিল হয়ে যেতো। মনে হয় পাহাড়ের একেবারে পেটের মধ্যে চলে এসেছি...'

এই সময় হঠাৎ থেমে গেল রাফি। মাথা তুলে পাশে কাত করে কান পেতে শুনছে। জ্যাক আর রিডের সন্ধান কি পেয়ে গেল? ঘেউ ঘেউ করে উঠলো একবার। বদ্ধ জায়গায় বিকট হয়ে কানে বাজলো সেই ডাক।

কাছেই কোনোখান থেকে শোনা গেল তার ডাকের জবাবঃ এইই! এইই! এই যে! এখানে! এখানে!

'জ্যাক ভাইয়া!' প্রতিধ্বনির কথা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠলো জনি। আনন্দে অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যেই লাফাতে শুরু করলো। 'জ্যাক ভাইয়া, শুনছো! আমিইইই, আমি জনিইই!'

সাথে সাথে সাড়া এলো, 'জনি, এই যে এদিকে! বুঝতে পারছিস?'

প্রায় ছুটে এগোলো রাফিয়ান। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো হঠাৎ। আগে আগে চলেছে কিশোর, আরেকটু হলে তার গায়ের ওপরই পড়তো। প্রথমে বুঝতে পারলো না কি ব্যাপার। তারপর টর্চের আলোয় স্পষ্ট হলো নিরেট দেয়াল, ওদের পথ আগলে যেন এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে টোগো। অবাক কাণ্ড! সামনে দেয়াল, অথচ জ্যাকের কণ্ঠ কানে আসছে!

'এই যে, আমরা এখানে!'

বোঝা গেল, কিভাবে আসছে। রাফিয়ান যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার পাশেই মেঝেতে একটা ফোকর। কিশোরের টর্চের আলো পড়লো তার ওপর। বললো, 'ওই যে, ওখানেই আছে! ওই গর্তে! জ্যাকভাই, ওখানেই আছেন, না? জবাব দিন!'

জবাব এলো।

আরেকটু সামনে এগিয়ে গর্তের ভেতর আলো ফেললো কিশোর। ওই তো, গুহার মেঝেতে পড়ে রয়েছে একজন মানুষ। পাশে দাঁড়িয়ে আরেকজন, জ্যাক ম্যানর। শুয়ে থাকা লোকটাই তাহলে রিড।

'ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ, আমাদের খুঁজে পেয়েছো তোমরা,' জ্যাক বললো। 'ওরা আমাদেরকে এখানে রেখে চলে গেল, আর এলো না। হঠাৎ পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছে এই গর্তে। রিডের গোড়ালি মচকে গেছে। আমি ভালোই আছি, কিন্তু উঠবো কিভাবে? অনেক চেষ্টা করেছি, পারিনি। কারও সাহায্য ছাড়া পারবোও না।'

'আর কোনো অসুবিধে নেই, জ্যাক ভাইয়া, আমরা এসে গেছি,' কিশোরের পাশে দাঁড়িয়ে গর্তের ভেতরে উঁকি দিয়ে বললো জনি। 'কিভাবে তুললে সুবিধে হবে? গর্তের মুখটা তো বেশি বড় না।'

'প্রথমে আমাকে টেনে তোলো,' জ্যাক বললো। 'তারপর দু'জন গর্তে নেমে রিডকে তুলে ধরবে, তখন তাকে আমি টেনে তুলে নিতে পারবো। এমন বাজে জায়গা আর দেখিনি! ওই গর্তটা ছাড়া বেরোনোর আর কোনো জায়গাই নেই। কতো লাফালাফি যে করলাম! ছুঁতেই পারলাম না ওপরের ধার! আর রিড তো দাঁড়াতেই পারে না।'

শুধু কিশোর আর জনিকে দিয়ে হলো না। মুসাকেও হাত লাগাতে হলো। তারপর অনেক কায়দা কসরৎ করে টেনে তোলা হলো জ্যাককে। সাথে দড়ি না আনলে বের করতে পারতো না। জিনা আর রবিনও হাত গুটিয়ে বসে নেই। টোগোকে আটকে রেখেছে জিনা, ওটা কেবলই ছুটে একদিকে চলে যেতে চায়। আর রবিন দুই হাতে দুটো টর্চ উঁচিয়ে রেখেছে।

অবশেষে উঠে এলো জ্যাক। দড়ি ধরে নেমে গেল কিশোর আর মুসা। ঘোরের মধ্যে রয়েছে যেন রিড। ঘোলাটে দৃষ্টি। জ্যাকের ধারণা, মাথায়ও আঘাত পেয়েছে রিড। দু'দিক থেকে ধরে তাকে তুলে দাঁড় করালো কিশোর আর মুসা। এক পা বাঁকা করে বেকায়দা ভঙ্গিতে দাঁড়ালো সে, মুসার কাঁধে ভর রেখে। বের করা শক্ত।

তবে বেশি ভারি না রিড, এই যা সুবিধে। দুই হাতে ধরে তাকে মাথার ওপর তুলে ধরলো মুসা, অনেকটা টারজানের মতো। সুড়ঙ্গের মেঝেতে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে শুয়ে পড়লো জ্যাক। মেঝে ঢালু, তাই মাথা পায়ের চেয়ে নিচুতে। পিছলে আবার গর্তে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। কিন্তু পরোয়া করলো না সে। পেছনে একই ভাবে শুয়ে পড়ে শক্ত করে তার পা জড়িয়ে ধরে রইলো জনি।

বুক পর্যন্ত গর্তের কিনারে বাড়িয়ে দিয়ে ঝুলে পড়লো জ্যাক। হাত বাড়ালো নিচের দিকে। রিডের হাতের নাগাল পেয়ে শক্ত করে ধরলো। তারপর ইঞ্চি ইঞ্চি করে টেনে তুলতে লাগলো। নিচ থেকে ঠেলে রেখেছে কিশোর আর মুসা।

অবশেষে তুলে আনা হলো রিডকে। দড়ি বেয়ে উঠতে মুসা আর কিশোরের খুব একটা অসুবিধে হলো না, কারণ জনি আর জ্যাক তো রয়েছেই সাহায্য করার

জন্যে।

খুব মজার একটা ব্যাপার ঘটে গেছে ভেবে আর চুপ থাকা সমীচীন মনে করলো না রাফি। ঘাউ ঘাউ করে হাঁক ছাড়লো কয়েক বার, বদ্ধ জায়গায় কানে তালা লাগিয়ে দিলো সকলের। ভয় পেয়ে ডেকে উঠলো ভেড়ার বাচ্চাটা, জিনার হাত থেকে ছুটে যাওয়ার জন্যে ছটফট করতে লাগলো।

'হউফ!' করে জোরে নিঃশ্বাস ফেললো জ্যাক। 'আর কোনোদিন বেরিয়ে আসতে পারবো ভাবিনি! বাপরে, কি জায়গা! দম বন্ধ করে দেয়! চলো, এখানে আর এক মুহূর্তও না। বেরোই। আলোবাতাস দরকার। পানির অভাবে বুকটা শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে। হারামজাদাগুলো সেই যে ফেলে চলে গেল, আর এলো না!'

আবার পথ দেখিয়ে দলটাকে গুহার বাইরে বের করে নিয়ে এলো রাফিয়ান। স্বচ্ছন্দে। এবার আর মাটি কিংবা বাতাস শোঁকারও প্রয়োজন বোধ করেনি। ভুল করেনি একটিবারের জন্যেও। ভেড়ার বাচ্চাটা কিভাবে নিরাপদে বেরিয়ে গিয়েছিলো, এখন বোঝা গেল। অনুভূতি ওটারও যথেষ্ট প্রখর। ইন্দ্রিয়ের এই প্রখরতা কেবল মানুষেরই নেই।

উজ্জ্বল সূর্যালোকে বেরিয়ে এসে চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওদের। বিশেষ করে রিড আর জ্যাকের। দীর্ঘ সময় গাঢ় অন্ধকারে বন্দী ছিলো ওরা। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফেললো দু'জনেই।

'এখানে কিছুক্ষণ বসে আগে চোখের আলো সইয়ে নিন,' কিশোর পরামর্শ দিলো, 'নইলে হাঁটতে পারবেন না। তারপর আমাদের বলুন, ভেড়ার বাচ্চাটার গায়ে মেসেজ লিখলেন কিভাবে? ওটাও কি গর্তে পড়ে গিয়েছিলো?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো জ্যাক। 'আমাদের গর্তে ফেলে দিয়ে লোকগুলো চলে গেল। আমরা পড়েই আছি, পড়েই আছি। দিনরাত্রির প্রভেদ বোঝার উপায় নেই। সময় কতো, কি বার, কিছুই বুঝতে পারছি না। কোনো শব্দও নেই। তারপর হঠাৎ করেই কানে এলো মৃদু খটখট আওয়াজ। কিসের, বুঝতে পারলাম না। তখনও জানি না পাথরে লেগে ভেড়ার বাচ্চাটার খুরের শব্দ হচ্ছিলো। অবাক হলাম। আমাদের আরও অবাক করে দিয়ে গর্তে পড়লো বাচ্চাটা। একেবারে আমার ওপরেই। পড়েই চেঁচাতে শুরু করলো গলা ফাটিয়ে। বের করে দিতে গিয়েও থেমে গেলাম। বুদ্ধিটা এলো মাথায়। মনে করলাম, বাইরে বেরোলে লোকের চোখে পড়বেই। যদিও বুঝতে পারছিলাম না কি করে ঢুকলো ওটা, আবার ঠিকমতো বাইরে বেরোতে পারবে কিনা এসব।'

'লিখে দিয়েছিলেন বটে,' মুসা বললো, 'কিন্তু আরেকটু হলেই নষ্ট হয়ে যেতো আপনার মেসেজ। প্রায় মুছেই গিয়েছিলো।'

'তবু, শেষ পর্যন্ত বুঝতে তো পেরেছো,' জোরে নিঃশ্বাস ফেললো জ্যাক। রিড

হাত পা ছড়িয়ে চুপ করে বসে আছে, চোখ বন্ধ। তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার বললো সে, 'সুড়ঙ্গে ঢোকানোর পর পরই আমাদের সমস্ত জিনিস কেড়ে নিয়েছে ডাকাতগুলো। ঘড়ি, টাকাপয়সা, এমনকি কলমটা পর্যন্ত।'

'তাহলে লিখলেন কি দিয়ে?' জিনা জিজ্ঞেস করলো।

'রিডের প্যান্টের পকেটে একটুকরো কালো চক ছিলো,' জ্যাক জানালো। 'ওই চক আমাদের কাছে থাকে। চিহ্ন দেয়ার জন্যে ব্যবহার করি আমরা। বিশেষ করে বড় বড় ম্যাপে এয়াররুটগুলোর ওপর। বাচ্চাটাকে ধরে রাখলো রিড, আমি ওটার পিঠে লিখলাম। অন্ধকারে কি লিখছি, তা-ও বোঝার উপায় ছিলো না। পড়তে যে পেরেছো, এটাই আমাদের ভাগ্য। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গর্তের বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছি বাচ্চাটাকে। ভয় পেয়ে, কিংবা ব্যথা পেয়ে, যে কারণেই হোক, গলা ফাটিয়ে কয়েকবার চেঁচালো ওটা। তারপর দিলো দৌড়, যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে। কি কাণ্ড, বলো তো? যেন আমাদের মেসেজ নেয়ার জন্যেই এসেছিলো ওটা! দুনিয়াতে অনেক রহস্যময় ব্যাপারই ঘটে, যার কোনো ব্যাখ্যা নেই। আবার কাকতালীয় ব্যাপার বলতেও ইচ্ছে করে না!'

'হুঁ,' মাথা দোলালো জনি। 'নইলে ল্যারিই বা ওটার জন্যে পাগল হবে কেন? আর ওটারই বা ঘুরে বেড়ানোর এতো শখ হবে কেন? যখন-তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এদিক সেদিক চলে যায়। আর গেলেই ওটার পিছে পিছে ছোটে ল্যারি। এজন্যে সবাই মিলে কতো বকাবকি করি দু'জনকে। অথচ আজ এটার এই বাড়ি-পালানো স্বভাবের কারণেই খুঁজে পাওয়া গেল তোমাদেরকে! নইলে কোনোদিনই ওই গর্ত থেকে...'

'আর বলিস না, বলিস না!' তাড়াতাড়ি হাত নাড়লো জ্যাক। 'দম বন্ধ হয়ে আসছে!...আচ্ছা, এবার বল দেখি, আমরা গায়েব হয়ে যাওয়ায় এয়ারফীল্ডে শোরগোল ওঠেনি?'

'উঠেছে,' রবিন বললো। 'আপনাদের দু'জনের প্লেন দুটো যে চুরি হয়েছে জানেন? যে দুটো আপনারা চালাতেন?'

'আন্দাজ করেছি। ওরাও আমাদেরকে ধরে নিয়ে এলো, ওদিকে প্লেনও উড়লো দুটো।...একটা কুকুরের চিৎকার কানে আসছিলো, পাহাড়ের ওপর থেকে। বুঝতে পেরেছি, রাফিয়ান। ইস্, যদি তোরা তখন বুঝতে পারতি আমাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাহলে ছুটে আসতে পারতি।'

'হ্যাঁ, ঝড়ের রাতে অনেক ঘেউ ঘেউ করেছে রাফি,' জিনা বললো। 'আমি ওকে ধমক দিয়ে থামিয়েছি। যদি বুঝতে পারতাম ডাকাতদের দেখে চিৎকার করেছে ও...যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর ওসব বলে লাভ নেই।'

'প্লেনগুলোর কি হয়েছে, জানো কিছু?'

'শুনেছি, ঝড়ের মধ্যে উড়তে গিয়ে সাগরে ভেঙে পড়েছে। পাইলটদের পাওয়া যায়নি,' জনি জানালো।

'ও,' বিষণ্ন হয়ে গেল জ্যাক। 'আমার খুব প্রিয় ছিলো প্লেনটা! আর ওড়াতে পারবো না! রিড, তোমারও নিশ্চয় খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ, ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো রিড। গুহা থেকে বেরিয়ে খোলা বাতাসে আসার পর অনেকটা সুস্থ লাগছে তাকে, ঘোরের ভাবটা আর নেই! 'চল, যাওয়া যাক।'

হাঁটতে জ্যাকের অসুবিধে হলো না, কিন্তু রিড একেবারেই পারলো না। পালা করে তাকে বয়ে নিয়ে চললো ছেলেরা। জিনার কোলে টোগো। ছাড়লেই সোজা পথে না গিয়ে ওটা আরেক দিকে চলে যেতে চায়।

মাঝপথে দেখা হলো পুলিশের সঙ্গে। কলিনউডের ফোন পেয়ে গুহার দিকেই আসছিলো। রিডের দায়িত্ব নিলো ওরা।

ফার্মে ফিরে এলো ছেলেমেয়েরা। উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলেন জনির বাবা, মা, আর ল্যারি। উষ্ণ সংবর্ধনা জানালেন সবাইকে। জিনার কোল থেকে টোগোকে প্রায় কেড়ে নিলো ল্যারি। জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে বললো, 'পালিয়ে যাওয়ার অভ্যাসটা তুই ছাড়, বুঝেছিস!' বড়দের মতো করে বললো সে। 'বড় খারাপ অভ্যাস! ধরে একদিন এমন মার লাগাবো...' কথা আর শেষ হলো না তার। যেন বুঝতে পেরেই মারের ভয়ে ঝটকা দিয়ে তার হাত থেকে ছুটে গিয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়লো বাচ্চাটা। তিড়িং বিড়িং করে খানিকটা লাফিয়ে নিয়ে দৌড় দিলো গোলাঘরের দিকে। ওটাকে ধরে আনতে ছুটলো ল্যারি।

বাচ্চা দুটোর কাণ্ড দেখে হাসতে আরম্ভ করলো সবাই। এমনকি রিডও পায়ের ব্যথা ভুলে গিয়ে হেসে উঠলো।

'পাগল ছেলে!' সস্নেহে সেদিকে তাকিয়ে বললেন মা। 'থাক, আর কিচ্ছু বলবো না টোগোকে। ওটার জন্যেই আজ ওদের ফিরে পাওয়া গেল...আরে, তোমরা সব দাঁড়িয়ে কেন? এসো এসো, ঘরে এসো। চা-নাস্তা রেডিই আছে।'

'ওসব নাস্তা-ফাস্তায় কাজ হবে না আমার,' হেসে হাত নাড়লো জ্যাক। 'আমার আর রিডের ভুড়িভোজন দরকার। কখন যে শেষ খেয়েছি, ভুলেই গেছি।'

'ঠিক আমার কথাটা বলেছেন,' ভুড়ি বাজালো মুসা। 'কখন যে খেয়েছি মনেই নেই। এতো খাটাখাটনি করেছি, মনে হচ্ছে নাড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে গেছে। আন্টি, দুটো বড় বড় কেক, আর অন্তত খানকুড়ি মাংসের বড়া না হলে চলবে না আমার।'

'পাগল ছেলে!' মুসার দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয়বার বললেন মিসেস কলিনউড।
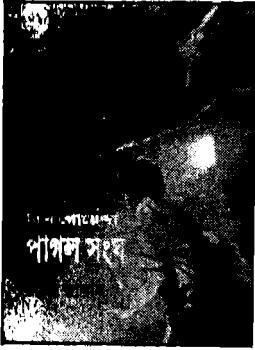
প্রথম প্রকাশঃ মে, ১৯৯১

'আহ্, বন্ধ করো,' অনুনয় করলো কিশোর, 'বন্ধ করো ওটা।'

সুইভেল চেয়ারে এলিয়ে পড়েছে সে। খসখসে হয়ে উঠেছে কণ্ঠস্বর। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। তার সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ দু'জন বন্ধুর সামনে অত্যাচার করা হচ্ছে তাকে, অথচ সেটা থামানোর কোনো চেষ্টা করছে না ওরা। বরং তার কষ্ট দেখে হাসছে মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ড।

ওদের গোপন হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিনজনেই। তাকিয়ে রয়েছে একটা টেলিভিশন সেটের দিকে। পর্দায়, রান্নাঘরের একটা বড় টেবিলের ওপর আসন মুড়ে বসে রয়েছে গোলগাল খুব মোটা একটা বাচ্চা। তার হাত মুচড়ে পেছন দিকে নিয়ে গেছে আট-নয় বছরের একটা ছেলে। এগারো বছরের আরেকটা ছেলে চিনামাটির বাটিতে কি যেন গুলছে। এই ছেলেটা লম্বা, পাতলা, মাথার চুল কামানো, ডিমের মতো চকচক করছে সাদা মাথার চামড়া, স্পষ্ট দেখা যায়। ওর হাবভাব দেখে ওই ডিমের মতো খুলির ভেতরে ডিমের কুসুম ছাড়া মগজ বলে আর কোনো পদার্থ আছে বলে মনে হয় না।

'না না, প্লীত (প্লীজ),' অস্বাভাবিক ভারি গলায় অনুনয় করলো বাচ্চা ছেলেটা, 'প্লীত, আমার বতন্ত (বসন্ত) দরকার নাই।'

'বন্ধ করো!' আবার অনুরোধ করলো কিশোর। 'দোহাই তোমাদের, বন্ধ করো ওটা!'

'কিন্তু আমি তো দেখতে তাই (চাই),' বাচ্চাটার অনুকরণে বললো মুসা হেসে, 'দেখতে তাই থেত পর্দন্ত কি কলে।'

'এসো মোটুরাম, জলহস্তীর বাচ্চা,' হেসে বললো পর্দার একটা ছেলে, 'কাছে এসো।' এই ছেলেটা নিগ্রো, গাঁট্টাগোট্টা শরীর, শজারুর কাঁটার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে শক্ত চুল। বয়েস বারো। হাসিটা এতোই নিষ্পাপ, দুনিয়ার কোনো খারাপ কাজ সে করতে পারে বলে মনে হয় না। 'তোমার আম্মু আর আব্বু যখন দেখবে তোমার গুটিবসন্ত হয়েছে, ভয়ে চোখ উল্টে দেবে। তোমার সাথে ছিলাম বলে সবাই ভাববে ছোঁয়াছে রোগটা আমাদের রক্তেও ঢুকেছে। তখন আর আমাদের ইস্কুলে যেতে হবে

না।'

'হ্যাঁ,' তার সুরে সুর মেলালো যেন বিশাল পা-ওয়ালা আরেকটা ছেলে, 'সবাই তাই ভাববে।'

পর্দায় মাথাকামানো ছেলেটার নাম 'মড়ার খুলি', তরল জিনিসটা গোলা শেষ করেছে সে। এগিয়ে গেল বাচ্চাটার দিকে।

দু'হাতে চোখ ঢাকলো কিশোর পাশা। এরপর কি ঘটবে জানা আছে। পরিষ্কার মনে আছে তার, কান নাচাতে পারে ডিমের মতো মাথাওয়ালা ছেলেটা। এতো ঘন ঘন নাচায়, বড় বড় লতিদুটোকে তখন মনে হয় জেলি, কানের নিচে লেগে থেকে ঝুলছে। অভিনেতা হিসেবে এটা তার একমাত্র গুণ।

মুসা আর রবিনের হাসি কিশোরের গায়ে জ্বালা ধরালো।

কান নাচাতে নাচাতে গিয়ে একটা রঙ লাগানোর তুলি তুলে আনলো মড়ার খুলি। তারপর বাটি থেকে লাল রঙ তুলে তুলে লাগিয়ে দিতে লাগলো বাচ্চাটার গোলগাল মুখে। শরীর মুচড়ে সরে যাবার চেষ্টা করলো 'মোটুরাম', কিন্তু কাঁদলো না। আগের মতোই হাসি হাসি চেহারা।

কিন্তু কিশোরের মুখে হাসির চিহ্নই নেই। আঙুল ফাঁক করে তার ভেতর দিয়ে আবার তাকিয়েছে টিভির দিকে। বিশ্বাসই করতে পারছে না ওই বাচ্চাটাই ছিলো সে নিজে। বাদামী রঙের ফারমার ওভারঅল পরা গোলআলুর মতো মুখওয়ালা ওই বাচ্চাটা সে ছিলো একথা ভাবতেই ইচ্ছে করছে না। নাকে, গালে, সমানে রঙের ফোঁটা দিয়ে চলেছে মড়ার খুলি যে বাচ্চাটার, সে-ই কি আজকের তুখোড় গোয়েন্দা কিশোর পাশা, যার বুদ্ধি দেখে মাঝে মাঝে দুর্ধর্ষ পুলিশবাহিনীরও তাক লেগে যায়?

বিশ্বাস করতে না চাইলেও উপায় নেই, জানে কিশোর। একসময় 'মোটুরাম' ছিলো তার উপাধি, ইংরেজি শব্দটার বাংলা করলে অবশ্য এই নামই দাঁড়ায়। আধ ঘন্টার একটা টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করতো সে। ছবিটার বাংলা নাম করলে দাঁড়ায় 'পাগল সংঘ'।

জীবনের ওই সময়টাকে ভুলে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে কিশোর। তিন বছর বয়েসে নিজের ইচ্ছেয় সে ওই ছবিতে অভিনয় করতে যায়নি। তবে বাবা-মাকেও দোষ দেয় না সে। তাঁরা চেয়েছিলেন একদিন বড় অভিনেতা হবে তাঁদের ছেলে।

একজন বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক ছিলেন কিশোরের বাবার বন্ধু। প্রায়ই আসতেন তাদের বাড়িতে। এক রোববার বিকেলে খেলতে খেলতে বাচ্চা কিশোর এসে হাজির হলো তাঁর সামনে।

'বড় হয়ে খুব ভালো নাচতে পারবে তুমি, খোকা,' হেসে বললেন পরিচালক।

'না,' ওই বয়েসেই অবিশ্বাস্য রকম ভারি গলায় দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলো

কিশোর, 'আমি নাচবো না। আমি পুলিশ হবো। চোর-ডাকাত ধরবো। চোরেরা আমার ভয়ে কাঁপবে।'

কিশোরের কথা শুনে দীর্ঘ এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইলেন পরিচালক। তারপর তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বয়েস কতো?' ছেলেটার পাকা পাকা কথা শুনে তাজ্জব হয়ে গেছেন।

'দুই বছর এগারো মাস', জবাব দিয়েছেন বাবা।

এরপর যাওয়ার আগে আর কিশোরের সম্পর্কে একটি কথাও বললেন না পরিচালক। তবে গাড়িতে ওঠার পর আরেকবার বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে আপনমনেই বিড়বিড় করলেন, 'অসাধারণ প্রতিভা! কাজে লাগাতে পারলে...'

কয়েকদিন পরেই এক আজব জায়গায় কিশোরকে নিয়ে গেলেন তার বাবা। স্ক্রীন টেস্ট নেয়া হলো তার। কয়েক মাসের মধ্যেই 'পাগল সংঘ'-এর 'মোটুরাম' হয়ে গেল কিশোর।

ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন পরিচালক। ছেলেটা সত্যিই অসাধারণ বুদ্ধিমান। আর অভিনয় যেন সে মায়ের পেট থেকেই শিখে এসেছে, একেবারে স্বাভাবিক, বাস্তব হাসি, কথাবার্তা। পরিচালক যা যা করতে বলেন, ঠিক তা-ই করে। সংলাপ মুখস্থ করায়ও জুড়ি নেই মোটুরামের। একবার বলে দিলেই যেন মগজে গেঁথে যায়, একটি শব্দও ভুল করে না।

শুধু কিশোরের জন্যেই সাংঘাতিক নাম করেছিলো 'পাগল সংঘ'।

টিভিতে অনেক অভিনয় করেছে কিশোর। সিনেমাতেও করতো, যদি না তার বাবা-মা হঠাৎ মোটর দুর্ঘটনায় মারা যেতেন। হয়তো অভিনেতাই হতে হতো তাকে জীবনে।

বাবা-মা মারা যাওয়ার পর তাকে বাঁচালেন যেন নিঃসন্তান মেরিচাচী। নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আর ছবিতে অভিনয় করবি, কিশোর?'

'না,' সরাসরি জবাব দিলো কিশোর।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠে, স্টুডিওতে গিয়ে ঘাড়ে, মুখে, গলায়, রঙ মাখতে তার আপত্তি নেই। ক্যামেরা আর উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো আলোর সামনে দাঁড়িয়ে ঘামতেও রাজি আছে সে। ক্যামেরার সামনে বসে জটিল ধাঁধা মেলাতে আর অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়ার অভিনয় করতে খুব আগ্রহ তার। তোতলাতে পারে, জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলতে পারে, পরিচালক যা করতে বলেন সব পারে, পারে না শুধু তার সহ-অভিনেতাদের সহ্য করতে।

কিশোর বোঝে কোনটা অভিনয়, আর কোনটা নয়। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় হয়েও মাথামোটা হাবার দলের যেন সেটুকু বোঝার বুদ্ধি নেই। ছবিতে যেমন তাকে খেপায়, ছবির বাইরেও খেপায়। অভিনয় করতে করতে যেন ওদের ধারণা হয়ে গেছে

এটাই স্বাভাবিক। তাই টিফিনের সময় স্টুডিওর ক্যাফেটেরিয়ায় বসেও তার আইসক্রীমে মরিচের গুঁড়ো ঢেলে দেয়। মেকাপ রুমে তার চেয়ারে আঠা মাখিয়ে রাখে। তার ফারমার ওভারঅলের বোতামগুলো কেটে রাখে। আর সব চেয়ে বেশি দুঃখ লাগে, যখন তাকে ওরা মোটুরাম বলে ডাকে। সব সময় ডাকে। ওদের গোবর পোরা মাথাগুলোয় যেন কিছুতেই ঢুকতে চায় না বাস্তব জীবনে সে মোটেই মোটুরাম নয়—কিশোর পাশা।

কাজেই মেরিচাচী যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন 'পাগল সংঘ' ছবিতে আর অভিনয় করবে কিনা, একটা মুহূর্ত দেরি না করে জবাব দিয়ে দিয়েছে সে, 'না।' তার মনে হলো যেন খাঁচায় বদ্ধ একগাদা খেপা বানরের মাঝখান থেকে তাকে মুক্তি দিতে এসেছেন চাচী। ওই মহিলাকে যে সে এতো ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, যা বলেন মুখ বুজে শোনে, এটা তার একটা বড় কারণ। তার মা-ও যেটা করেননি। তাই করেছেন ওই মহিলা, তাকে ওই বয়েসেই মতামতের স্বাধীনতা দিয়েছেন, যা পাওয়ার জন্যে সে আকুল হয়ে ছিলো।

কাজেই যেদিন তার কন্ট্রাক্টের সময়সীমা শেষ হলো, সেদিনই 'পাগল সংঘকে' অকূল সাগরে ভাসিয়ে চলে এলো কিশোর। আর কোনোদিন যায়নি ওই ছবিতে অভিনয় করার জন্যে। তার বদলে মন দিলো পড়ালেখায়।

ভালোই কাটছিলো দিন। তারপর বহু বছর পরে হঠাৎ এলো একটা প্রচণ্ড আঘাত। ঝড়ের কবলে-পড়া গাছের মতো নাড়িয়ে দিলো যেন কিশোরকে। টিভির পুরনো অনুষ্ঠান দেখানোর তালিকায় নাম উঠলো পাগল সংঘের।

কিশোর জানতো না যে দেখানো হচ্ছে। জানলো প্রথম, যেদিন তার এক সহপাঠি তার অটোগ্রাফ চেয়ে বসলো। হাসিমুখে দিয়ে দিলো কিশোর, ভাবলো, সে গোয়েন্দা হিসেবে ভালো নাম কামিয়েছে বলেই বুঝি অটোগ্রাফ চেয়েছে ছেলেটা। কিন্তু নাম সই করার পর যখন নিচে লিখলো 'গোয়েন্দাপ্রধান' তখন আপত্তি জানালো ছেলেটা। মাথা নেড়ে বললো, 'না না, ওটা নয়, মোটুরাম লেখো।'

চমকে গেল কিশোর।

তারপর গত তিনটে হপ্তা ধরে এই এক জ্বালাতন। ইস্কুলের এমন কোনো ছেলেমেয়ে নেই যারা পাগল সংঘ না দেখেছে। সবাই এখন তাকে মোটুরাম বলে খেপায়। যে মেয়েগুলোকে দেখতে পারে না সে, পাত্তা দেয় না, ওরা পেয়েছে ভারি মজা। কিশোরকে দেখলেই মুচকি হেসে বলে, 'না না, প্লীত, আমাকে থেরে দাও, কাতুকুতু দিও না, প্লীত!'

ভয়াবহ দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে কিশোরের দিবারাত্রি। তা-ও গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হওয়ায় কিছুটা রক্ষে। ইস্কুলে যেতে হয় না, সবার খেপানোও শুনতে হয় না। কিন্তু

আজ কোনো কুক্ষণে যে হেডকোয়ার্টারে ঢুকে টেলিভিশন অন করেছিলো। আর করামাত্রই দেখলো পাগল সংঘ চলছে। বন্ধ করে দিয়েছিলো সে সঙ্গে সঙ্গে, জোর করে মুসা গিয়ে আবার খুলেছে।

পর্দার দিকে তাকিয়ে হাসে মুসা আর রবিন। মুখ আর গলায় 'বসন্ত' আঁকা শেষ করে এখন শরীরে আঁকার জন্যে মোটুরামের ওভারঅল খোলার চেষ্টা করছে মড়ার খুলি। এই সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল রান্নাঘরের দরজা। ঘরে ঢুকলো নয় বছরের সুন্দরী একটা মেয়ে, পাগল সংঘে কিশোরের উদ্ধারকারিণী। ছবিতে ওর নাম বটি সুন্দরী।

'ছেড়ে দাও ওকে,' মড়ার খুলিকে ধমক দিয়ে বললো নেলি।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, থেরে দাও,' হাসিমুখে বললো মোটুরাম।

কিন্তু ছাড়ার কোনো লক্ষণই নেই মড়ার খুলির। জোর করে নেলিকে নিয়ে গিয়ে আলমারিতে ভরে রাখতে চাইলো। নেলির পক্ষ নিলো নিগ্রো ছেলেটা, ওর নাম জিকো, ছবির উপাধি 'শজারুকাঁটা'। চুলের জন্যেই ওরকম নামকরণ। আরও ছেলে আছে। ওরা সবাই গেল মড়ার খুলির পক্ষে। নিমিষে মারপিট আর হৈ-চৈ করে এক এলাহি কাণ্ড বাঁধিয়ে ফেললো। একজন তাক থেকে একটা কেক তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো নেলিকে সই করে। সে মাথা সরিয়ে নিতে সেটা এসে পড়লো মোটুরামের মুখে। দুঃখ পাওয়ার চেয়ে বরং খুশি হলো সে। বললো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ এতা ভালো! বতন্তের তেয়ে অনেক ভালো।' বলে নাকেমুখে লেগে থাকা মাখন মুছে নিয়ে খেতে শুরু করলো।

'কিশোওর। এই কিশোর, কোথায় তুই?'

মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল বাইরে থেকে।

'জলদি বেরিয়ে আয়,' আবার বললেন তিনি।

এইই সুযোগ। আর দেরি করলো না কিশোর। লাফিয়ে উঠে গিয়ে বন্ধ করে দিলো টেলিভিশন। মোটরামের হাসিখুসি আলুর মতো মুখ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো সে, অন্যদিকে মন খারাপ হয়ে গেল রবিন আর মুসার। ওদের দেখার খুব ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু মেরিচাচীর নির্দেশ অমান্য করে এখানে বসে থাকার সাহস ওদের নেই।

জঞ্জালের ভেতর থেকে গোপন পথ দিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা।

'এই যে, এসেছিস,' মেরিচাচী বললেন।

জ্যাকেট খুলতে খুলতে কিশোর জিজ্ঞেস করলো, 'কি কাজ করতে হবে, বলো?'

কিন্তু কাজ করার জন্যে ডাকেননি মেরিচাচী। গেটের দিকে দেখালেন।

গুঙিয়ে উঠলো কিশোর। আবার! পাগল সংঘ টিভিতে দেখানোর পর থেকেই অনেক লোক আসে তার সঙ্গে দেখা করতে। খবরের কাগজের রিপোর্টারও থাকে

তাদের মধ্যে। মোটুরামকে নিয়ে ফীচার স্টোরি করতে। হেডিং লেখেঃ মোটুরাম এখন কোথায়? কিংবা মোটুরামের কি হয়েছে?

'ওকে যেতে বলো,' লোকটাকে দেখিয়ে চাচীকে অনুরোধ করলো কিশোর। 'বলে দাও, আমি কথা বলতে চাই না।'

'অনেক বার বলেছি, যায় না। ও বলছে, কথাটা নাকি জরুরী।' সহানুভূতির হাসি হাসলেন চাচী। কিশোরের কেমন লাগছে বুঝতে পারছেন। টেলিভিশনে সিরিয়ালটা দেখানোর পর থেকে যে লোকে তাকে বিরক্ত করছে, জানেন একথা। 'দেখছিস না, কি রকম বড় গাড়িতে চড়ে এসেছে। আমি বলায় বললো, যতোক্ষণ লাগে বসে থাকবে। তুই খেয়েদেয়ে জিরিয়ে নিয়ে যখন খুশি দেখা কর, ও বসে থাকবে। এরপর আর কি বলবো?'

'ঠিক আছে, কি আর করা!' কপাল চাপড়ালো কিশোর। 'দেখি, খেদানো যায় কিনা।'

বিরাট গাড়ি। ফরাসী সিঁত্রো। সামনের অংশটা দেখতে অনেকটা তিমির মাথার মতো। গাড়ি থেকে নেমে তিন গোয়েন্দার দিকে এগিয়ে আসা লোকটাও তার গাড়ির মতোই বড়, বিলাসী। প্রথমেই লোকটার দাঁত দৃষ্টি আকর্ষণ করলো কিশোরের। বড় বড় সাদা দাঁতগুলো লোকটার রোদে পোড়া চামড়ার পটভূমিতে যেন চাঁদের মতো ঝলমল করছে। যখনই হাসে তখনই চমকায়।

'কিশোর পাশা,' আরও চওড়া হাসি উপহার দিয়ে বললো লোকটা, 'আমার নাম হ্যারিস বেকার। মুভি স্টুডিওর বিজ্ঞাপন ম্যানেজার।'

মুসা আর রবিনের মাঝখানে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিশোর। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে বেকারের দিকে।

'তোমাকে একটা প্রস্তাব দিতে এসেছি, আশা করি পছন্দ হবে তোমার,' এমনভাবে কথা বলে লোকটা মনে হয় তার কণ্ঠস্বরও হাসে। 'পাগল সংঘের সমস্ত অভিনেতাকে স্টুডিওতে আসার দাওয়াত করেছি। ওখানেই লাঞ্চ খাবে। লাঞ্চের পর...'

'থ্যাংক ইউ, আমার কোনো আগ্রহ নেই,' বলে যাবার জন্যে ঘুরলো কিশোর।

'পুরনো বন্ধুদের সাথে আবার দেখা হোক, এটা চাও না?' বিশাল একটা থাবা কিশোরের কাঁধে ফেলে তাকে আটকালো বেকার। 'মড়ার খুলি, শিকারী কুকুর, ভারিপদ, আর...'

'না, থ্যাংক ইউ,' বলে কাঁধ থেকে লোকটার হাত সরানোর চেষ্টা করলো কিশোর। কিন্তু লোকটার ভালুক-থাবা শক্ত হলো আরও। 'ওই বোকাগুলোর সঙ্গে জীবনে আর কোনোদিন দেখা করতে চাই না আমি...'

আরও চওড়া হলো বেকারের হাসি। 'আমিও এটাই আশা করেছিলাম।'

'কি বললেন?' কিশোর আশা করেনি লোকটা এরকম কথা বলবে।

'তোমাকে অনেক বিরক্ত করেছে ওরা, তাই না? জ্বালাতন করেছে। মোটুরাম বলে খেপিয়েছে। ওদেরকে ঘৃণা তো করবেই।'

'মানুষকে ঘৃণা করি না আমি,' শীতল গলায় বললো কিশোর। 'তবে ওদের পছন্দ করি না, এটা ঠিক। অপছন্দ আর ঘৃণাকে নিশ্চয় এক বলবেন না আপনি?'

'ওয়ান্ডারফুল!' বেকারের রোদেপোড়া মুখে চাঁদের হাসি উজ্জ্বল হলো আরও। 'চমৎকার গুছিয়ে কথা বলো তুমি। ওদের কাছে যাওয়ার একটা সুযোগ করে দিচ্ছি আমি তোমাকে। যাতে ওদের বুঝিয়ে দিতে পারো, সেই ছোটবেলা থেকেই ওদেরকে গাধা মনে করে এসেছো তুমি, এবং আসলেই ওরা গাধা। কি, সেটা প্রমাণ করতে চাও না?'

'কিভাবে?' এই প্রথম আগ্রহ ঝিলিক দিলো কিশোরের চোখে।

কিশোরের কথার সরাসারি জবাব দিলো না বেকার। ঘুরিয়ে বললো, 'সারা দেশের লোকের সামনে প্রমাণ করবে ওরা বোকা। টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে সেকথা। দুটো কুইজ শো-এর বন্দোবস্ত করেছে টিভি। পাগল সংঘের সবাই একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করবে। আমার বিশ্বাস, কিশোর, তুমিই জিতবে। তোমার ব্যাপারে শুনেছি আমি। ওগুলোর সব ক'টার মাথায় ঘোল ঢেলে দিতে পারবে।'

কিশোরের মনের পর্দায় মড়ার খুলির ডিমের মতো মাথাটা ঝিলিক দিয়ে উঠলো। গাধাটার বোকার মতো হাসি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে অযথাই হাত মুচড়ে দিচ্ছে মোটুরামের। তার টিফিন সাঁটিয়ে, বাক্সে মরা ইঁদুর রেখে দিয়ে ফ্যাকফ্যাক করে হাসছে।

হ্যারিস বেকারের হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে এসব কথা ভাবছে কিশোর।

'ফার্স্ট প্রাইজটা তুমিই পাবে, কিশোর,' আগুনে যেন ঘি ঢাললো অসাধারণ ধূর্ত লোকটা। 'আর পুরস্কারের অঙ্কটা জানো কতো? বিশ হাজার ডলার।'

দুই

হলিউডের ভাইন স্ট্রীট গেটের সামনে লিমুজিনটাকে থামতেই হলো। শোফারকে চেনে ইউনিফর্ম পরা গার্ড, তবু থামালো। গাড়ির পেছন দিকে এসে পেছনের সীটে বসা তিন কিশোরকে দেখলো, হাতে একটা লিস্ট। নাম-ঠিকানা মিলিয়ে নেয়ার জন্যে ওদের নাম জিজ্ঞেস করলো।

'কিশোর পাশা,' বললো কিশোর। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, মোটুরাম শব্দটা

শুধু উচ্চারণ করলেই গার্ডের সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দেবে।

কিন্তু তাকে রাগানোর মত্তো কিছুই বললো না গার্ড। লিস্ট দেখে পড়লো, 'কিশোর পাশা। পঁয়তাল্লিশ সানরাইজ রোড, রকি বীচ। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' কিশোর বললো।

মাথা ঝাঁকিয়ে অন্য দু'জনের দিকে তাকালো গার্ড।

'আমি মুসা আমান।'

'রবিন মিলফোর্ড।'

দু'জনের নাম-ঠিকানা মিলিয়ে নিয়ে আবার মাথা ঝাঁকালো গার্ড। সামনের জানালার কাঁচে ওয়াইপারের নিচে একটা সাদা কার্ড লাগিয়ে দিলো সে। চিনতে পারলো কিশোর, স্টুডিওতে ঢোকার পাস।

হাত নেড়ে গার্ড বললো, 'নয় নম্বর স্টেজ।'

ধীর গতিতে গাড়ি চালালো শোফার। পেরিয়ে এলো নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি। তারপর পুরনো স্যান ফ্র্যানসিসকো অপেরা হাউস। ওটার পর পিসার লীনিং টাওয়ার বা হেলানো স্তম্ভ-পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের একটা।

এসবই পরিচিত কিশোরের। যেন স্বপ্নের ভেতর থেকে বাস্তব হয়ে ফুটে বেরিয়ে আসছে ধীরে ধীরে বস্তুগুলো। গলা বাড়িয়ে তাজ্জব হয়ে বিল্ডিংগুলো দেখছে রবিন আর মুসা। কিন্তু কিশোর জানে, ওগুলো আসল নয় কোনোটাই। এমনকি বাড়িও নয়। ক্যানভাস আর প্ল্যাস্টার দিয়ে তৈরি, আসল জিনিসের নকল, তাও শুধু সামনের অংশ। যে কোনোটার দরজা খুলে ভেতরে তাকালে দেখা যাবে অন্য পাশে কিছু নেই, ফাঁকা।

লম্বা, কালো গাড়িটায় সীটে হেলান দিয়ে বসে আছে সে। বাইরে তাকানোরও প্রয়োজন বোধ করছে না।

কিশোরকে তার বাড়ি থেকে তুলে নিতে এই গাড়ি পাঠিয়েছে হ্যারিস বেকার। যে দু'দিন কুইজ হবে, সেই দু'দিনের জন্যে গাড়ি আর শোফার দিয়ে দেয়া হয়েছে কিশোরকে।

রাশেদ চাচা আর মেরিচাচীকেও লাঞ্চে দাওয়াত করেছিলো বেকার, কিন্তু তাঁরা আসতে রাজি হননি। বলে দিয়েছেন সময় নেই। কিশোরকে গোপনে বলেছেন মেরিচাচী, 'মাঝেসাঝে দু'একটা ছবি যে আমার ভাল্লাগে না, তা নয়। কিন্তু যখনই মনে হয় সব বানানো ব্যাপার, আর দেখতে ইচ্ছে করে না।'

তাঁর সাথে একমত হলেন রাশেদ পাশা।

তবে রবিন আর মুসা তা হতে পারলো না। ওরা স্টুডিওতে যাওয়ার কথা শুনেই লাফিয়ে উঠলো। আর খুশি হয়েই ওদেরকে সঙ্গী করে নিলো কিশোর।

স্টুডিও এলাকার ভেতরে ঘন্টায় পাঁচ মাইলের বেশি গতিতে গাড়ি চালানোর নিয়ম

নেই। কাজেই শামুকের গতিতে অনেকক্ষণ লাগিয়ে এসে হঠাৎ থেমে গেল লিমুজিন। কিশোর ভাবলো, সাউন্ড স্টেজ-এর সামনেই বুঝি গাড়ি থেমেছে, যেখানে লাঞ্চ খাওয়া হবে। কিন্তু না, থেমেছে কতগুলো উত্তর আমেরিকান আদিবাসীদের কুটিরের সামনে। ওগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে গেল দু'জন মধ্যযুগীয় রোমান সৈনিক, হাতে ঢাল, কাঁধে বর্শা।

শোফারের নাম অ্যালউড হোফার, কিশোরদেরকে তা-ই বলেছে। তার পাশের জানালার কাঁচ নামিয়ে মুখ বের করলো বাইরে। একজন সৈনিককে জিজ্ঞেস করলো, 'এই যে ভাই, নয় নম্বর স্টেজ কোনটা বলতে পারেন?'

কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেই হতো, সে-ই বলতে পারতো। কিন্তু আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে গেল না। বললো না, ওই নয় নম্বর স্টেজেই পাগল সংঘের শুটিং হতো। দেরি হয় হোক, তাড়াতাড়ি গিয়ে মড়ার খুলি আর ভারিপদের সঙ্গে বেশি সময় কাটানোর কোনো ইচ্ছেই তার নেই।

'এই পথের শেষ মাথায়,' হাতে তৈরি পুরনো আমলের একটা সিগারের মাথা দিয়ে পথ-নির্দেশ করলো সৈনিক।

'গেলেই পেয়ে যাবেন,' বললো দ্বিতীয় সৈনিক। 'অসুবিধে হবে না।'

ওদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার এগিয়ে চললো শোফার। পথের শেষ মাথায় দেখা গেল বিমান রাখার হ্যাঙারের মতো দেখতে সাদা একটা বিরাট বাড়ি। একপাশে বড় করে আঁকা রয়েছে '৯'।

গাড়ি থেকে নেমে পেছনের দরজা খুলে ধরলো শোফার।

নেমে ওকে ধন্যবাদ জানালো কিশোর। আরেকবার তাকালো লম্বা, স্বাস্থ্যবান তরুণ লোকটার দিকে। দেখে বোঝার চেষ্টা করলো, চকচকে পালিশ করা জুতো পরা, কালো লম্বা চুল আর কালো চামড়ার এই অ্যালউড হোফার নামের মানুষটা কেমন হতে পারে।

নয় নম্বর স্টেজে ঢোকার দরজাটা বাড়িটার তুলনায় ছোট, ভারি। একপাশে লাগানো ধাতব খিল। ভারি রিঙ থেকে ঝুলছে একটা বড় তালা। মাথার ওপরের দুটো আলোর দিকে তাকালো কিশোর। তার জানা আছে, লাল আলোটা যদি জ্বলে, তাহলে খোলা যাবে না দরজা, অর্থাৎ খোলার নিয়ম নেই। ভেতরে কাজ চলছে।

কিন্তু লালটা জ্বলছে না এখন, জ্বলছে সবুজটা। তারমানে ঢোকা যায়। পাল্লা ঠেলে খুলে ভেতরে পা রাখলো কিশোর। পেছনে এলো মুসা আর রবিন।

সব পরিচিত এখানকার। কিশোরের মনে হলো, এই তো সেদিন এসেছিলো এখানে অভিনয় করতে। মাঝখানে এতগুলো বছর যে পেরিয়ে গেছে মনেই হলো না তার। ঠিক আগের মতোই এখনও রয়েছে রঙের তাজা গন্ধ, বড় বড় আর্ক ল্যাম্পের

তাপ। আগের মতোই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো কতগুলো কণ্ঠ, 'এই যে মোটুরাম এসে গেছে!' এই ডাকটা জীবনে আর শুনতে হবে কখনও ভাবেনি সে।

প্রেস ফটোগ্রাফাররা ঘিরে ধরলো তাকে। দুই-তিন মিনিট নীরবে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইলো সে, ওদের ফ্ল্যাশগানের আলোর অত্যাচার সহ্য করলো। সহ্য করলো ওদের জ্বালা ধরানো কথাঃ হাসো, মোটুরাম। এদিকে একটু তাকাও, মোটুরাম। আরেকবার, আরেকবার হাসো, মোটুরাম।

অবশেষে শেষ হলো ছবি তোলা। ওদেরকে ঠেলে হাসিমুখে এগিয়ে এলো হ্যারিস বেকার, তার ভালুকের থাবা ফেললো কিশোরের কাঁধে। 'কিশোর, এসো এসো, ওরা তোমার অপেক্ষা করছে। পাগল সংঘের অভিনেতারা।'

বাড়িটার শেষ ধারে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত বিশাল এক রান্নাঘর। কিশোরের জানা আছে, এটা আসলে রান্নাঘর নয়। সাজানো হয়েছে। স্টোভটা বাতিল, অকেজো। সিঙ্কের ওপরের কল থেকে পানি পড়ে না। শুধু ঘরের মাঝখানে বড় টেবিলটা, যেটায় খাবার সাজাচ্ছে ওয়েইটাররা শুধু সেটাই আসল। অন্যখান থেকে এনে রাখা হয়েছে। ছবি তৈরির সেট সাজানোয় ব্যবহৃত হচ্ছে না এখন ওটা।

তিন গোয়েন্দাকে টেবিলের মাথার কাছে নিয়ে গেল বেকার। ওখানে কালো চুলওয়ালা খুব সুন্দরী এক তরুণীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে তিনজন তরুণ।

কিশোরকে এগোতে দেখে কথা বন্ধ করে মুখ তুলে তাকালো ওরা।

কিশোরও তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। অনেকগুলো বছর ধরে ওদের চেহারা তার মনের পর্দায় ছিলো উজ্জ্বলঃ মড়ার খুলি-ডিমের মতো সাদা চকচকে মাথা, মুখে বোকা হাসি, সোজা কথায় গর্দভ। ভারিপদের আপেলের মতো টকটকে গোল মুখ, অস্বাভাবিক বড় পায়ের পাতা, হাতের তালুও স্বাভাবিক নয়, রোগা, পাতলা শরীর। শিকারী কুকুরের মুখটা অনেকটা কুকুরের মুখের মতোই লম্বাটে, প্রায় সারাক্ষণ হাঁপায়, জিভ বেরিয়ে পড়ে মাঝে মাঝে, বিষণ্ন চোখ দুটো দেখে মনে হয় এই বুঝি কেঁদে ফেললো। বটিসুন্দরীর সুন্দর চোখা চেহারা, কপালের ওপরের চুল সমান করে কাটা।

ওই চারজনই দাঁড়িয়ে আছে এখন, কিন্তু একেবারে অন্য মানুষ। কিশোরের মনের পর্দায় যে ছবি আঁকা রয়েছে তার সঙ্গে এখনকার ওদের কোনো মিল নেই।

সুদর্শন এক তরুণ, চামড়ার জ্যাকেট গায়ে, সোনালি চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, কান দেখা যায় না। হাত তুলে হেসে বললো, 'এইই যে, তোমাকেও গলায় দড়ি দিয়ে টেনে এনেছে তাহলে।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। তাকালো ছেলেটার কাউবয় বুটের দিকে। ছয় ফুট লম্বা শরীরের তুলনায় জুতো ছোটই বলতে হবে, তারমানে সে ভারিপদ নয়। শিকারী কুকুরও নয় সে। তার পাশে দাঁড়ানো তরুণের মুখটা লম্বাটে, যদিও জিভ বের করে

নেই, আর চোখেও নেই আগের বিষণ্নতা।

চামড়ার জ্যাকেট আর হাতে-তৈরি বুট পরা বুদ্ধিমান দেখতে ছোকরাই তাহলে মড়ার খুলি?

অন্য দুই 'পাগলের' দিকে তাকিয়েও মাথা ঝাঁকালো কিশোর। নীরবে দেখলো পা থেকে মাথা পর্যন্ত। ভারিপদ আর শিকারী কুকুরকে চিনে নিতে অসুবিধে হলো না।

শরীরের তুলনায় এখনও বড়ই রয়েছে ভারিপদের পায়ের পাতা আর হাতের তালু, শরীর আগের মতো রোগাটে না হলেও বেশ পাতলা। বেঁটে। তবে আপেলের মতো গোলগাল মুখটা বদলে অন্যরকম হয়ে গেছে। তার লাল লাল গাল আর হাসি হাসি চোখ দেখে রকি বীচ সুপারমার্কেটের সেলসম্যানগুলোর কথা মনে পড়ে গেল কিশোরের।

শিকারী কুকুরকে লাগছে তরুণ ব্যবসায়ীর মতো। তার বাদামী রঙের চুল ছোট করে ছাঁটা। শার্টের গলার কাছ থেকে শুরু করে নিচ পর্যন্ত একটা বোতামও খোলা নেই। শার্টের কাপড়ও বেশ ঝলমলে, উজ্জ্বল রঙের। একে দেখে এখন বিশ্বাস করাই কঠিন একসময় সে ছিলো কাঁদো কাঁদো চেহারার, পাগল সংঘের বোকা শিকারী কুকুর।

সব শেষে সুন্দরী মেয়েটার দিকে ফিরলো কিশোর। চমৎকার ফন স্যুট পরা। পানের মতো মুখ, গভীর নীল চোখ, ভারি পাপড়ি। এই মেয়েটাই ছিলো তার উদ্ধারকারিণী বটিসুন্দরী, কিন্তু স্টুডিওর বাইরে দেখলে তাকে চিনতেই পারতো না। রাস্তায় দেখলে তো নয়ই। বয়েস কতোটা বদলে দেয় মানুষকে!

হাসলো মেয়েটা। 'তুমি আসায় খুব খুশি হয়েছি, কিশোর। তোমাকে শুধু কিশোর বলে ডাকলাম, কিছু মনে করোনি তো?'

'না না,' মোটুরাম বলে না ডাকায় খুশি হয়েছে কিশোর।

'আমাকে শুধু নেলি বলে ডাকবে।'

'আচ্ছা।' ওদের সঙ্গে রবিন আর মুসার পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে ফিরলো কিশোর। বেকার আর টিভি ক্যামেরার পাশে দাঁড়ানো আরেকজন লোকের সাথে কথা বলছে দুজনে। সাদা চুলওলা লোকটাকে চেনা চেনা লাগল কিশোরের। কিন্তু মনে করতে পারলো না, কে।

'যাক, আমরা সবাই যখন এলাম,' হাত বাড়িয়ে কিশোরের বাহু ধরে তাকে দলের ভেতরে টেনে নিলো মড়ার খুলি, 'একটা পরামর্শ আছে আমার। আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই ব্যাপারটা জরুরী।'

'কিন্তু সবাই তো আসেনি এখনও,' মনে করিয়ে দিলো নেলি। 'শজারুকাঁটা বাকি আছে।'

'ও আসবে না,' জানালো ভারিপদ।'

‘কেন?’ কিছুটা হতাশই মনে হলো নেলিকে।

হতাশ কিশোরও হয়েছে। পাগল সংঘের ওই একটিমাত্র ছেলেকে সে পছন্দ করতো, বটিসুন্দরীর চেয়েও বেশি। বাচ্চা পেয়ে তাকে কখনও খেপানোর চেষ্টা করেনি শজারু, কষ্ট দেয়নি।

‘কি জানি,’ কাঁধ ঝাঁকালো শিকারী কুকুর। ‘হয়তো খুঁজে পায়নি। কিংবা আসতে রাজি না।’

‘তারমানে বাকি সবাই আছি আমরা,’ মড়ার খুলি বললো। ‘এবং এসেছি একটা উদ্দেশ্যে।’ চামড়ার জ্যাকেটের পকেট চাপড়ালো সে। ‘টাকা। তাই না?’

‘হ্যাঁ,’ দ্বিধা করে বললো শিকারী কুকুর। তার যেন সন্দেহ রয়েছে এ-ব্যাপারে।

‘হ্যাঁ,’ বললো ভারিপদ, তার সন্দেহ নেই, ‘টাকার জন্যেই এসেছি আমরা।’

নেলিও মাথা ঝাঁকালো।

‘তাই না? ঠিক বলিনি?’ কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালো মড়ার খুলি।

দ্বিধা করছে কিশোর। বিশ হাজার ডলার জিতে নিতে পারলে খুবই খুশি হবে সে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিন গোয়েন্দার ফাণ্ডে জমা রাখবে ওই টাকা। গাড়ি কিনতে পারবে। মোটর সাইকেল কিনতে পারবে। গোয়েন্দাগিরির কাজে লাগে এরকম অনেক জিনিসই কেনা যাবে এতো টাকা পেলে। তবে শুধু টাকার জন্যে টিভির এই কুইজ শোতে যোগ দিতে আসেনি সে। বাচ্চা পেয়ে তাকে নিয়ে যারা মজা করেছে, নির্যাতন করেছে তার ওপর, ওদেরকে আচ্ছামতো একটা শিক্ষা দেয়াটাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। শুধু টাকার লোভ দেখিয়ে তাকে এখানে কিছুতেই আনতে পারতো না হ্যারিস বেকার। তবে সেকথা তো আর বলা যায় না ‘শত্রুদেরকে’। মাথা ঝাঁকিয়ে শুধু বললো, ‘হ্যাঁ।’

‘গুড। এখানে একটা পুনর্মিলনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে,’ মড়ার খুলি বললো। ‘লাঞ্চের পর আমরা সবাই বসে পুরনো দিনের কথা আলোচনা করবো, কিভাবে কি কি মজা করেছি আমরা, এ সমস্ত। তাই তো?’

আবার মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

‘তোমাদের কাছে মজার হতে পারে, আমার কাছে ছিলো না,’ ভাবলো কিশোর। তবে কিছুই বললো না সে।

‘আর আমাদের ওই প্রিয় পরিচালক,’ বেকারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা চুলওয়ালা মানুষটাকে দেখালো মড়ার খুলি, ‘আমাদের এই আলোচনা টেপ করে নেবেন। কুইজ শোর আগে টেলিভিশনে দেখানোর জন্যে।’

কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকালো কিশোর। অবাক হয়ে ভাবলো, কেন প্রথমেই মানুষটার নাম মনে করতে পারেনি? নাম আর চেহারা তো সাধারণত সে ভোলে না।

একটা কথা অবশ্য ঠিক, অনেক বদলে গেছেন রাফায়েল সাইনাস। পাগল সংঘের সবার চেয়েও বেশি বদলেছেন। লম্বা, ছিপছেপে একজন প্রাণবন্ত মানুষ, কথার চাবুক হেনে যিনি চোখের পলকে ঠাণ্ডা করে ফেলতেন দুর্দান্ত বেয়াড়া ছেলেগুলোকেও, সেই মানুষের এ-কি হাল হয়েছে! বৃদ্ধ, কুঁজো, বিধ্বস্ত!

'বেশ,' বলে যাচ্ছে মড়ার খুলি, 'এখন আমাদের ভেবে দেখতে হবে, কেন আমরা টেলিভিশনের সামনে যাবো শুধু শুধু? যদি কিছু না-ই দেয়? বসে যে আলোচনা করবো তার জন্যেও পয়সা দিতে হবে আমাদেরকে। ঠিক আছে?'

এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকালো সে। সবাই মাথা ঝাঁকালো, কিশোর বাদে।

'তুমি কি বলো?' ভুরু কুঁচকে কিশোরকে জিজ্ঞেস করলো সে।

দ্বিধা করছে কিশোর। ভাবছে। মড়ার খুলির পরামর্শ মেনে নেয়ার অর্থ তাকে দলের নেতা হিসেবে স্বীকার করে নেয়া, যেটা কিছুতেই করতে রাজি নয় কিশোর। কারণ ছোটবেলায় এ ছিলো দুষ্ট ছেলেদের সর্দার, মোটুরামকে কষ্ট দেয়ার বেশির ভাগ শয়তানী বুদ্ধিই তার মাথা থেকে বেরোতো।

কারো কর্তৃত্ব মানতে পারে না কিশোর, এটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। তবে একটা কথা এখন স্বীকার না করেও পারছে না, মড়ার খুলির কথায় যুক্তি আছে। টেলিভিশনে যদি তাদেরকে দর্শকদের সামনে হাজির করতে চায় টিভিওয়ালারা, তাহলে কেন পয়সা দেবে না? বিনে পয়সায় কেন কাজ হাসিল করবে?

মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

মুখে আঙুল পুরে জোরে শিস দিয়ে উঠলো মড়ার খুলি। হাত নেড়ে ডাকলো, 'এই বেকার; এদিকে আসুন।'

কিশোর ভেবেছিলো এই আচরণে নিশ্চয় মাইন্ড করবে বিজ্ঞাপন ম্যানেজার, মুখ কালো করে ফেলবে, কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে করলো না। বিন্দুমাত্র মলিন হলো না চাঁদের উজ্জ্বলতা। এগিয়ে এলো। পোষা বৃদ্ধ কুকুরের মতো তার পিছে পিছে এলেন সাইনাস।

'কি চাও?' খুব ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো বেকার।

কাটা কাটা বাক্যে পরিষ্কার করে তাকে বললো মড়ার খুলি। আলোচনার জন্যে তাদের প্রত্যেককে একশো ডলার করে সম্মানী দিতে হবে। সেটা করমুক্ত হতে হবে, এবং নগদ।

একটুও মলিন হলো না চাঁদের ঔজ্জ্বল্য, তবে সামান্য একটু কোঁচকালো ভুরু দুটো। 'তা পারবে না। এমনিতেই লাঞ্চের জন্যে অনেক খরচ করে ফেলেছে স্টুডিও। তাছাড়া প্রত্যেকের জন্যেই একটা করে দামী স্যুভনিরের ব্যবস্থা করেছি নিজের গাঁটের

পয়সা খরচ করে।'

'কি ধরনের উপহার?' জিজ্ঞেস করলো নেলি।

'কতো দাম?' জানতে চাইলো মড়ার খুলি।

'এটা আমি এখন বলবো না,' হেসে বললো বেকার, 'গোপন রাখব। সারপ্রাইজ দেয়ার জন্যে। তবে রেখেছি, এটা ধরে নাও,' বলে রান্নাঘরের দরজার দিকে দেখালো সে। 'আর পেলে খুব খুশি হবে, তা-ও বাজি রেখে বলতে পারি।' এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বললো, 'তবে, আলোচনার জন্যে একটা পয়সাও দিতে পারবো না, একথা আবারও বলে দিচ্ছে।'

'বেশ। টাকা না পেলে আমরাও আলোচনায় বসছি না।'

ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলো বেকার। কিন্তু কোনো কথা শুনতে রাজি নয় মড়ার খুলি। তার এক কথা, টাকা ছাড়া কিছু করবে না।

হাসি মুছলো না বেকারের মুখ থেকে, তবে তার কণ্ঠের মোলায়েম ভাবটাও আর রইলো না। 'দেখো, ব্ল্যাকমেল করছো তোমরা! ব্ল্যাকমেল!'

'বেশ, করছি,' হাসিটা ফিরিয়ে দিলো মড়ার খুলি। কিশোর দেখলো নেলি, ভারিপদ, এমনকি শিকারী কুকুরও হাসছে। 'তবে আলোচনায় বসাতে হলে টাকা আপনাকে দিতেই হবে।'

সাথে সাথে কিছু বললো না বেকার। ভাবছে।

কিশোরও ভাবছে। অবাক হয়েছে সে। পাগল সংঘের যে চেহারা এতোদিন ছিলো তার মনের পর্দায়, সেটা দূর হয়ে গেল আজ। এরা সবাই আজ অন্য মানুষ। সবাই বড় হয়েছে, বুঝতে শিখেছে, স্বার্থ ছাড়া কথা বলে না। কঠোর বাস্তবকে বুঝতে শিখেছে, শিখেছে টাকার জন্যে কিভাবে লড়াই করতে হয়।

কিন্তু কথা হলো, একশো ডলারের জন্যেই যদি এভাবে লড়াই করে, বিশ হাজার ডলারের জন্যে কি করবে? হায়নার মতো কামড়া-কামড়ি শুরু করে দেবে না! ওদের কাছ থেকে টাকাটা বুদ্ধির জোরে ছিনিয়ে নিতে হলে কতোটা সর্তক হয়ে এগোতে হবে, বুঝতে পেরে কিছুটা দমেই গেল কিশোর। হ্যারিস বেকারের কথা থেকে মনে হয়েছিলো, কিশোর আসবে, আর টাকাটা নিয়ে বাড়ি চলে যাবে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, মোটেও ওরকম সহজ নয় ব্যাপারটা।

'পাগলদের' ওপর আগের সেই ঘৃণাটা আর নেই এখন কিশোরের, এটা বুঝে আরও অবাক হলো। এই মুহূর্তে বিশ্বাসই করতে পারছে না এরাই কয়েক বছর আগে ছিলো একেকটা গর্দভ, বোকার হদ্দ, তাকে জ্বালিয়ে মেরেছে। প্রতিশোধের ইচ্ছেটা ধীরে ধীরে যতোই দূর হয়ে যাচ্ছে কিশোরের, বাড়ছে প্রতিযোগিতায় জেতার ইচ্ছে।

ওর স্বভাবই হলো, কোনো চ্যালেঞ্জ এলে সমস্ত শক্তি আর বুদ্ধি নিয়ে সেটার

মুখোমুখি হওয়া। পিছিয়ে আসার ছেলে সে নয়। এখন তার মনে হচ্ছে, জীবনে এতোবড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি সে খুব কমই হয়েছে।

তিন

লাঞ্চ টেবিলটা পরিষ্কার করে সরিয়ে নেয়া হলো। তার জায়গায় এনে অর্ধচন্দ্রের আকারে গোল করে রাখা হলো সুইভেল চেয়ার।

মাঝখানের চেয়ারটায় বসলো হ্যারিস বেকার, অনেকটা উপস্থাপকের ভূমিকা নেবে সে। কিংবা বলা যায় গৃহকর্তার। তার একপাশে নেলি, আরেক পাশে মড়ার খুলি। কিশোর বসেছে একমাথায়, শিকারী কুকুরের পাশে। অন্য মাথায় ভারিপদ।

জ্বলে উঠলো আর্কলাইট। কিশোরের মনে হলো, তার ওপর এসে পড়লো আধ ডজন খুদে সূর্যের রোদ। খুব কমই খেয়েছে সে। মাত্র একটুকরো মুরগীর মাংস আর একচামচ পট্যাটো সালাদ। নার্ভাস হয়ে গিয়েছে বলে খায়নি তা নয়। অন্য চিন্তায় ব্যস্ত তার মন, খাবারের কথা ভাবারই সময় নেই যেন। ভ্রাম্যমাণ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসে যখন শুটিঙের নির্দেশ দিলেন সাইনাস, তখনও গভীর চিন্তায় ডুবে রইলো সে। যে করেই হোক কুইজ শোতে জিততে হবে তাকে। প্রায় কথাই বলছে না কারো সাথে।

অন্যেরা সবাই গল্প করছে। কিন্তু কিশোর তাতে যোগ দিলো না। সে শুধু শুনছে। মড়ার খুলি, ভারিপদ, আর শিকারী কুকুরের ব্যাপারে অনেক কথাই জেনে ফেলেছে, ওদের আলোচনা থেকে। কিন্তু ওরা তার ব্যাপারে কিছুই জানতে পারেনি এখনও।

'গুড ইভনিং,' হাসি হাসি গলায় বললো বেকার। শো শুরু হলো।

নড়েচড়ে বেড়াতে লাগলো তিনটে টেলিভিশন ক্যামেরা। ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সাইনাস। নানারকম কাজ করতে হচ্ছে প্রায় একই সঙ্গে।

'কয়েকজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে নতুন করে আবার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আপনাদের,' ক্যামেরার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো বেকার। 'কয়েক হপ্তা ধরেই এদের ছোটবেলার অভিনীত ছবি দেখছেন আপনারা। হাজার হাজার চিঠি লিখেছেন আমাদের কাছে। জানতে চেয়েছেন ওরা কে কোথায় কেমন আছে। আপনাদের অনুরোধেই আজ ওদেরকে আমাদের স্টুডিওতে হাজির করেছি।'

এক মুহূর্ত থামলো বেকার। রোদেপোড়া মুখে বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠলো তার দাঁতের সারি। 'পাগল সংঘের পাগল এরা সবাই।'

বলে যেতে লাগলো সে, পাগলদের একজনকে, যাকে শজারুকাঁটা বলে চেনেন দর্শকরা, তাকে হাজির করতে পারেনি বলে কতোখানি দুঃখিত। দুঃখটা অবশ্যই হাসিমুখে প্রকাশ করলো সে। টেলিভিশনের ঘোষক তাদের অনুষ্ঠান 'যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে কয়েক মিনিট দর্শকরা দেখতে পাননি' বলে যেমন দরাজ হাসি

হেসে 'আন্তরিক দুঃখ' প্রকাশ করে অনেকটা সে-রকম ভাবে। শজারুকাঁটাকে খুঁজে বের করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করা হয়েছে, বলছে বেকার, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ক্যালিফোর্নিয়ায় নেই সে। কোথায় গেছে খুঁজেও বের করা যায়নি।

'হয়তো জেলে গেছে,' মড়ার খুলি বললো।

মৃদু হেসে তার কথা এড়িয়ে গেল বেকার। এক এক করে দর্শকদের সামনে নিজেদের পরিচয় দিতে অনুরোধ করলো পাগলদের।

নেলি বললো প্রথমে, 'আমি ছিলাম বটিসুন্দরী। কিন্তু সেটা অনেক দিন আগে। এখনও আমি শুধুই নেলি।'

'কি যে বলো,' তার দিকে তাকিয়ে হাসলো বেকার। 'এতো বিনয়ের দরকার নেই। এখনও তুমি সুন্দরী, বরং আগের চেয়ে বেশি। ছবির মতো সুন্দর।'

নেলি হাসলো না। 'এখন আর আগের মতো বোকামি করি না আমি। বরং বুদ্ধিমত্তার জন্যে প্রশংসাই পাই।'

বেকারের ফিকফিক হাসিটা কেমন শূন্য শোনালো কিশোরের কানে। চেয়ারে হেলান দিলো সে। ক্যামেরার চোখ ছাড়িয়ে তাকালো ইলেকট্রিশিয়ানদের দিকে, যারা কিছু জটিল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করছে। ওদের মাঝেই রয়েছে রবিন আর মুসা। কিশোর জানে, কোনো ক্যামেরাই এখনও তার দিকে তাকায়নি। কারণ নেলির পর পরিচয় দেয়ার পালা আসবে মড়ার খুলির। দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে চোখ টিপলো সে।

ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলো, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে সে যা-ই বলুক, যা-ই করুক, ওরা যেন অবাক না হয়। রবিনের দৃষ্টিই বুঝিয়ে দিলো, সে ইশারাটা ধরতে পেরেছে।

সামান্য ডানে সরলো কিশোরের নজর। আরেকটা পরিচিত মুখ চোখে পড়লো। অ্যালউড হোফার। সাউন্ড স্টেজের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছে লম্বা দণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা আর্ক লাইটের দিকে। আলোগুলো এখন ব্যবহার হচ্ছে না।

'আমি ছিলাম মাথা কামানো,' পরিচয় দিচ্ছে মড়ার খুলি। 'বোকার ভাণ করতাম।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেকারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'খুব একটা বদলেছি বলে কি মনে হয় আপনার?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হাসিমুখে পাল্টা প্রশ্ন করলো বেকার, 'তোমার নামই ছিলো মড়ার খুলি, তাই না?'

'হ্যাঁ। তবে আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, বোকার ভাণ করে থাকতাম বলেই আমি বোকা নই। আসলে ভালো অভিনেতা। বুদ্ধি বেশি।'

তার পর পরিচয় দিলো শিকারী কুকুর, এবং তারও পরে ভারিপদ। এমন শুকনো

গলায় নিজেদের উপাধি বললো, যেন বহুবার এক কথা বলতে বলতে বিরক্ত হয়ে গেছে।

'শিকারী কুকুর।'

'ভারিপদ।'

ভারিপদকে নাড়া দিয়ে কিছুটা ভেজানোর চেষ্টা করলো যেন বেকার, 'কেন, তোমাকে ভারিপদ বলা হতো কেন?'

'কারণ ওই নামেই আমাকে ডাকতো সবাই।'

'তাতো ডাকতো। কিন্তু কেন?'

'কারণ স্ক্রিপ্টে তাই লেখা ছিলো, ডাকতে বলা হয়েছে।'

মুহূর্তের জন্যে বেকারের দাঁতের বাল্ব অর্ধেক নিভে গিয়ে আবার জ্বলে উঠলো। কিশোরের দিকে ফিরলো। 'তুমি কে?'

হাসিটা ফিরিয়ে দিলো কিশোর। তোতলাতে লাগলো, 'কি-কি-কি-কি-ক্কিশোর পাশা!'

'হ্যাঁ। এখন তা-ই। তখন কি ছিলে?'

'কি-কি-কি-কি-ক্কিশোর পাশা। সব সময়ই আমি কি-কি-কি-ক্কিশোর পাশা।' কুঁচকে গেছে তার কপাল। একেবারে বুদ্ধু বনে গেছে যেন। গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে বহুবার দেখছে, বোকার ভাণ করে থাকলে অনেক ফল পাওয়া যায়।

বেকার যখন আবার জিজ্ঞেস করলো, পাগল সংঘে কিসের অভিনয় করতো, জবাবে কিশোর জানালো, 'বা-বা-বাচ্চার। কথা আমার খুব বেশি ম-ম-ম-ম্মনে থাকে না।'

অবশেষে বেকারকেই কিশোরের পরিচয় করিয়ে দিতে হলো দর্শকদের কাছে। 'কিশোর পাশাই ছিলো মোটুরাম। অনেক দর্শকই স্বীকার করবেন, পাগল সংঘের প্রাণ ছিলো সে-ই। খুব বড় অভিনেতা।'

পরিচয়ের পালা শেষ হলে বেকার জিজ্ঞেস করতে লাগলো, কে কি কাজ করছে এখন।

'আমি রিসিপশনিস্ট,' নেলি জানালো। 'স্যান ফ্র্যানসিসকোর এক অফিসে।'

'নিশ্চয় খুব ভালো রিসিপশনিস্ট তুমি। লোকে অফিসে ঢুকে ওরকম সুন্দর একটা মুখ দেখে নিশ্চয় খুশি হয়। অনেক মিষ্টি হাসি নিশ্চয় উপহার পাও তুমি।'

'না,' মাথা নাড়লো নেলি। 'দাঁত তোলার আগে রোগীর মুখের অবস্থা দেখেছেন? ওরকম করে রাখে মুখ।'

কথার খেই হারিয়ে ফেললো বেকার। শুরু করার আগেই কথা থামিয়ে দিলো মেয়েটা। অন্য ভাবে চেষ্টা করে দেখলো সে, 'অভিনয় তো ভালোই করতে। একেবারে

ছেড়ে দিয়েছো নাকি?'

'আমি অভিনয় ছাড়িনি, বরং অভিনয়ই আমাকে ছেড়েছে। দশ বছর বয়েসের পর থেকে নতুন আর কোনো ছবিতে অভিনয়ের অনুরোধ আসেনি আমার কাছে।'

'তারমানে তোমার মা-বাবা চেয়েছেন ইস্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শিখে তুমি সাধারণ জীবন যাপন করো...'

আবার মাথা নাড়লো নেলি। 'না, তা তারা চায়নি। চাপ দিয়ে বার বার আমাকে ওরা অভিনয়ের দিকেই ঠেলে দিতে চেয়েছে। সাধারণ জীবন যাপন করার উপায় ছিলো না আমার।'

'কেন?' সেকথা জিজ্ঞেস করার আগেই নেলি জবাব দিয়ে দিলো, 'লোকে আমাকে দেখলেই টিটকারি দিয়ে বলতো বটিসুন্দরী, বটিসুন্দরী। বহু বছর ওদের জ্বালায় রাস্তায় বেরোতে পারিনি আমি, ইস্কুলে তো আরও খারাপ অবস্থা। কি করতো, বলবো?'

হাসিমুখে মাথা ঝাঁকালো বটে বেকার, কিন্তু তার চোখ দেখেই কিশোর বুঝলো, নেলি খুলে বলুক সেটা মোটেও চায় না সে।

নেলিও বললো না। বললো, 'যদি কখনও আমার বাচ্চা হয়, তাকে কবর খোঁড়ার কাজ শিখতে বলবো বরং, তবু অভিনেতা হতে দেবো না। কবর খোঁড়ার মাঝেও অন্তত কিছুটা শান্তি আর ভবিষ্যৎ আছে।'

'ভবিষ্যতের কথাই যখন বলছো,' প্রসঙ্গ থেকে সরে যাওয়ার সুযোগটা হাতছাড়া করলো না বেকার, 'তখন তোমার নিজের কথাই বলো। কি করবে ভাবছো?'

এই প্রথম তার দিকে তাকিয়ে হাসলো নেলি। 'টাকা জোগাড় করতে পারলে কলেজে ভর্তি হবো। এই সুন্দর চেহারা নিয়ে মহা অশান্তিতে আছি আমি। চেহারার চেয়ে মন আর মগজটা সুন্দর হলে সেটা বরং আমার অনেক কাজে লাগবে।'

'তা লাগবে।'

নেলির সঙ্গে আলোচনা শেষ করতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো বেকার। মড়ার খুলির দিকে ফিরলো। সে যদি ভেবে থাকে তার সাথে আলোচনাটা নেলির চেয়ে সহজ হবে, তাহলে ভুল করেছে। জানা গেল একটা মোটর গ্যারেজে মেকানিকের চাকরি করে মড়ার খুলি। কিভাবে কি করে জানতে চেয়ে বেকার পড়লো বিপদে।

মড়ার খুলি ঝাঁঝালো গলায় বললো, 'অন্যের গাড়ির নিচে সারাদিন চিত হয়ে পড়ে থাকি আমি। আমার নাকেমুখে টপ টপ করে ঝরে পড়ে পোড়া তেল। সারা গায়ে তেলকালি লেগে যায়। আঙুল, এমনকি নখের ভেতরে গ্রীজ ঢোকে। ওই আঙুল দিয়ে যখন র‍্যাঞ্চ ধরার চেষ্টা করি...'

তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল বেকার। 'আবার কি অভিনয়ের জগতে ফিরে আসতে চাও? তুমিই বললে তুমি খুব ভালো অভিনেতা।'

'অভিনয়? ফুহ্! আপনি জানেন, এই শহরে কতোজন অভিনেতা না খেয়ে মরতে বসেছে?'

জানে না বেকার। আর জানলেও সেটা নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। 'আচ্ছা, তুমি কি কখনও নেলির মতো বিপদে পড়েছো? মানে, রাস্তায় জ্বালাতন করেছে লোকে?'

ওরকম জ্বালায় পড়েনি একথা স্বীকার করতে বাধ্য হলো মড়ার খুলি। বললো, 'অভিনয় ছেড়ে দেয়ার পর আর মাথা কামালাম না। চুল গজিয়ে গেল। আমার বিখ্যাত কানদুটোও ঢেকে গেল চুলে। চেহারা এমন বদলে গেল, তখন হঠাৎ আমার নিজের মা-ও দেখলে চিনতে পারতো কিনা সন্দেহ। লোকে চিনতেও পারলো না, যন্ত্রণা থেকেও বাঁচলাম।'

ভবিষ্যতে কি করার ইচ্ছে, প্রশ্ন করে অহেতুক বিপদে পড়তে গেল না বেকার। ডারিপদের দিকে ফিরলো। সে জানালো, বেশির ভাগ সময়ই বেকার থেকেছে সে, কাজ পায়নি। তবে শিকারী কুকুর অবাক করলো বেকারকে। সে জানালো হাই স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন নিয়ে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে।

বেকারের প্রশ্ন ছাড়াই সে বলে গেল, 'আমি একদিক থেকে ভাগ্যবান। আমার বাবা উকিল। তিনি কখনোই আমাকে অভিনেতা বানাতে চাননি। তাঁর এক শাঁসালো মক্কেলের চাপাচাপিতেই ছেলেবেলায় আমাকে অভিনয় করতে দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর যখন বুঝলেন, এসব করে আমার ভবিষ্যৎই শুধু ঝরঝরে হবে, লাভ কিছু হবে না, আমাকে অভিনয়ের জগত থেকে ছাড়িয়ে এনে ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন।'

বেকার জানতে চাইলো, অভিনয় ছেড়ে দেয়ার পর রাস্তায় বিপদে পড়েছে কিনা শিকারী কুকুর।

'পড়েছি,' জানালো সে, 'তবে বেশি দিন না। পাগল সংঘে আমি বোধহয় খুব একটা চোখে পড়ার মতো চরিত্র ছিলাম না। লোকে শীঘ্রি ভুলে গেল আমার কথা।'

এরপর এলো কিশোরের জবাব দেয়ার পালা।

'তুমি কি করছো?' বেকার জিজ্ঞেস করলো।

শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো কিশোর, যেন প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না। বোকার মতো বললো, 'কই, কিছুই তো করছি না। চুপচাপ বসে রয়েছি।'

'এখানে বসে থাকার কথা বলছি না। জীবনে কি করছো?'

'র-র-রকি বীচে বাস করছি।'

'ওখানে থেকে কি করো?'

প্রশ্নটা যেন খুব অবাক করলো কিশোরকে। মাথা চুলকালো, চেয়ারে নড়েচড়ে

বসলো। অবশেষে স্বীকার করলো বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঝে মাঝে স-স-স-সৈকতে সাঁ-সাঁ-সাঁ তার কাটতে যায়।

'ইস্কুলে যাও না?' কোনো কিছুই যেন হ্যারিস বেকারে হাসিতে চির ধরাতে পারে না। তবে গলায় সামান্য অধৈর্য ভাব ফুটলো।

'গ-গ-গরমের ছুটিতে যাই না।'

ভবিষ্যতে কিশোরের কি করার ইচ্ছে জিজ্ঞেস করে বিপদে পড়তে চাইলো না বেকার। আর কিছু আপাতত জিজ্ঞেস করলো না তাকে।

তবে এখনও নির্দিষ্ট সময় শেষ হতে বারো মিনিট বাকি। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসলো বেকার। 'এখন ওদের অতীত সম্পর্কে আমি কিছু জিজ্ঞেস করবো,' ঘোষণা করলো সে। 'আমার বিশ্বাস, পাগল সংঘে অভিনয় করার সময়কার মজার কোনো ঘটনার কথা ওরা বলতে পারবে।'

আবার নেলিকে দিয়ে শুরু হলো।

'আমার শুধু মনে আছে নাপিতের কথা,' নেলি বললো। 'এতো জোরে ব্রাশ ঘষতো আমার মাথায়, মনে হতো চামড়া ছিলে ফেলবে।'

মড়ার খুলির মনে পড়লো সম্মানী দেয়ার দিনের কথা। 'প্রতি শুক্রবার রাতে পেতাম আমরা। চেক নয়, নগদ টাকা। বাদামী খামে ভরা থাকতো, লাল সুতো দিয়ে বাঁধা।'

'নিশ্চয়ই সেটা তোমার জন্যে খুব আনন্দের দিন ছিলো?' বেকার বললো হেসে।

'মোটেও না। আনন্দের ছিলো আমার বাবার জন্যে। সারা হপ্তায় ওই একবারই সে স্টুডিওতে আসতো, আমার কাছ থেকে খামটা কেড়ে নেয়ার জন্যে।'

ভারিপদর মনে পড়লো বড় জুতোর কথা। 'এতে বড় জুতো পরতে দেয়া হতো আমাকে, ঢলঢল করতো। পায়ে আটকে রাখার জন্যে ভেতরে কাপড় পুরে দিতো ওরা। একজোড়া জুতো এখনও আছে, এখনও পায়ে ঢিলে হয়।'

শিকারী কুকুরের মনে পড়লো, যেদিন স্টুডিওতে কোনো কাজ থাকতো না, সেদিন তার বাবা তাকে বেড়াতে নিয়ে যেতেন সৈকতে। কিংবা খেলতেন ছেলের সঙ্গে। তাঁর যদি সেদিন কোনো কাজও থাকতো, সেটা করতেন না, ছুটি নিতেন। 'শেষের দিকে তো দিন গুনতে আরম্ভ করেছিলাম আমরা দু'জনেই, কবে অভিনয়ের কন্ট্রাক্ট শেষ হবে,' বললো সে।

কিশোর কিছুই মনে করতে পারলো না। বললো, 'আমি তখন খুব বা-বা-বা-বাচ্চা।' তোতলাতে তোতলাতে আরও জানালো, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল, কিছুই মনে রাখতে পারে না। কয়েক হপ্তা আগে টিভিতে পাগল সংঘ দেখানোর আগে নাকি জানতোই না সে, কখনও তার নাম মোটুরাম ছিলো। তা-ও টেলিভিশনে সে দেখেনি। কে জানি একজন এসে-কে সেটাও মনে করতে পারছে না-তাকে বললো, তার নাম

মো-মো-মো মোটুরাম।

'শুনে নিশ্চয় অবাক লেগেছিলো তোমার,' শূন্য হাসি হেসে বললো বেকার। 'হঠাৎ এক বিস্ময়কর তথ্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ায়?'

'বিস্ময়কর তথ্য উদ্‌ঘাটিত' বলে একটা নাটকীয় আবহ আনতে চেয়েছিলো বেকার, কিন্তু বলেই বুঝলো মস্ত ভুল করে ফেলছে। শব্দগুলোর মানে যখন বোঝোতে পারলো সে অনেক চেষ্টার পর, তখন আর মাত্র তিন মিনিট বাকি আছে আলোচনা শেষ হতে।

উঠে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার দিকে তাকালো বেকার।

'এখন সবাইকে একটা সারপ্রাইজ দেবো,' চওড়া হাসি হাসলো সে। 'আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে পাগলদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রত্যেককে একটা করে স্যুভনির উপহার দেবো, দেখে এই অনুষ্ঠানের কথা মনে করার জন্যে। অ্যানি, নিয়ে এসো প্লীজ।'

মাথা সামান্য কাত করে তাকালো সে। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ঢুকলো একটা সুন্দরী মেয়ে, মাথায় লাল চুল, পরনে খাটো স্কার্ট। হাতে একটা চারকোণা বড় বাক্স, সোনালি কাগজে মোড়া।

বাক্সের ডালা তোলার আগে এক সেকেন্ড দ্বিধা করলো বেকার। 'তোমাদের প্রত্যেককে একটা করে খুব দামী উপহার দেয়া হবে,' তার সব চেয়ে উষ্ণ আর চওড়া হাসিটা উপহার দিয়ে নিলো আগে সবাইকে। 'সারা জীবন ওটাকে রত্ন মনে করে রেখে দিতে পারবে তোমরা।'

উপহারটা কী, বলার আগে আবার এক সেকেন্ডের জন্যে থামলো বেকার। তারপর বললো, 'রূপার একটা করে চমৎকার কাপ, তার ওপর তোমাদের নাম খোদাই করা, অবশ্যই পাগল সংঘের দেয়া নাম। যখনই দেখবে, মনে মনে হাসবে, আর মনে করবে একসময় কি প্রচণ্ড খ্যাতিই না পেয়েছিলো সিরিজটা।'

বাক্সটা অ্যানির হাতে রেখেই ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলো বেকার। প্রায় থাবা দিয়ে ছিনিয়ে নিলো বাক্সটা। এপাশ-ওপাশ নাড়া দিলো জোরে জোরে। হাত থেকে পড়ে গেল ওটা, মাটিতে পড়ে কাত হয়ে খোলা মুখ করে রইলো ক্যামেরার দিকে।

শূন্য বাক্স। 'দামী রূপার কাজ' তো দূরের কথা, কোনো জিনিসই নেই বাক্সের ভেতরে।

বেকারের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো কিশোর। লোকটার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর এই প্রথম দেখতে পেলো সে, তার মুখে হাসি নেই।

হাসছে না হ্যারিস বেকার!

চার

'শুরু হয়নি এখনও,' রবিন বললো।

'চ্যানেল ঠিক আছে তো?' মুসার প্রশ্ন।

মাথা ঝাঁকালো রবিন। 'পৌনে পাঁচটায় দেখানোর কথা, খবরের আগে। কাগজে তো তাই লিখেছে। কিন্তু এখন তো দেখছি পুরনো এক ওয়েস্টার্ন ছবি।'

রকি বীচে ফিরেই সোজা এসে হেডকোয়ার্টারে ঢুকেছে তিন গোয়েন্দা।

রকিং চেয়ারে বসে টেবিলে পা তুলে দিয়েছে মুসা। 'আমার মনে হয়, কাপগুলো হারানোতেই অনুষ্ঠানটা দেখাচ্ছে না। কি বলো, কিশোর?'

কিশোর জবাব দিলো না। ডেস্কের ওপাশের চেয়ারে হেলান দিয়ে আনমনে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে।

টেলিভিশন অফ করে দিলো রবিন। পর্দা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল কালো হ্যাট পরা দু'জন কাউবয়।

'এখনও ওখানেই রয়েছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর।

'কারা?' টুলে বসে দেয়ালে পিঠ দিয়ে আরাম করে বসলো রবিন।

'কারা নয়, কি,' শুধরে দিলো কিশোর। 'ওই কাপগুলো। এখনও ওখানেই আছে।'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'স্টেজ নাইন থেকে আমরা চলে আসার আগে আমাদের সবার দেহতল্লাশি করেছে ওরা,' কিশোর বললো। 'তারপর গেটের কাছে আরেকবার খুঁজেছে গাড়ির ভেতর। পায়নি। যারাই চুরি করে থাকুক কাপগুলো, স্টুডিও থেকে সরাতে পারেনি। তারমানে এখনও ওখানেই আছে, সাউন্ড স্টেজের কোথাও, লুকানো।'

'এই সাউন্ড স্টেজটা আসলে কি জিনিস?' জানতে চাইলো মুসা। 'ওরকম নাম কেন?'

'কারণ,' বুঝিয়ে দিলো কিশোর, 'বহুদিন আগে যখন কথা বলা সিসটেম চালু হলো সিনেমায়, তখন তাদের সেটকে সাউন্ডপ্রুফ করার প্রয়োজন হতো পরিচালকদের। সাউন্ড স্টেজটা সে-কারণেই দরকার।'

'ও। তা কাপগুলোর কথা ঠিকই বলেছো। কিন্তু থাকলে আমাদের কি? তোমারটা নিশ্চয় পেতে চাও না? রূপার একটা কাপ দিয়ে কি আর হবে?'

'তাছাড়া ওটাতে যে নাম লেখা আছে, সেটা তুমি শোনা তো দূরের কথা,' মুচকি হেসে বললো রবিন, 'দেখতেও চাও না।…কিশোর, সত্যিই তুমি ভালো অভিনেতা।

আজ বিকেলে বোকার অভিনয় যা করলে না! হ্যারিস বেকারকে বুদ্ধু বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছো।'

'ওকে হেনস্তা করার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিলো না। আসলে মড়ার খুলি আর শিকারী কুকুরকে বেকুব বানালাম।'

'কিভাবে?' বুঝতে পারলো না মুসা।

'তলোয়ার খেলার মতো। প্রতিপক্ষ যদি বোঝে তোমার তলোয়ারটা ভোঁতা, সামনে এগোতে আর দ্বিধা করবে না। তখন তার পেটে সহজেই তলোয়ার ঢোকাতে পারবে তুমি।'

'আরে বাবা একটু সহজ করে বলো না!' দুই হাত তুলে নাচালো মুসা।

'সহজ করেই তো বললাম। আমার শত্রুরা যদি ভেবে বসে আমি এতোই বোকা, নিজের নাম মনে রাখতে পারি না, তাহলে আমাকে পরাজিত করার জন্যে বেশি চেষ্টা করবে না। তখন ওদেরকে হারানো আমার জন্যে সহজ হয়ে যাবে।'

'বুঝলাম।'

মাথ ঝাঁকালো রবিন। সে-ও এখন বুঝতে পেরেছে কিশোরের তখনকার ওই অদ্ভুত আচরণের কারণ।

'যাই হোক,' আগের কথার খেই ধরলো কিশোর, 'এই কাপ চুরির ব্যাপারটা পরিস্থিতি পালটে দিয়েছে অনেকখানি।'

'তারমানে, বলতে চাইছো,' রবিন বললো, 'তদন্ত করার মতো একটা কেস পেয়ে গেছো?'

'কিছু বুঝতে পেরেছো?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

কারও কথারই জবাব দিলো না কিশোর। নীরবে হাত বাড়ালো টেলিফোনের দিকে। একটা কার্ড দেখে নম্বর ডায়াল করলো। ওপাশ থেকে সাড়া এলে বললো, 'হ্যালো, ইজি রাইড লিমো? আমি কিশোর পাশা বলছি। আপনাদের একজন ড্রাইভার, অ্যালউড হোপার, তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর লাইনে এলো হোফার।

'হ্যালো, মিস্টার হোফার,' কিশোর বললো, 'আবার বিরক্ত করছি। এই মাত্র স্টুডিও থেকে খবর দিলো, আবার যেতে হবে আমাদেরকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্ষুণি। যদি চলে আসেন...হ্যাঁ, গেটের কাছেই থাকবো।...থ্যাংক ইউ।'

'আবার যাচ্ছি?' উঠে দাঁড়ালো মুসা। কিশোরের ডেস্কে দু'হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু ঢুকবো কিভাবে? ওরা তো তোমাকে ডাকেনি।'

'না, ডাকেনি,' বলতে বলতে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলো কিশোর। 'কিন্তু আমাকে ঢুকতে দেবে ওরা, কারণ স্টুডিও পাস আছে। লিমুজিনের জানালা

থেকে খুলে রেখে দিয়েছিলাম, আমাদেরকে যখন নামিয়ে দিয়ে গেল। তখন অবশ্য ভাবিনি আমাদেরকে আবার ঢুকতে হবে। হোফার আবার ঢুকতে পারে এই ভয়ে খুলে রেখেছিলাম।'

আবার কেন যাচ্ছে, জিজ্ঞেস করেও জবাব পেলো না রবিন। চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলো। ইচ্ছে করে কিছু না বললে হাজার জিজ্ঞেস করেও কিশোরের কাছ থেকে জবাব পাওয়া যাবে না।

স্টুডিওর গেটে এসে পাস দেখাতেই কোনো প্রশ্ন না করে ওদেরকে ছেড়ে দিলো গার্ড। নয় নম্বর স্টুডিওর সামনে এসে থামলো গাড়ি। নেই।

'বড় জোর আধ ঘন্টা লাগবে আমাদের,' শোফারকে বললো কিশোর।

'আচ্ছা,' ঘাড় কাত করলো হোফার।

ছোট দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ালো কিশোর। তালা লাগানো নেই। সব সময়ই খোলা থাকে এই স্টেজ, জানা আছে তার। কাজ করার জন্যে আবার সন্ধ্যা আটটার সময় আসবে এখানে নাইট শিফটের কর্মীরা।

মস্ত ঘরটা এখন অন্ধকার। অনেক ওপরে রয়েছে ধাতব ব্যালকনি। ওখানে, গ্যানট্রিতে কয়েকটা ঝুলন্ত তারের খাঁচার ভেতরে জ্বলছে কয়েকটা বাল্ব।

কিশোরকে অনুসরণ করে রান্নাঘরে এসে ঢুকলো মুসা আর রবিন। টর্চ জ্বেলে দেয়ালগুলো পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলো গোয়েন্দা প্রধান।

নরম সুরে নিজের সঙ্গেই কথা বলতে লাগলো সে, 'টেবিলটা ছিলো এখানে। লাঞ্চের পর নিয়ে যাওয়া হলো ওই দিকে, এখানে এনে পাতা হলো কতগুলো সুইভেল চেয়ার। আর তখন নিশ্চয় সোনালি বাস্কেট ছিলো সেটের বাইরে...'

সেটের দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। এই দরজা দিয়েই বাক্স নিয়ে ঢুকেছিলো লাল চুল মেয়েটা। দরজা খুলে ওপাশে এলো কিশোর, সঙ্গে সঙ্গে এলো দুই সহকারী।

কয়েক ফুট দূরের একটা টেবিলে আলো ফেলে বললো সে, 'বাক্সটা হয়তো ওটার ওপরেই রাখা ছিলো। কিন্তু আমরা রান্নাঘরে থাকার সময় একবারও খোলা হয়নি এই দরজা, শুধু বাক্স নিয়ে অ্যানি ঢোকার সময় ছাড়া। ওয়েইটার, ক্যামেরাম্যান সবাই রান্নাঘরে ঢুকেছে সেটের খোলা অংশ দিয়ে, আমরা যেদিক দিয়ে ঢুকেছি। তাছাড়া সারাক্ষণ লোক ছিলো ওখানে, কর্মীরা। সুতরাং,' রবিন আর মুসার দিকে ঘুরলো সে, 'তোমাদের কি মনে হয়?'

'কাপগুলো যে-ই চুরি করুক, রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে লুকাতে পারেনি,' মুসা বললো। 'তা করতে হলে ওগুলো নিয়ে সবার সামনে এই দরজা দিয়ে বেরোতে হতো, যেটা করা সম্ভব ছিলো না।'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'ধরা যাক, আমি চোর।' ক্যানভাসে তৈরি

রান্নাঘরের দেয়াল ঘুরে খোলা জায়গায় চলে এলো সে, যেখানে লাঞ্চের সময় কর্মীরা দাঁড়িয়ে ছিলো। 'আমি এখানে ছিলাম, এবং আমাকে ঘিরে ছিলো অনেক লোক। কিন্তু যদি বাক্সটা নিয়ে আমি ওদিকে ওই টেবিলের দিকে চলে যাই, আমাকে কেউ দেখবে না।' সামনের দিকে টর্চের আলো ফেললো সে। তারপর এগিয়ে গেল টেবিলটার দিকে।

'রান্নাঘরের দরজা তখন লাগানো। কাজেই এখানে হুট করে কারও চলে আসার সম্ভাবনা ছিলো না। কাজেই বাক্স খুলে কাপগুলো বের করে আবার ওটা সোনালি কাগজে মুড়ে রাখার যথেষ্ট সময় আমি পেয়ে যেতাম। সঙ্গে করে একটা চটের বস্তাটস্তা কিছু নিয়ে এলে ওগুলো ভরে ফেলতে পারতাম। কিন্তু সবার চোখের ওপর দিয়ে ওটা বের করে নিয়ে যেতে পারতাম না, কাজেই…'

'কাজেই এখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখতে হতো,' কথাটা শেষ করে দিলো রবিন। ওর টর্চ বের করে জ্বাললো। আলো ফেলতে লাগলো কতগুলো তারের কুণ্ডলী, কিছু রঙের টিন, নানারকম মালপত্রের একটা দুই ফুট চওড়া, চার ফুট লম্বা স্তূপের ওপর। সব শেষে আলো ফেললো পাশের একটা ভারি কাঠের বাক্সের ওপর।

ওটার ওপর আলো ধরে রাখলো কিশোর। তার দুই সহকারী এগিয়ে গেল বাক্সের দিকে। ভেতরে ছুতোর মিস্ত্রীর কয়েকটা যন্ত্রপাতি ছাড়া আর কিছু নেই। মালপত্রের স্তূপ আর রঙের টিনের ভেতরেও কিছু পাওয়া গেল না।

ফিরে তাকালো রবিন আর মুসা। কিন্তু কিশোর ওদের দিকে তাকিয়ে নেই। সে গিয়ে দাঁড়িয়েছে একটা আর্ক লাইটের ধাতব স্ট্যান্ডের কাছে। হাত দিয়েই খোলা-লাগানো যায় এরকম বড় বড় স্ক্রুগুলো পরীক্ষা করছে।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সে। ঝট করে চোখ তুলে তাকালো কয়েক ফুট ওপরের কালো বড় বাক্সটার দিকে, যেটাতে রিফ্লেক্টর ভরা থাকে।

'এই এদিকে এসো, সাহায্য করো আমাকে।'

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো দুই সহকারী। স্ক্রুগুলো ঢিল করে বাক্সটা নিচে নামাতে সাহায্য করলো কিশোরকে। বাক্সের হুড়কো খুলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলো গোয়েন্দাপ্রধান।

হঠাৎ যেন রাতের আকাশে সূর্য উঠলো। দপ করে জ্বলে উঠলো হাজার ভোল্টের অসংখ্য বাতি, অন্ধকারের চিহ্নমাত্র রইলো না সেটের কোথাও। আলোর বন্যায় ভেসে গেল সমস্ত রান্নাঘর।

পাঁচ

আর্ক লাইটের আলোয় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। ধাতব দণ্ডটায় এখনও হাত রয়ে গেছে মুসা আর রবিনের। কিশোরের হাত রিফ্লেক্টর বক্সের ভেতরে।

'যেখানে আছো, দাঁড়িয়ে থাকো,' আদেশ দিলো একটা কণ্ঠ।

দাঁড়িয়ে রইলো ছেলেরা। আলো জ্বালানোর মাস্টার কন্ট্রোল সুইচ বক্সের কাছ থেকে তাদের দিকে এগিয়ে এলেন পাগল সংঘের পরিচালক রাফায়েল সাইনাস। তাকিয়ে আছেন কিশোরের দিকে। বের করে আনার দরকার নেই আর। উজ্জ্বল আলোয় এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বাক্সের ভেতরে রিফ্লেক্টরের পাশে পাঁচটা রূপার কাপ।

'তাহলে ওখানেই লুকিয়েছো,' সাইনাস বললেন। বিকেলে দেখা গিয়েছিলো বিধ্বস্ত এক বৃদ্ধ, এখন অন্য রকম হয়ে গেছে কণ্ঠস্বর। বহু বছর আগের সেই ধার আবার ফিরে এসেছে অনেকখানি।

'দু'হাজার ডলার খরচা হয়েছে স্টুডিওর ওগুলো কিনতে,' বললেন পরিচালক। 'চুরি করেছো তোমরা। সবাই চলে যাওয়ার পর এখন এসেছো বের করে নিতে।'

'না,' কিশোর বললো। 'আমরা লুকাইনি। খুঁজে বের করেছি।' এক এক করে বাক্সের ভেতর থেকে বের করে তুলে দিতে লাগলো পরিচালকের হাতে।

'কে বিশ্বাস করবে তোমার কথা?' পরিচালক বললেন। 'যে লুকিয়েছে, তারই শুধু এতো সহজে ওগুলো খুঁজে পাওয়ার কথা।'

'আমি চুরি করিনি!' গলা সামান্য চড়ালো কিশোর। 'ভেবে বের করেছি কোথায় ওগুলো লুকিয়ে রাখতে পারে চোর। হেডকোয়ার্টারে বসে আলোচনা করেছি আমরা...'

'হেডকোয়ার্টার?' তীক্ষ্ণ হলো পরিচালকের দৃষ্টি। 'কি বলতে চাইছো?'

'আমাদের অফিস। যখন কোনো কেস হাতে পাই, ওখানে বসে আলোচনা করি আমরা। গবেষণা করি।'

'কিসের কেস?' সাইনাসও গলা চড়ালেন। 'এরপর হয়তো বলে বসবে, তোমরা পুলিশের লোক। গোয়েন্দা।'

'গোয়েন্দাই আমরা, তবে পুলিশের লোক নই। আমরা শখের গোয়েন্দা।' পকেট থেকে কার্ড বের করে দিলো কিশোর।

শূন্য দৃষ্টিতে কার্ডটার দিকে তাকালেন পরিচালক। 'তাতে কিছু প্রমাণ হয় না,' গলার স্বরে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হলো না তাঁর। 'যে কেউ ওরকম ছেপে নিতে পারে। যদি ছেপে নাও তুমি এই স্টুডিওর প্রেসিডেন্ট, তাহলেই কি প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবে? এটা কোনো প্রমাণ না যে তুমি কাপ চুরি করোনি।'

'কিন্তু আমরা করিনি,' জোর দিয়ে বললো রবিন। 'এখানে এসে পাওয়ার আগে জানতামই না কোথায় লুকানো আছে।'

'আমরা শুধু আন্দাজ করেছি,' মুসা বললো, 'এখানেই কোথাও আছে।'

'তারপর কিশোর বুঝে ফেললো,' রবিন বললো আবার, 'ওই রিফ্লেক্টর বক্সে

রয়েছে ওগুলো।'

'আর এখানে সমস্ত স্ট্যান্ডের মধ্যে সব চেয়ে বেশি তুলে রাখা হয়েছে ওই বাক্সটার স্ট্যান্ড,' বললো কিশোর, 'সে-কারণেই অবাক লাগলো। অস্বাভাবিক। ভাবলাম, কেন তুলে রাখা হয়েছে? নিশ্চয় কোনো ব্যাপার আছে।'

কিন্তু এতো কথা বলার পরেও বিশ্বাস করার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না পরিচালকের মাঝে।

চুপ করে এক মুহূর্ত ভাবলো কিশোর। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি নিশ্চয় মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের নাম শুনেছেন? চিত্রপরিচালক?'

'তাঁর নাম কে না শুনেছে,' শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন সাইনাস। 'কেন, তিনি তোমাদের সাফাই দেবেন?'

'নিশ্চয় দেবেন। আপনি ফোন করেই দেখুন না।'

হাসলেন সাইনাস। 'তোমাদের কপাল খারাপ, তিনি এখন নেই। বাইরে গেছেন একটা শুটিঙের কাজে। বেশ কিছুদিন আসবেন না।'

আবার চুপ হয়ে গেল কিশোর। দমে গেছে রবিন আর মুসা। সাইনাসকে বোঝানোর আর কোনো উপায় নেই।

কিন্তু কিশোর দমলো না। আবার জিজ্ঞেস করলো, 'ভিকটর সাইমনের নাম শুনেছেন? রহস্য কাহিনী লেখক?'

'একের পর এক বিখ্যাত লোকদের নাম বলে যাচ্ছো। ব্যাপারটা কি? তিনিও কি সাফাই দেবেন নাকি?'

'কেন দেবেন না?'

দ্বিধা করলেন সাইনাস। 'তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। ফোন নম্বর জানি না।'

'আমি জানি,' পরিচালকের হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে তার উল্টো পিঠে ফোন নম্বর লিখে দিলো কিশোর।

আরেকবার দ্বিধা করলেন পরিলাচক। তারপর হেঁটে গেলেন স্টেজের দেয়ালে বসানো টেলিফোনটার দিকে। তাঁকে ডায়াল করতে দেখলো তিন গোয়েন্দা। তবে এত দূর থেকে কথা শুনতে পেলো না। অনেক সময় ধরে কথা বললেন। তারপর রিসিভার রেখে দিলেন হাসিমুখে।

ফিরে এসে জানালেন, 'আমাকে চিনতে পেরেছেন তিনি। আমার নাম জানেন। আশ্চর্যই লেগেছে। তাঁর একটা ছবির শুটিং হয়েছিল, আমাদের এই স্টুডিওতে। তখন নাকি আমার সাথে দেখা হয়েছিলো, অথচ আমি ভুলে বসে আছি।' আবার হাসলেন তিনি। 'বলার সঙ্গে সঙ্গেই নিতে পারলেন।'

'আমাদের কথা কি বলেছেন?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'ও, তোমাদের কথা,' জোর করে যেন অতীত থেকে নিজেকে বাস্তবে টেনে আনলেন সাইনাস। 'হ্যাঁ, তোমাদের কথা বলেছেন। তোমরা চোর নও। তোমরা ইচ্ছে করলে এখন বাড়ি যেতে পারো। কাপগুলো আমি জায়গামতো পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করছি।'

'তাঁকে ধন্যবাদ দিলো কিশোর।

'আশ্চর্য,' বিড়বিড় করলেন সাইনাস, কিশোরের কথা যেন শুনতেই পাননি, 'এই ফিল্ম ব্যবসা! এটা এমন এক জায়গা, এখানে চোখের আড়াল হলেই মানুষ মানুষকে দ্রুত ভুলে যায়। অথচ ভিক্টর সাইমন আমাকে ভোলেননি। আর কাণ্ড দেখো, আমি ভুলে বসে আছি। তিনি বললেন, তাঁর ছবিটা পরিচালনার কথা নাকি প্রথমে আমারই ছিলো। পরে আরেকজনকে নেয়া হয়েছে, আমি সময় দিতে পারিনি বলে। আমার পরিচালিত সমস্ত ভালো ছবির নাম মনে আছে তাঁর।'

বেরোনোর জন্যে সহকারীদেরকে ইশারা করলো কিশোর। সাইনাসকে তার অতীতের মধ্যেই ডুবে থাকতে দিলো ওরা। এগোলো সাউন্ড স্টেজের দরজার দিকে।

'কি ভাবছো, কিশোর?' রাস্তায় পা দিয়েই জিজ্ঞেস করলো মুসা।

জবাব দিলো না গোয়েন্দাপ্রধান। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে।

'কে চুরি করেছে বলে মনে হয় তোমার?' রবিনের প্রশ্ন।

'ওই আর্ক লাইট,' ওদের কথা যেন কানেই ঢোকেনি কিশোরের, 'কেউ জানতো, ওগুলো ব্যবহার করা হবে না।' থমকে দাঁড়ালো সে। পেছনে দাঁড়িয়ে গেল রবিন আর মুসা, বিশাল স্টেজ-বাড়িটার ছায়ায়। 'বোধহয় সে-কারণেই সে ক্যামেরাগুলো চালু হওয়াতক অপেক্ষা করেছিলো...,' ভ্রূকুটি করলো সে। 'কি জানি, এখনও শিওর হতে পারছি না।'

'মড়াটা?' মুসা বললো। 'নাকি ভারিপদ?'

'শিওর না,' একই কথা বললো কিশোর। 'বেশ কিছু রহস্য জট পাকিয়ে আছে এখনও।'

'যেমন?' রবিন জানতে চাইলো।

'এক নম্বর,' একটা আঙুল তুললো কিশোর, 'আমাদের শোফার অ্যালউড হোফার।'

'তার আবার কি রহস্য?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'ওর স্মৃতিশক্তি,' বুঝিয়ে দিলো কিশোর, 'এত কম কেন? সকালে স্টুডিওর গেট গার্ড তাকে দেখেই চিনতে পারলো, তারমানে এখানে সে অনেকবার এসেছে। তার পরেও নয় নম্বর স্টেজ কোথায় জানার জন্যে অন্যেকে জিজ্ঞেস করতে হলো কেন?'

পথের শেষ মাথায় পার্ক করা লিমুজিনের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলো আবার

কিশোর। 'আমাদের সামনে সাউন্ড স্টেজটা না চেনার ভান করছে সে। কেন?'

'সে-ই কি কাপগুলো চুরি করেছে ভাবছো?' রবিন বললো।

আবার ভ্রূকুটি করলো কিশোর। 'এখনও জানি না। তবে, আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার ঠিক আগে রান্নাঘরের পেছন ঘুরে ওকে হেঁটে যেতে দেখেছি আমি।'

ছয়

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে মেরিচাচীকে বাসন-পেয়ালা ধুতে সাহায্য করলো কিছুক্ষণ কিশোর। তারপর বেরিয়ে এসে ঢুকলো তার ওয়ার্কশপে। কুইজ শো'র অনুষ্ঠান রেকর্ড করতে টেলিভিশন স্টেশনে যাবার কথা দুটোর সময়।

বেশির ভাগ কুইজ শোতেই, জানে সে, যার যার নিজের বিষয় পছন্দ করে নিতে বলা হয়। ওয়ার্কবেঞ্চে বসে বসে ভাবতে লাগলো সে, ওদেরকে কি সেরকম কোনো সুযোগ দেয়া হবে? যদি হয়, তাহলে কোন্ বিষয় পছন্দ করবে সে? বিজ্ঞান। ইস্কুলে তার সব চেয়ে প্রিয় বিষয়।

আগের দিন বেকারকে শো-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলো নেলি। জবাব দেয়নি বিজ্ঞাপন ম্যানেজার। শুধু বলেছে, 'সারপ্রাইজ দেয়ার জন্যে সেটা গোপন রাখতে হচ্ছে, সরি।'

একটা টিনের ছাউনির নিচে রয়েছে এই ওয়ার্কবেঞ্চ। বেঞ্চটার একধারে পড়ে আছে কয়েকটা পুরনো ভাঙা ক্যামেরা। কিনে নিয়ে এসেছিলেন রাশেদ পাশা। ওগুলোর কোনোটার লেন্স, কোনোটার শাটার আর নানারকম পার্টস খুলে নিয়ে একটা বিশেষ ধরনের ক্যামেরা তৈরি করার ইচ্ছে কিশোরের। খুব ছোট জিনিস। জ্যাকেটের নিচে লুকিয়ে রেখে বোতামের ফুটো দিয়ে চোখ বের করেই যেটার সাহায্যে ছবি তোলা যাবে। পুরনো যন্ত্রপাতি দিয়ে নতুন ধরনের কিছু তৈরি করে ফেলা তার হবি।

কয়েক মিনিট কাজ করার পরই হঠাৎ সোজা হয়ে মুখ তুললো সে, নামিয়ে রাখলো হাতের যন্ত্রপাতি। মাথার ওপরের লাল বাতিটা জ্বলছে-নিভছে। তারমানে ফোন বাজছে হেডকোয়ার্টারে।

দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেলারে ঢুকে রিসিভার তুলে নিলো সে। 'হ্যালো, কিশোর পাশা বলছি।'

'হ্যালো, রাফায়েল সাইনাস বলছি। আমি ফোন করায় আশা করি কিছু মনে করোনি।'

অবাক হয়ে ভাবলো কিশোর, কিভাবে খানিক পর পরই বদলে যায় সাইনাসের কণ্ঠস্বর। কাল রাতে কথা বলার সময় পুরনো কণ্ঠ ফিরে পেয়েছিলেন, এখন আবার মনে

হচ্ছে পরাজিত, বিধ্বস্ত।

'মোটেই না,' জবাব দিলো কিশোর। 'বরং খুশি হয়েছি। জানতে ইচ্ছে করছে কাপ চোরকে ধরতে পেরেছেন কিনা।'

'না। পুরোপুরি পারিনি এখনও। সে-ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।' আবার পুরনো সুর খানিকটা ফিরে এলো। সাইনাসের কণ্ঠে। 'ফোনে এতো কথা গুছিয়ে বলা যাবে না। তুমি যদি দুপুরে একটু আগে আগে চলে আসো, তাহলে বলতে পারি।'

'আসবো। ক'টায় আসতে বলেন?'

'এই এগারোটা। রিসিপশন ডেস্কে আমার নাম বললেই হবে।' একটু থামলেন। 'তোমার বন্ধুরাও আসছে?'

'না। একাই আসতে হবে আমাকে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে খারাপই লাগলো কিশোরের, রবিন আর মুসাকে সঙ্গে নিতে পারছে না বলে। দুপুরে হলে পারতো, কিন্তু এগারোটায় নেয়া যাবে না। ওরা বাড়ি নেই। সৈকতে গেছে সাঁতার কাটতে। কিশোরকেও যেতে অনুরোধ করেছিলো। সে রাজি হয়নি। অনেক পথ সাইকেল চালিয়ে গিয়ে সাঁতার কেটে এসে ক্লান্ত হয়ে যাবে, শো-এর সময় অসুবিধে হবে।

রবিনের মাকে ফোন করলো সে। বলে দিলো, সে যথাসময়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে, রবিন আর মুসাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। রবিনকে যেন বলে দেন তিনি। বিশেষ কারণে তাকে আগেই চলে যেতে হচ্ছে।

তারপর অ্যালউড হোফারকে ফোন করলো। ফোন ধরলো হোফারই। বললো তিরিশ মিনিটের মধ্যেই ইয়ার্ডে পৌঁছে যাবে।

গাঢ় রঙের স্যুট, সাদা শার্ট আর সুন্দর একটা টাই পরে এসে ইয়ার্ডের গেটে দাঁড়ালো কিশোর। গাড়ি এলো।

নীরবে চললো ওরা হলিউডের দিকে। একটা কথাও বললেন না হোফার। কিন্তু টেলিভিশন নেটওয়ার্ক অফিসের বিরাট বিল্ডিংটার সামনে গাড়ি রেখে যখন কিশোরের নামার জন্যে পেছনের দরজা খুলে দিলো সে, কিশোরের মনে হলো শোফার কিছু বলতে চায়। চত্বরে চুপ করে দাঁড়ালো সে, শোনার জন্যে।

'কুইজ শোর শুটিং দেখিনি কখনও,' হোফার বললো। 'অনেক দর্শক উপস্থিত থাকে ওখানে, না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো কিশোর। 'অন্তত শ'দুয়েক লোক তো থাকবেই।'

'দেখাটা নিশ্চয় খুব মজার,' এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভার সরালো হোফার। দ্বিধা করে বললো, 'বাড়তি টিকেট কি আছে আর?'

আছে। চারটে টিকেট দিয়েছে বেকার, যদি পরিবারের কাউকে আনতে চায় কিশোর, সে-জন্যে। রবিন আর মুসাকে দুটো দেয়ার পরেও আরও দুটো রয়ে গেছে তার কাছে, মেরিচাচী আর রাশেদ পাশার। তাঁরা আসেননি। একটা বের করে দিলো সে।

'অনেক ধন্যবাদ,' বলে খুব আগ্রহের সঙ্গে টিকেটটা নিলো হোফার। 'আপনার বন্ধুদেরকে আগে নিয়ে আসি, তারপর শো দেখবো।'

বাড়িটায় ঢুকলো কিশোর। মুখে চিন্তার ছাপ। ক্রমেই অবাক করছে তাকে অ্যালউড হোফার। তার বয়েসী একজন লোক একদল, 'প্রাক্তন শিশু শিল্পীর' বকবকানি শুনে কি মজা পাবে? কি জানি, কার যে কোন্ জিনিস কখন ভালো লাগবে, বলা যায় না। হোফারের ভাবনা আপাতত মন থেকে বিদায় করলো সে।

সোজা সাইনাসের অফিসে কিশোরকে পাঠিয়ে দিলো ডেস্কের রিসিপশনিস্ট। দরজার ওপরে লেখা রয়েছে 'গেস্ট ডিরেক্টরস'। তাকে দেখে খুশি হলেন পরিচালক। ডেস্কে তাঁর মুখোমুখি বসলো কিশোর।

'কাল রাতে ভিকটর সাইমন অনেক প্রশংসা করলেন তোমার,' বলতে শুরু করলেন সাইনাস। 'যদি শুধু কিশোর বলে ডাকি তোমাকে, কিছু মনে করবে?'

'আপনার বয়েসী অনেকেই আমাকে কিশোর বলে ডাকে, মনে করবো কেন?'

'গুড। সাইমন বললেন গোয়েন্দা হিসেবে তুমি নাকি অসাধারণ। অনেকগুলো জটিল রহস্যের সমাধান নাকি করেছো তুমি আর তোমার দুই বন্ধু মিলে।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

'সে-জন্যেই আমার হঠাৎ মনে হলে...,' থেমে গেলেন পরিচালক। 'ওই কাপ চুরির ব্যাপারটা জানাজানি করতে চায় না স্টুডিও কর্তৃপক্ষ, সেজন্যেই পুলিশকে জানায়নি।' আবার দ্বিধা করলেন তিনি। 'কাল রাতেই আমি ভেবেছি, এটা তোমাদের জন্যে একটা চমৎকার রহস্য হতে পারে। যদি চোরটাকে ধরে দিতে পারো ছোটখাটো একটা পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করতে পারি হয়তো।'

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে কিশোর বললো, 'পুরস্কারের চেয়ে কেসের ব্যাপারেই আমরা বেশি আগ্রহী।'

'গুড,' সাদা পাতলা চুলে আঙুল চালালেন সাইনাস। 'কাউকে বলে দেবে না, শুধু এই বিশ্বাসের ওপর তোমাকে আমি বলছি, কিশোর, কাপগুলো কে চুরি করেছে, আমি জানি। যদিও এটা আমার সন্দেহ, তবে খুব জোরালো সন্দেহ।'

চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলো কিশোর।

'কাল রাতে সাউন্ড স্টেজ থেকে বেরোনোর সময় দেখলাম একটা লোক দৌড়ে যাচ্ছে দরজার দিকে। আমার পায়ের শব্দে চমকে গিয়ে নিশ্চয় দৌড় দিয়েছিলো।

বাইরে তখন অন্ধকার, তবু কিছু কিছু দেখা যাচ্ছিলো। দেখলাম তরুণ বয়েসী একটা লোক ছুটে যাচ্ছে স্টুডিওর গেটের দিকে।'

এবারও কিছু বললো না কিশোর।

'ওর চেহারা দেখতে পাইনি,' সাইনাস বললেন, 'তবে ওর চলাফেরাটা আমার কাছে বেশ পরিচিত লাগলো। পা নাড়ে অনেকটা চার্লি চ্যাপলিনের মতো। সেই ছেলেটা, যে চ্যাপলিনের অনুকরণ করতো, পাগল সংঘের ভারিপদ।'

'কাপগুলো বের করে নিতে এসেছিলো ভাবছেন?' প্রথম প্রশ্নটা করলো কিশোর।

মাথা ঝাঁকালেন পরিচালক। 'তাছাড়া আর কি? আর তো কোনো কারণ থাকতে পারে না।'

আর কোনো কারণের কথা কিশোরও ভাবতে পারলো না। 'কিন্তু তার দৌড়ে পালানোই প্রমাণ করে না যে ভারিপদই চোর।'

'তা করে না, তবে সন্দেহ করতে দোষ নেই,' আবার আগের কণ্ঠস্বর পুরোপুরি ফিরে পেয়েছেন পরিচালক। সোজা হয়ে গেছে কাঁধ। 'একটা অনধিকার চর্চা করেছি। আমি জানি, আজ শনিবার, সাউন্ড স্টেজে শুটিং হবে না। কালও বন্ধ। সোমবারের আগে খুলছে না। এটা ভেবেই দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে এসেছি আমি।'

পকেট থেকে একটা চাবি বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন তিনি। 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারিপদই একাজ করেছে। আবার ফিরে যাবে স্টেজে, কাপগুলোর জন্যে। ও এখনও জানে না যে কাপগুলো যেখানে লুকিয়েছে সেখানে নেই।'

'ঠিক কাজই করেছেন আপনি,' কিশোর বললো।

'কর্তৃপক্ষ কড়া নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে, ব্যাপারটা যাতে গোপন রাখা হয়।' চাবিটা কিশোরের দিকে ঠেলে দিলেন তিনি। 'নাও। ভারিপদের ওপর চোখ রাখবে। হয়তো ওকে ফাঁদে ফেলার একটা বুদ্ধিও বের করে ফেলতে পারবে। যা ভালো বোঝো করো। তো, এখন আমাকে তো মাপ করতে হয়। কিছু জরুরী কাজ সারার আছে।'

চাবিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো কিশোর।

সে বেরিয়ে আসার সময় আবার বললেন সাইনাস, 'ভারিপদর ওপর কড়া নজর রাখবে।'

করিডরে বেরিয়ে ঘড়ি দেখলো কিশোর। শো শুরু হতে এখনও ঘণ্টা দুই বাকি। লিফটে করে লবিতে নেমে এলো আবার সে। কোণের একটা সোফায় আরাম করে বসলো। রাস্তার দিকের দরজা খুলে লোক আসছে, যাচ্ছে। ঢুকে বেশির ভাগই এগিয়ে যাচ্ছে লিফটের দিকে, রিসিপশন ডেস্কের কাছে থামছে কেউ কেউ।

হঠাৎ সামনে ঢুকে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললো কিশোর। যার ওপর চোখ রাখতে বলা হয়েছে তাকে, সে ঢুকলো। লিফটের দিকে হেঁটে চলে গেল ভারিপদ।

ভরিপদ উঠলো। বন্ধ হলো লিফটের দরজা। উঠে গিয়ে নির্দেশক বাতির দিকে তাকিয়ে রইলো কিশোর। কোন্ কোন্ তলায় থামছে লিফট, কতোক্ষণের জন্যে, বাতিই বলে দিচ্ছে পরিষ্কার।

কয়েকবার থামলো লিফট। বোঝার উপায় নেই, ভারিপদ নামলো কোন তলায়। ফিরে এসে আবার আগের জায়গায় বসলো কিশোর।

একটা কথা অবশ্য জেনেছে কিশোর, সতেরো তলায় কুইজ শো-এর শুটিং হওয়ার কথা, কিন্তু সেই তলায় থামেনি লিফট। স্টুডিওতে ঢোকেনি ভারিপদ, তারমানে এই বিল্ডিঙেই অন্য কারও সঙ্গে দেখা করতে গেছে সে। বলা যায় না, আবার ফিরে আসতে পারে লবিতে। কিশোর যেমন এসেছে।

যেখানে আছে সেখানেই বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো কিশোর। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। মিনিট পাঁচেক পরেই ফিরে এলো ভারিপদ। হেঁটে গেল তার সামনে দিয়ে। হাতে একটা খাম। বেরিয়ে গেল সে।

পিছু নিলো কিশোর। চত্বরে বেরিয়ে দেখলো, একটা মোটর সাইকেলে উঠে স্টার্ট দিলো ভরিপদ। রওনা হলো ভাইন স্ট্রীট যেদিকে রয়েছে সেদিকে।

ট্যাক্সির আশায় এদিক ওদিক তাকালো কিশোর। কয়েক গজ দূরে একটা ট্যাক্সি থেকে নামছেন এক বৃদ্ধা মহিলা।

মহিলার ভাড়া মিটিয়ে দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো কিশোর, তারপর লাফ দিয়ে উঠে পড়লো পেছনের সীটে।

'কোথায় যাবো?' জিজ্ঞেস করলো ড্রাইভার।

সামনে ঝুঁকে আছে কিশোর, দ্রুত ভাবনা চলছে মাথায় ভারিপদ যদি স্টুডিওতে যায়ই, তাকে ওখানে অনুসরণ করে গিয়ে লাভ নেই। বরং তার আগেই গিয়ে যদি সাউন্ড স্টেজের ভেতরে লুকিয়ে থাকতে পারে, তাহলে···

ড্রাইভারকে স্টুডিওর ঠিকানা বললো সে। মোটর সাইকেলটা এঞ্জিন খুব একটা জোরালো নয়, জোরে চালালে ওটার আগেই ভাইন স্ট্রীটে পৌঁছে যাবে ট্যাক্সি।

ঠিকই আন্দাজ করেছে সে। যাওয়ার পথে দ্বিতীয় ট্র্যাফিক সিগন্যালের কাছেই মোটর সাইকেলটাকে পেছনে ফেললো ট্যাক্সি। মাত্র দুই মাইল দূরে স্টুডিও, হলিউড বুলভারের পরেই।

স্টুডিওর গেটে নেমে ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে দিলো কিশোর। গার্ডকে পাস দেখাতেই পথ ছেড়ে দিলো। দ্রুত নয় নম্বর স্টেজের নির্জন বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়ালো সে। চাবি দিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢুকলো।

পুরোপুরি অন্ধকার এখন বিশাল ঘরটা। সাথে টর্চ থাকলে ভালো হতো, তবে আফসোস করে নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। যে কোনো মুহূর্তে এখানে পৌঁছে

যেতে পারে ভারিপদ, যদি এখানেই আসার উদ্দেশ্য থাকে তার।

দরজাটা সামান্য ফাঁক করে রাখলো কিশোর, কিছুটা আলো যাতে আসতে পারে সেজন্যে। তবে খুব একটা সুবিধে হলো না। অনুমানে রান্নাঘরের দিকে এগোলো সে। বড় জোর মিটার দশেক এগিয়েছে, এই সময় দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হলো। ফিরে তাকিয়ে দেখলো, ফাঁক বন্ধ হয়ে গেছে। কোনো আলোই আসছে না এখন। বাইরে থেকে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

অন্ধকারে যতোটা দ্রুত সম্ভব, দরজার কাছে ফিরে এলো কিশোর। দরজায় ঠেলা দিলো। পাল্লা খুললো না। আরো জোরে ধাক্কা লাগালো সে। অনড় রইলো পাল্লা। বাইরে খিল লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্ধকার, শব্দনিরোধক এই বাড়িতে আটকা পড়েছে সে। হাজার চিৎকার করলেও এখান থেকে বাইরে শব্দ যাবে না, সে-রকম করেই তৈরি করা হয়েছে এটা। সোমবার সকালের আগে স্টুডিওর কোনো কর্মীও ঢুকবে না এখানে।

এবং আর দেড় ঘন্টার মধ্যেই কুইজ শো'র শুটিং শুরু হবে।

পুরো একটা মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবলো কিশোর। দ্রুত চলছে মগজ, তবে আতঙ্কে নয়। মনে মনে পরিকল্পনা তৈরি করছে মুক্তির।

প্রথমেই দরকার, আলো।

আগের দিন বিকেলের কথা মনে পড়লো তার। আর্ক লাইটগুলো জ্বলে ওঠার পর মাস্টার কন্ট্রোলের কাছ থেকে সরে আসতে দেখা গিয়েছিলো সাইনাসকে। কিশোররা যখন কাপগুলো খুঁজে পেয়েছে।

রান্নাঘরটা কোনদিকে আছে, অনুমান করে দেয়ালের ধার ঘেঁষে সেদিকে এগুলো সে। রান্নাঘরের সেটের শেষ মাথায়ই আছে মাস্টার কন্ট্রোল। অন্ধকারে হাতড়াতে লাগলো। মনে হলো, দীর্ঘ এক যুগ পর হাতে লাগলো ধাতব সুইচ বক্সটা। হুড়কো খুলে ডালা মেললো। ভেতরে আঙুল ঢোকাতেই হাতে লাগলো সুইচ হ্যান্ডেল। ধরে নামিয়ে দিলো নিচের দিকে।

আলোয় ভেসে গেল রান্নাঘর।

এখন দুই নম্বর কাজ, টেলিফোন।

মাত্র কয়েক মিটার দূরে রয়েছে ওটা। দেয়ালে ঝোলানো। এগিয়ে গিয়ে রিসিভার নামিয়ে কানে ঠেকালো সে।

মৃত। একেবারে ডেড হয়ে আছে টেলিফোন।

সাত

কিন্তু তাতেও নিরাশ হলো না গোয়েন্দাপ্রধান। সে আশাও করেনি টেলিফোনটা কাজ করবে। যে লোক তাকে এখানে আটকে রেখে গেছে, সে টেলিফোন চালু রেখে যাবে এতো বোকা নিশ্চয় নয়।

তিন নম্বর কাজ, ফোনটা ঠিক করা, সম্ভব হলে।

কোথায় লাইনটা কাটা হয়েছে, সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। মেঝের কাছাকাছি জায়গায়। তবে যে কেটেছে সে ভালোমতোই জানে কিভাবে কি করতে হবে। শুধু কেটেই ক্ষান্ত হয়নি, অনেকখানি জায়গার তার টেনে তুলে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

রান্নাঘরের পেছনে এখনও আছে ছুতোর মিস্ত্রীর যন্ত্রপাতিগুলো। ভালো শক্ত একটা প্লায়ার্স পাওয়া গেল ওখানে। আর সাউন্ড স্টেজ-ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে খানিকটা ভালো তার জোগাড় করাও এমন কোনো কঠিন কাজ নয়। একটা স্পটলাইট থেকেই সেটুকু তার কেটে নিয়ে এলো সে।

দ্রুত হাত চালিয়ে ফোনের লাইনের সঙ্গে তারটা জোড়া দিয়ে ফেললো। রিসিভার তুলতে গিয়ে দুপ দুপ করছে বুক। কাজ হবে তো? বলা যায় না, বিল্ডিঙের বাইরেও কাটা হয়ে থাকতে পারে তার। তাহলে সর্বনাশ।

কিন্তু রিসিভার কানে ঠেকাতেই একটা মিষ্টি শব্দ কানে এলো তার। টেলিফোনের শব্দ সাধারণত বিরক্তই করে তাকে, কিন্তু এখন ডায়াল টোনের আওয়াজ শুনে মনে হলো জীবনে যতগুলো মধুরতম আওয়াজ শুনেছে এটা তার মধ্যে একটা।

স্টুডিওর সুইচবোর্ডে ফোন করে কাউকে আসতে বলতে পারে, নিশ্চয় বাড়তি চাবি আছে ওদের কাছে। কিন্তু ওরা এলে হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হবে, প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। এখনই সব কিছু ফাঁস করে দিতে চায় না সে। নিজেদের মধ্যে, অর্থাৎ তিন গোয়েন্দার মধ্যেই আপাতত সীমাবদ্ধ রাখতে চায় ব্যাপারটা।

নিশ্চয় এতোক্ষণে সৈকত থেকে বাড়িতে চলে এসেছে মুসা। তাকেই ফোন করলো কিশোর। দ্বিতীয়বার রিং হতেই রিসিভার তুললো স্বয়ং মুসা। সংক্ষেপে তাকে বুঝিয়ে বললো কিশোর, কি ঘটেছে।

তারপর বললো, 'এখুনি অ্যালউড হোফারকে ফোন করে বলো তোমাকে এখানে নিয়ে আসতে। আমি দরজার নিচের দিকে একটা ফুটো করার চেষ্টা করছি, ওখান দিয়ে চাবি বের করে দেবো।'

কিশোর রিসিভার রাখার পর আর একটা সেকেন্ড দেরি করলো না মুসা। হোফারকে ফোন করলো। তিরিশ মিনিটের মধ্যে ওদের বাড়িতে পৌঁছে গেল শোফার।

রবিনকে ফোন করে আগেই আনিয়ে রেখেছে মুসা। তাড়াহুড়ো করে দু'জনে উঠে বসলো গাড়িতে।

আর কিছু করার নেই দু'জনের। এখন সব দায়দায়িত্ব হোফারের, লিমুজিন নিয়ে কতো তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবে স্টুডিওতে। কিন্তু সে-ও যেন কিছু করতে পারছে না। শনিবারের হলিউডের রাস্তা, সাংঘাতিক ভিড়। যাই হোক, অবশেষে ভাইন স্ট্রীটে পৌঁছলো গাড়ি। দেখা গেল স্টুডিওর গেট।

গার্ড-বুদ থেকে বেরিয়ে এলো গার্ড, গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো। হাত বাড়ালো, 'পাস দেখি?'

পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো দুই সহকারী গোয়েন্দা। এই কথাটা তো একবারও মনে পড়েনি! পাস রয়েছে কিশোর পাশার কাছে।

বাটালির মাথায় হাতুড়ির শেষ আঘাতটা দিয়ে থামলো কিশোর। মেঝেতে নামিয়ে রাখলো যন্ত্র দুটো, তারপর পরিষ্কার করে ফেলতে লাগলো দরজার নিচ থেকে কাঠের কাটা চিলতেগুলো। শুয়ে পড়ে চোখ রাখলো কাটা জায়গার কাছে, বাইরে তাকালো।

ঠিকই আছে। চাবি বের করে দেয়া যাবে। চতুর্থ কাজটাও সমাপ্ত। এখন মুসা এসে হাজির হলেই চাবিটা ঠেলে দেবে বাইরে।

ঘড়ি দেখলো কিশোর। দুটো বাজতে সতেরো মিনিট বাকি। এতো দেরি করছে কেন মুসা? এতোক্ষণে পৌঁছে যাওয়ার কথা। শোফারের সঙ্গে কোনো গোলমাল হলো? নাকি অন্য কোনো কারণে আটকে গেছে?

অ্যালউড হোফারের রহস্যজনক আচরণের কথা পড়তেই অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলো কিশোর।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে লিমুজিন।

'পাস আছে আমাদের,' বোঝানোর চেষ্টা করছে মুসা, 'কিন্তু ভুলে বাড়িতে ফেলে এসেছি। আমাদের চিনতে পারছেন না? গতকালও আমরা এসেছিলাম, পাগল সংঘের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে। আমাদের বন্ধু কিশোর পাশাকে তুলে নিতে এসেছি।'

গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লো গার্ড। 'আমি ওসব শুনতে চাই না। তাছাড়া আজকে বাইরের কারও আসারও কথা নয়, আমাকে ইনফর্ম করা হয়নি। পাস ছাড়া ঢুকতে দেবো না।'

'কি-কিন্তু...,' তোতলাতে শুরু করলো রবিন, 'আমরা...'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজা খুলে নেমে পড়লো হোফার। পেছনের দরজা খুলে দিয়ে বললো, 'নামুন আপনারা।'

ওরা নামতে আবার গার্ডের দিকে ফিরলো হোফার। 'এই গাড়িটা মিস্টার হ্যারিস বেকার ভাড়া নিয়েছেন, স্টুডিওর বিজ্ঞাপন ম্যানেজার। তিনিই এদেরকে অনুমতি দিয়েছেন স্টুডিওটা ঘুরে দেখার জন্যে। আমাকে পাঠিয়েছেন দেখিয়ে নিয়ে যেতে।'

'কিন্তু মিস্টার বেকার তাঁর অফিসে আছেন বলে তোর মনে হয় না...'

'না, তিনি নেই। তাঁর সেক্রেটারি আমাদের কোম্পানিতে ফোন করেছিলো গাড়ি নিয়ে আসার জন্যে। দড়াম করে পেছনের খোলা দরজাটা লাগিয়ে দিলো হোফার। 'তিনি কোথায় আছেন?' দরজা লাগানোর সময় ফিসফিসিয়ে মুসাকে জিজ্ঞেস করলো সে।

'নয় নম্বর। বাইরে তালা, ভেতরে আটকে আছে। দরজার নিচ দিয়ে চাবিটা বের করে দেবে বলেছে।'

ফিরে এসে গার্ডের সামনে দাঁড়ালো হোফার। বললো, 'আমার যেতে তো কোনো বাধা নেই? আমি সেক্রিটারির কাছে যাচ্ছি।' বলে আবার উঠে পড়লো গাড়িতে। তাকে আটকালো না গার্ড। হাত নেড়ে যাওয়ার ইশারা করলো।

গাড়িটাকে নয় নম্বর স্টেজের দিকে এগিয়ে যেতে দেখলো রবিন আর মুসা।

কিশোর ঠিকই আন্দাজ করেছে, রবিন ভাবলো, অ্যালউড হোফার লোকটা রহস্যময়।

তখনও দরজার নিচ দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে কিশোর। আলো আসছিলো দরজার নিচ দিয়ে, হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল সেটা।

'মুসা?' ডেকে জিজ্ঞেস করলো সে।

'না, আমি অ্যালউড হোফার। চাবিটা দিন।'

দ্বিধা করলো কিশোর। এতোগুলো কাজ নির্বিঘ্নে সারার পর, এখন তীরে এসে তরী ডোবাতে চায় না ভুল লোকের হাতে চাবি দিয়ে। চাবিটা নিয়ে যে সরে পড়বে না হোফার, তাকে সোমবারতক এখানে আটকে রেখে যাবে না তার বিশ্বাস কি? এমনও হতে পারে হোফারই তার পিছু নিয়ে এখানে এসেছিলো, তাকে আটকে রেখে গিয়েছিলো।

ঘড়ি দেখলো আবার কিশোর। দুটো বাজতে বারো মিনিট আছে আর। দ্বিধা করার সময় এখন নয়। ঝুঁকিটা নিতেই হবে। মনে মনে আশা করলো, হোফার যেন তার শত্রু না হয়।

দরজার নিচ দিয়ে চাবিটা ঠেলে দিলো কিশোর। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

খুলে গেল দরজা।

ফোঁস করে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছেড়ে উজ্জ্বল দিবালোকে বেরিয়ে এলো কিশোর।

বললো, 'থ্যাংক ইউ, মিস্টার হোফার।'

'জলদি চলুন,' শোফার বললো। 'আপনার বন্ধুরা গেটে দাঁড়িয়ে আছে। আশা করি দুটো নাগাদ পৌছে যেতে পারবো।'

ঠিক দুটোয় পৌঁছতে পারলো না ওরা। এক মিনিট দেরি হয়ে গেল। গাড়ি থেকে নেমে টেলিভিশন নেটওয়ার্ক বিল্ডিংটার দিকে দৌড় দিলো কিশোর। ছুটে এসে লিফটে উঠলো।

যে রুমে কুইজ শো শুটিঙের ব্যবস্থা হয়েছে, সেটার দরজা খোলা রয়েছে তখনও। একজন ইউনির্ফম পরা অ্যাটেনডেন্টকে বলতেই তাড়াতাড়ি কিশোরকে একটা ঘোরানো গলি পার করে স্টেজে পৌছে দিলো।

আদালতে জুরিরা যেরকম জায়গায় বসে, অনেকটা ওরকম একটা লম্বা কাঠের স্ট্যান্ডের কাছের চেয়ারে এনে কিশোরকে বসিয়ে দেয়া হলো। টাইয়ের সঙ্গে মাইক বেঁধে দেয়া হলো। বোকা বোকা ভঙ্গি করে ভারিপদের দিকে তাকালো সে, ওর চোখ দেখে বোঝার চেষ্টা করলো চমকে গেছে কিনা।

'এসেছো,' ভারিপদ বললো। 'দেরি করে ফেললে।'

ভারিপদর মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না। একটুও অবাক মনে হলো না তাকে। দ্রুত অন্যদের মুখের ওপর চোখ বোলালো কিশোর। নেলিকেও অবাক লাগলো না। বরং কিশোর যে শেষ পর্যন্ত সময় মতো আসতে পেরেছে, তাতে যেন হাঁপ ছেড়েছে। এমনকি তাকে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ হাসিও উপহার দিলো।

শিকারী কুকুরকেও খুশি মনে হলো। খুশি মনে হলো হ্যারিস বেকারকে, যে এই শো-র উদ্যোক্তা।

শুধু যে একটিমাত্র লোক তাকে দেখে সন্তুষ্ট হতে পারলো না, চোখাচোখি হতেও চোখ সরিয়ে নিলো আরেক দিকে, তার মাথাভর্তি লম্বা সোনালি চুল নেমে এসেছে কাঁধের ওপর।

মড়ার খুলি!

আট

পাগল সংঘের প্রথম কুইজ শো শুরু হলো।

রসিকতা আর কিছু উষ্ণ হাসির মাধ্যমে দর্শকমণ্ডলীকে তাতিয়ে নিয়ে, কুইজের নিয়মকানুন বলতে শুরু করলো বেকার।

এক এক করে প্রশ্নের জবাব দেবে প্রতিযোগীরা। সঠিক জবাব দিতে পারলে পাঁচ নম্বর পাবে, প্রতি প্রশ্নের জন্যে। যদি কেউ কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে না পারে, এবং

সেটা অন্য কেউ পেরে যায়, তাহলে যে দিতে পারবে সে পাবে পাঁচ। কিন্তু যদি অন্যের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সেটা ভুল করে তাহলে নিজের নম্বর থেকে পাঁচ নম্বর কাটা যাবে।

প্রতিযোগীদের দিকে তাকিয়ে হাসলো বেকার। 'কাজেই, না জেনে অযথা নম্বর নষ্ট করো না,' হুঁশিয়ার করলো সে।

ক্যামেরার দিকে তাকালো একবার বেকার, তারপর আবার ফিরলো স্টুডিওতে উপস্থিত দর্শকদের দিকে। বলতে লাগলো, 'কিছু কিছু কুইজ শোতে নিয়ম থাকে, প্রতিযোগী তার নিজের সাবজেক্ট পছন্দ করে নিতে পারবে। এই যেমন কোনো একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর জবাব দিতে চায়ঃ ইতিহাস, খেলাধুলা, প্রাণীজগৎ কিংবা অন্য কিছু। কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় তেমন কিছু থাকবে না, শুধু একটা বিষয়ের ওপর জবাব দিতে হবে,' ঝিক করে উঠলো তার দাঁত। 'আর সেটা হলো, পাগল সংঘ।'

উত্তেজিত গুঞ্জন শোনা গেল দর্শকদের মাঝে।

বেকার বললো, 'প্রতিটি প্রোগ্রামের শুরুতে পাগল সংঘ ছবির কিছু কিছু অংশ আমরা দেখাবো। মনিটরে আপনারাও দেখতে পাবেন।' স্টেজের এক কোণে রাখা দর্শকদের দিকে মুখ করে রাখা বড় একটা সিনেমা-পর্দা দেখালো সে। 'আর প্রতিযোগীরা দেখতে পাবে মাত্র একবার, এই যে এটাতে,' আরেকটা পর্দা দেখালো সে। ওটা মুখ করে আছে 'পাগলদের' দিকে।

মনে মনে বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে কিশোর। এইই ভালো হয়েছে। অন্য কোনো বিষয় পছন্দ করতে বললে, পছন্দ করতে গিয়ে বিপদেই পড়ে যেতো সে। কারণ কোনো বিষয়টা যে সে কম জানে নিজেরই জানা নেই। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি তার। পর্দায় পাগল সংঘের ছবি দেখলে সব মনে থাকবে, সে নিশ্চিত, ভুল করবে না। একবার কেউ ভুল করলেই হয়, ভাবলো সে, সাথে সাথে সেটার জবাব দিয়ে নম্বরে এগিয়ে যাবে।

পাশে বসা প্রতিযোগীদের দিকে তাকালো সে। শুধু মড়ার খুলির মুখে হাসি।

'তাহলে এবার শুরু করা যাক,' বেকার বলছে। 'দেখি পাগলেরা কি করে।' ইলেকট্রোনিক স্কোরবোর্ডের নিচের ডেস্কের ওপাশে সীটে গিয়ে বসলো সে।

শুরু হলো ছবি। পর্দার ওপর মনযোগ দিলো কিশোর।

গল্প নেই। টুকরো টুকরো অংশ তুলে এনে জোড়া দেয়া হয়েছে। লাফ দিয়ে একখান থেকে আরেকখানে চলে যাচ্ছে।

দেখা গেল, কেক বানানোর জন্যে ময়দা মাখাচ্ছে নেলি, তাতে বারুদ ঢেলে দিলো মাড়ার খুলি আর শিকারী কুকুর। ভারিপদর সাইকেলের চাকা থেকে বাতাস ছেড়ে দিচ্ছে শজারুকাঁটা। পাগলদেরই একজন মাঝবয়েসী লোক সেজে তার গাড়ি পাহারা দেয়ার জন্যে এক ডলার দিচ্ছে পাগলদের, গাড়িটাতে ভর্তি রয়েছে চোরাই রেডিও।

মোটুরামকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে অন্য পাগলরা, বলছে একবাক্স চকলেট না পেলে ছাড়বে না। কান নাড়াতে নাড়াতে শজারুকাঁটার দিকে ছুটলো মড়ার খুলি। তাকে বাধ্য করলো ঘন হয়ে জন্মে থাকা বিছুটির মাঝখানে মাটি খুঁড়ে গুপ্তধন তুলতে। বিছুটি লেগে শজারুকাঁটার শরীর চুলকানো দেখে অন্য পাগলদের সে-কি হাসি। গাছ থেকে মোটুরামের বাঁধন খুলে তাকে নিয়ে পালালো নেলি···

দুই মিনিট পরেই শেষ হয়ে গেল ছবি। আবার জ্বলে উঠলো স্টেজ আর অডিয়েন্সের ওপরের আলো। সারাক্ষণ হেসেছে দর্শকেরা, এখন জোর হাততালি দিয়ে ধীরে ধীরে শান্ত হলো। চেয়ারে বসা বেকারের ওপর স্থির হলো ক্যামেরার চোখ।

প্রথম প্রশ্ন করা হলো নেলিকে।

চওড়া হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলো বেকার, 'মোটরবাইকের চাকার বাতাস কে ছেড়েছে?'

'কেউ না,' জবাব দিলো নেলি। 'মোটরবাইক নয়, একটা সাধারণ সাইকেলের চাকা থেকে বাতাস ছেড়েছে শজারুকাঁটা।'

'হয়েছে!' চিৎকার উঠলো দর্শকদের মাঝে।

স্কোরবোর্ডে নেলির নামের পাশে পাঁচ নম্বর লিখলো বেকার।

পরের প্রশ্ন মড়ার খুলিকে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো সাইকেলের রঙ কি ছিলো।

একমুহূর্ত দ্বিধা করে জবাব দিলো সে, 'সবুজ।'

আবার হাততালি দিলো দর্শকেরা।

এর পর শিকারী কুকুরের পালা। 'হ্যান্ডেলবারের কোন পাশে থ্রী-স্পীড গীয়ার?'

দ্বিধা ভরে জবাব দিলো শিকারী কুকুর, 'ডান পাশে।'

গুঞ্জন করে উঠলো দর্শকেরা। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কেউ কেউ।

চোখের পলকে হাত উঠে গেল কিশোরের। ভুল জবাব দিয়েছে বলে শিকারী কুকুরের দিকে চেয়ে দুঃখ প্রকাশ করলো বেকার। 'আরও দু'জনে জবাব দিতে চেয়েছো,' দু'জনের দিকে তাকিয়েই হাসলো সে। কিশোরের দিকে ফিরে মাথা নাড়লো, 'বলো?'

'থ্রী-স্পীড গীয়ার ছিলো না ওটার,' বোকা গলায় জবাব দিলো কিশোর। বোকার অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে।

'রাইট।'

হৈ হৈ করে উঠলো দর্শকেরা। কিশোরের নামের পাশে পাঁচ নম্বর যোগ হলো।

ডারিপদর পালা এলো।

সহজ প্রশ্ন। 'বটিসুন্দরীর ময়দায় কি ঢেলে দেয়া হয়েছিলো?'

'বারুদ।'

'ঠিক।'

পাঁচ নম্বর এবং হালকা হাততালি পেলো ভারিপদ।

কিশোরকে চাঁদ দেখালো বেকার। সব চেয়ে কঠিন প্রশ্নটা করলো, 'গাছ থেকে মোটুরামকে মুক্ত করতে কটা গিট খুলতে হয়েছে বটিসুন্দরীকে?'

কিশোর দেখলো, সে জবাব দেয়ার আগেই হাত উঠে গেছে নেলির। একবার ভাবলো, ভুল জবাব দিয়ে দেয় মেয়েটাকে পাঁচ নম্বর পাইয়ে। নাহ্, মড়ার খুলি তাহলে পরের বারে তার চেয়ে এগিয়ে যাবে। 'চারটে গিগি-গিট,' এমনভাবে বললো সে, যেন আন্দাজে ঠিক বলে ফেলেছে।

'রাইট,' বেকার মাথা ঝাঁকালো।

তুমুল হাততালি দিলো দর্শকরা। প্রথম রাউন্ড শেষ হলো। সবাই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, তবু ধীরে ধীরে পড়লো বেকার কে কতো নম্বর পেয়েছে। আসলে ক্যামেরায় বেশিক্ষণ চেহারা দেখাতে ভালো লাগছে তার।

দর্শকদের মাথার ওপর দিয়ে পেছনের কন্ট্রোলরুমের দিকে তাকালো কিশোর, যেখানে রয়েছেন রাফায়েল সাইনাস। মনিটরের পর্দার ওপর চোখ। খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাঁকে।

দর্শকদের পঞ্চম সারিতে বসেছে রবিন আর মুসা। পাশে অ্যালউড হোফার। তার কোলের ওপর রাখা একটা ক্লিপবোর্ড, হাতে কলম, কিছু টুকে নিচ্ছে ক্লিপবোর্ডে আটকানো কাগজে।

কিশোরের দিকে হাত নেড়ে তাকে উৎসাহ দিলো মুসা।

রবিনকে বার বার আড়চোখে ক্লিপবোর্ডের দিকে তাকাতে দেখে হেসে কাগজটা তার দিকে তুলে ধরলো হোফার। সে লিখেছেঃ

সাধারণ বাইসাইকেল

সবুজ

থ্রী-স্পীড গীয়ার নয়

বারুদ

চার

'প্রতিযোগীরা জবাব দেয়ার আগেই আমি আন্দাজ করার চেষ্টা করেছি কি হবে,' লেখার কারণ ব্যাখ্যা করলো হোফার। 'ভালোই পেরেছি দেখা যাচ্ছে। সবই ঠিক।' প্রতিটি লেখার পাশে দেয়া টিক চিহ্নগুলো দেখালো সে।

দ্বিতীয় দফা প্রশ্ন শুরু হলো। নেলি আর মড়ার খুলির জবাব ঠিক হলো। আবারও ভুল করলো শিকারী কুকুর। কিশোরের আগে হাত তুলে ফেললো মড়ার খুলি, ফলে

পাঁচটা নম্বর বাড়তি পেয়ে গেল ঠিক জবাব দিয়ে। ভারিপদও ভুল করলো, তবে এবারে আগে হাত তুলে ফেললো কিশোর। সে পেলো বাড়তি পাঁচ নম্বর।

প্রতি রাউন্ড প্রতিযোগিতার পরই সময় নিয়ে নম্বর পড়ছে বেকার। পড়ার সময়ও সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকছে ক্যামেরার দিকে, হাসছে, রসিকতা করছে দর্শকদের সঙ্গে—তখনও ক্যামেরার দিকে চোখ।

পঞ্চম এবং শেষ রাউন্ডের শুরুতেও মড়ার খুলির চেয়ে পাঁচ নম্বর এগিয়ে রইলো কিশোর। নেলির চেয়ে দশ বেশি। শিকারী কুকুর আর ভারিপদ প্রায় বাতিল হয়ে গেছে।

প্রশ্ন শুরু হলো। নেলিকে জিজ্ঞেস করলো বেকার, 'আগন্তুকের গাড়ির সন্দেহজনক ব্যাপারটা কি?'

'গাড়ি বোঝাই চোরাই রেডিও।'

'ঠিক। বটিসুন্দরী আরও পাঁচ নম্বর পেলো।'

দর্শকদের হাততালি।

মড়ার খুলিও পাঁচ নম্বর পেলো।

শিকারী কুকুরকে একটা সহজ প্রশ্ন করা হলো এবারে। 'গাড়ির ওপর চোখ রাখার জন্যে কয় ডলার দেয়া হয়েছিলো?'

'এক ডলার।'

'ঠিক আছে।'

মৃদু হাততালি।

এবারে এমনকি ভারিপদও সঠিক জবাব দিয়ে ফেললো। আগন্তুক সেজে আসা লোকটার নাম পাগল সংঘে কি ছিলো, জিজ্ঞেস করা হয়েছে তাকে। বলে দিলো, 'জনাব গণ্ডগোল।'

এরপর কিশোরের পালা। প্রথম কুইজ শো'র শেষ প্রশ্ন। 'জনাব গণ্ডগোল সেজেছিলো যে তার নাম কি?'

প্রশ্নটা করা উচিত হয়নি বেকারের। কারণ মনিটরে দেখানো ছবির সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই, ছবিতে কোথাও বলা হয়নি অভিনেতার নাম। বহু বছর আগে অভিনয় করেছে কিশোর, তখন বয়েসও ছিলো তার খুবই কম, অভিনেতার নাম যদি মনে করতে না পারে তাকে দোষ দেয়া যাবে না, অথচ বেকারের এই ভুলের জন্যে পাঁচটা নম্বর হারাতে হবে তাকে।

জোরে জোরে হাত নাড়ছে নেলি আর মড়ার খুলি।

মাথা চুলকে মনে করার ভান করলো কিশোর। না জানার অভিনয় করে মড়ার খুলিকে বোকা বানাতে চাইছে। একটা মিউজিয়মে ডাকাতির তদন্ত করেছে তিন গোয়েন্দা, তখন পরিচয় হয়ে যায় ওই বয়স্ক অভিনেতার সঙ্গে, যে জনাব গণ্ডগোল

সেজেছিলো পাগল সংঘে। নামটা পরিষ্কার মনে আছে কিশোরের। বলবে কি বলবে না ভাবতে ভাবতে বোকার হাসি হেসে বলেই ফেললো, 'ড্রিড-ড্রিড-ড্রিড-গার হ্যানসন।'

'রাইট।'

উন্মাদ হয়ে গেল যেন দর্শকেরা। তুমুল হাততালি আর হৈ-হট্টগোল।

শো শেষ। মড়ার খুলির চেয়ে পাঁচ নম্বর এগিয়ে রয়েছে কিশোর। সারি দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগলো দর্শকেরা। পরদিন দুপুরে ঠিক দুটোয় আবার এখানে হাজির হওয়ার অনুরোধ জানালো প্রতিযোগীদেরকে বেকার।

নেলির মুখ কালো। বেরিয়ে গেল সে। সেদিকে তাকিয়ে দুঃখই হলো কিশোরের, মেয়েটার জন্যে কিছু করার ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু কি করবে? সে হয়েছে তৃতীয়, দ্বিতীয় হলেও নাহয় কিছু করা যেতো। ইচ্ছে করে ভুল করে মড়ার খুলিকে জিতিয়ে দেয়ার কোনো ইচ্ছেই তার নেই। মড়ার খুলিকে হারাতে এখন তাকেই জিততে হবে।

প্রায় শূন্য হয়ে গেল অডিটোরিয়াম। দর্শকরা বেরিয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে থাকা দুই সহকারীর দিকে এগোলো কিশোর। স্টেজ পেরোনোর আগেই যেন স্প্রিঙের মতো ঝটকা দিয়ে ছুটে এলো একটা হাত। খামছে ধরলো কিশোরের বাহু। কঠিন কণ্ঠে বললো, 'হুঁশিয়ার থেকো, মোটুরাম! তোমাকে আমি ভালো করেই চিনি। তোমার গোয়েন্দাবাহিনীর খবরও রাখি। বোকার ভান করে আমাকে ফাঁকি দিয়ে বিশ হাজার ডলার ছিনিয়ে নিতে আমি দেবো না তোমাকে কিছুতেই।'

ফিরে তাকালো কিশোর। তার বাহুতে আরও শক্ত হলো মড়ার খুলির আঙুল। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'এখনও সময় আছে, কেটে পড়ো। আমার পথে কাঁটা হয়ো না, নইলে…,' কথাটা শেষ না করেই হঠাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে গটমট করে হাঁটতে শুরু করলো সে।

ঘোরানো বারান্দায় কিশোরের জন্যে অপেক্ষা করছে মুসা আর রবিন। হোফার চলে গেছে গাড়ির কাছে।

'মড়াটা কি বললো?' জানতে চাইলো মুসা।

জবাব দিলো না গোয়েন্দাপ্রধান। রবিনকে বললো, 'রবিন, তুমি তো হোফারের পাশে বসেছিলে।'

'হ্যাঁ। তাতে কি?'

'ক্লিপবোর্ডে কি লিখছিলো?'

'তেমন কিছু না। আগেই আন্দাজ করার চেষ্টা করেছে প্রশ্নের জবাব।'

'জবাবগুলো দেখেছো?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর। তার কণ্ঠস্বরেই বুঝে ফেললো রবিন, কোনো একটা সূত্র পেয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধান।

'নিশ্চয়ই। সে নিজেই দেখিয়েছে। একটা বাদে সবগুলোর জবাব ঠিক হয়েছে।'

'কোন্‌টা?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকে পড়লো কিশোর। 'ডিগার হ্যানসনের নাম? ওটা ভুল করেছে তো?'

'না,' মাথা নাড়লো রবিন। 'জনাব গণ্ডগোলের গাড়িটা কেমন, সেটা ভুল করেছে। আর ডিগার হ্যানসনের নাম তো তুমি বলার অনেক আগেই লিখে রেখেছিলো।

রবিনের মুখের দিকে দীর্ঘ একমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকালো কিশোর। রবিন আর মুসা তাকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করলো, কিছু বুঝতে পেরেছে কিনা, কিন্তু সুযোগই দিলো না সে। হোফারের লেখার ব্যাপারে কেন আগ্রহী হয়েছে, সে-ব্যাপারে কিছুই বললো না ওদেরকে।

লিফ্‌ট থেকে নেমে লবি পেরিয়ে বাইরে বোরোনোর পর আবার কথা বললো কিশোর। 'জবাবগুলো ঠিকমতো লিখতে পেরেছে তার কারণ, ছবিগুলো সে দেখেছিলো। বুদ্ধিমান লোক সে। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না…,' চুপ হয়ে গেল সে।

'কী?' একইসাথে প্রশ্ন করলো দুই সহকারী।

'বলো কিশোর,' রবিন শুরু করলো, শেষ করলো মুসা, 'রহস্যটা কি?'

'রহস্যটা হলো,' অনেক দূর থেকে যেন ভেসে এলো কিশোরের কণ্ঠ, 'পাগল সংঘের ব্যাপারে একজন সাধারণ শোফারের আগ্রহী হওয়ার কারণ কি?'

নয়

'যাদেরকে সন্দেহ করি,' কিশোর বললো। 'এক নম্বর,' একটা আঙুল তুললো সে, 'ভারিপদ।'

হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা। টেলিভিশন স্টেশন থেকে ফিরে সোজা এসে ঢুকেছে এখানে।

'ভারিপদ,' আবার বললো কিশোর, 'তার সম্পর্কে কি কি জানি আমরা?'

জবাব পেলো না সে। আশাও করেনি পাবে। আসলে মনে মনে না ভেবে জোরে জোরে ভাবছে। 'ধরে নিতে পারি কাপগুলো সে চুরি করেছিলো। চুরি অবশ্য অন্যেরাও করে থাকতে পারে। টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা। কিচেন সেটের কাছে অনেক লোক ছিলো, ওয়েইটার, ইলেকট্রিশিয়ান, ক্যামেরাম্যান। যে কেউই রান্নাঘরের পেছন দিয়ে ঘুরে গিয়ে কাপগুলো সরিয়ে থাকতে পারে। দুই-তিন মিনিটের জন্যে আমাদের কেউ ওখান থেকে সরে থাকলেও কারো নজরে পড়ার কথা ছিলো না।'

'মড়ার খুলি,' সামনে ঝুঁকলো রকিং চেয়ারে বসা মুসা। 'ওই ব্যাটাকেই আমার সন্দেহ।'

হাত তুললো কিশোর, বুঝিয়ে দিলো, রাখো, আগে আমার কথা শেষ করি। 'ভারিপদকে নিয়ে আলোচনা শেষ করি, তারপর অন্যদের কথা। রাফায়েল সাইনাসের সন্দেহ ভারিপদকে। রাতের বেলা ওকে নয় নম্বর স্টেজের কাছে ঘুরঘুর করতে দেখেছেন তিনি। তাঁর ধারণা, চোরাই কাপগুলো বের করে নিতে এসেছিল ভারিপদ। তাঁর দেখে সরে পড়েছে। তাঁর অনুমান ছিলো, আবার গিয়ে ওখানে হানা দেবে সে। হয়তো ঠিকই আন্দাজ করেছেন। আজ সকালে, এগারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে মোটর সাইকেলে করে স্টুডিওর দিকে রওনা হয়েছিলো সে। আমি তার পিছু নিয়ে তার আগেই ওখানে পৌঁছুলাম। আমাকে স্টেজের ভেতরে ঢুকতে দেখে বোধহয় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলো ভারিপদ, বাইরে থেকে তালা আটকে দিয়েছিলো...'

'পরিষ্কার হচ্ছে,' মাথা দোলালো রবিন।

'হয়তো।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। ছেঁড়া সূত্রের অনেকগুলো মাথা জোড়া দেয়া বাকি এখনও। কারণ, তার মনে হচ্ছে, যে-ই তাকে স্টেজের ভেতরে আটকেছে, মোটেই আতঙ্কিত হয়ে নয়, অন্য কোনো জোরালো কারণ ছিলো। তাকে কুইজ শো থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে হতে পারে। আর কুইজ শোতে জেতার ব্যাপারে ভারিপদর কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। জিততে পারবে একথা নিশ্চয় ভাবেওনি সে।

কাকতালীয় ঘটনা ঘটেছে, এটাও বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর। মোটর সাইকেলে চড়ে ভারিপদর স্টুডিওতে যাবার ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে না।

'দুই নম্বর সন্দেহ,' দুটো আঙুল তুললো কিশোর।

'মড়ার খুলি,' বলে দিলো মুসা।

'হ্যাঁ, মড়ার খুলি। ওই ব্যাটা যথেষ্ট সেয়ানা। লোভী। টাকার জন্যেই এই কুইজ শোর ধারণাটা হ্যারিস বেকারের মাথায় ঢুকিয়েছে কিনা কে জানে? শুধু আলোচনার জন্যেই একশো ডলারের জন্যে কি-রকম চাপাচাপি করছিলো! বাজি জেতার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠছে। আমার অভিনয় বুঝে ফেলেছে সে, আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছে।'

'কি করে জানলে?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'শো-এর শেষে আমাকে ধরেছিলো ব্যাটা,' অন্যমনস্ক হয়ে গেল কিশোর। 'কোথায় যেন ছিলাম? ও, হ্যাঁ। সুতরাং মড়ার খুলি যদি আমাকে দেখেই থাকে নয় নম্বর স্টেজের দিকে যেতে, তাহলে কেন একজন বিপজ্জনক প্রতিযোগীকে সরিয়ে রাখার সুযোগটা গ্রহণ করবে না? এবং শেষ মুহূর্তে যখন শো-এর স্টেজে হাজির হয়ে গেলাম, আমাকে দেখে তার চমকে যাওয়াটাও স্বাভাবিক।' তাকে দেখে যে অস্বস্তি বোধ করছিলো মড়ার খুলি, সেকথা ভাবলো কিশোর। 'কিন্তু তখন মুভি স্টুডিওতে কি

করছিলো সে ভারিপদর সঙ্গে একই সময়ে?'

'কোনোভাবে চলে গিয়েছিলো আরকি,' রবিন বললো, 'তাই না?'

'না,' জোরে মাথা নাড়লো কিশোর। 'কাকতালীয় ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয় না আমার।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ভাবলো সে। তারপর তিনটে আঙুল তুললো, 'সন্দেহ নম্বর তিন, অ্যালউড হোফার।'

'উঁহুঁ,' এবার মাথা নাড়লো রবিন, 'আমার তা মনে হয় না। ওই লোকটার চোরের মতো স্বভাব নয়।'

'হয়তো।' মনে মনে রবিনের সঙ্গে একমত হলেও মুখে বললো, 'তবে দেখে চোরের মতো না লাগলেও চোর হবে না এমন কোনো কথা নেই। আলোচনা শুরুর আগে তাকে দেখেছি আমি। কাপ আর অব্যবহৃত আর্ক লাইটগুলো যেদিকে ছিলো সেদিকে গিয়েছিলো সে। পাগল সংঘের ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে সে। কুইজ শো দেখার জন্যে টিকেট চেয়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে। হাতে ক্লিপবোর্ড নিয়ে এসে বসেছে শো দেখতে, প্রশ্নের জবাব লিখেছে প্রতিযোগীরা জবাব দেয়ার আগেই। মনে থাকার কথা নয় এরকম একজন অভিনেতার নাম মনে রেখেছে। পাগল সংঘের ব্যাপারে এতো আগ্রহ, অথচ এটা আবার বুঝতে দিতে চায় না কাউকে। নয় নম্বর স্টেজ যে চেনে, সেটা জানতে দিতে চায়নি…,' থেমে গেল কিশোর। তাকালো দুই সহকারীর দিকে। 'আমার বিশ্বাস অনেক কিছুই জানে সে, যা হয়তো আমরা জানি না।'

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে লাফিয়ে উঠলো মুসা, 'ওরেব্বাবা, চারটে বেজে গেছে!'

টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি ফুটলো কিশোরের চোখে। এখন পাগল সংঘ সিরিজের আরেকটা ছবি দেখানোর কথা। মোটুরামের দিকে তাকিয়ে আবার কষ্ট পাওয়ার পালা কিছুক্ষণ। তবে আগামী দিনের কুইজ শো'র ব্যাপারে কিছু সাহায্যও করতে পারে ছবিটা। প্রতিযোগী হিসেবে ছবির প্রতিটি দৃশ্য খুঁটিয়ে দেখা এখন তার হোমওয়ার্ক বলা চলে।

'ও-কে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো কিশোর,' 'রবিন, টিভিটা ছেড়ে দাও।'

বিজ্ঞাপন দেখা গেল পর্দায়। সেটা শেষ হতেই মোটুরাম উদয় হলো, অনুরোধ করলো সে, 'নিয়ে তলো, প্রীত, নিয়ে তলো আমাকে!'

অন্য পাগলরা সবাই মাথা নাড়লো। আইসক্রীম কিনতে শহরে যাচ্ছে ওরা। একটা বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ওদের নেই।

'কিন্তু ওকে এখানে একা ফেলে যাই কি করে,' নেলি বললো। 'বেচারা!'

'বেশ, তাহলে থাকো তুমি ওর সাথে,' মড়ার খুলি বললো।

কিন্তু নেলি থাকতে চায় না। অবশেষে ঠিক হলো ওদের জন্যে অনেক আইসক্রীম নিয়ে আসা হবে।

'আথা,' মোটুরাম বললো, 'এনো তাহলে। অনেক, অনেক বেতি আইতক্রীম।'

মড়ার খুলি আর শজারুকাঁটা রওনা হলো। পথে শজারুকে ফাঁকি দিয়ে আরেক দিকে চলে গেল মড়ার খুলি। কি আর করে বেচারা শজারু, মনের দুঃখে ফিরে এলো আবার।

এই ছবিটাতেই রয়েছে জনাব গণ্ডগোল আর তার গাড়িভর্তি চোরাই রেডিও। গাড়ি পাহারা দিতে রেখে গিয়েছিলো কয়েক পাগলকে। আর বিনিময়ে দিয়েছিলো একটা ডলার। সেই টাকা দিয়েই আইসক্রীম কিনে খাওয়ার কথা। পুরনো পিয়ার্স-অ্যারো কনভার্টিবল গাড়িটা ঘিরে দুষ্টুমি করছে পাহারাদাররা, একে অন্যের পিছে লাগছে, আর জনাব গণ্ডগোল গেছে ফোন করতে, এই সময় এলো পুলিশ। পাহারাদার পাগলদেরকেও থানায় ধরে নিয়ে গেল।

যাই হোক, ফিরে এসে রান্নাঘরে নিজেই আসক্রীম বানাতে বসলো শজারুকাঁটা। তাকে সাহায্য করলো মোটুরাম। তাকে চিনি আনতে বললে আনে নুন, ময়দার কথা বললে আনে সুজি। ভালোই জমিয়েছে।

ওদিকে পুলিশের কাছ থেকে আবার গাড়িটা চুরি করে নিয়ে পালালো জনাব গণ্ডগোল। তাড়া করলো পুলিশ। ওদের গাড়িতে বসে আনন্দে চেঁচাতে লাগলো পাগলেরা।

উঠে গিয়ে টিভি বন্ধ করে দিলো কিশোর।

'এহ্‌হে, এটা কি করলে?' প্রতিবাদ জানালো মুসা। 'জনাব গণ্ডগোলকে ধরতে পারলো কিনা সেটাই দেখতে দিলে না!'

'ধরতে পারবে না,' কিশোর বললো। 'একই অভিনেতাকে আরেকবার ব্যবহার করতে চেয়েছে পরিচালক। আরেকটা সিরিজে শজারুকাঁটাকে ভাড়া করে জনাব গণ্ডগোল, একটা কুকুর চুরি করার জন্যে। কাজেই কায়দা করে তাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতেই হয়েছে পরিচালককে।'

রিসিভার তুলে একটা নম্বরে ডায়াল করলো সে। 'হ্যালো, মিস্টার হোফার?...কিশোর পাশা বলছি। একবার আসতে পারবেন ইয়ার্ডে?...হ্যাঁ হ্যাঁ, যতো জলদি পারেন।'

'আবার কোথায় যাচ্ছি?' কিশোর রিসিভার রাখলে জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'কোথাও না,' আনমনে বললো কিশোর। 'কাপগুলো কে চুরি করেছে এটা জানতে হলে একজন বন্ধু দরকার আমাদের, যাকে কেউ সন্দেহ করবে না।'

আর কোনো প্রশ্নের জবাব দিলো না সে। হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এলো

ওরা।

গেটের কাছে এসে থামলো লিমুজিন। নিলামে পুরনো মাল কিনতে গেছেন মেরিচাচী আর রাশেদ চাচা। হোফারকে ঘরে ডেকে নিয়ে এলো কিশোর।

খোলামেলা সুন্দর রান্নাঘরটায় বসলো ওরা। চুলায় কফির পানি চাপালো কিশোর। হোফারের জন্যে। তিন গোয়েন্দার জন্যে বের করলো সোডার বোতল।

কুইজ শো দিয়ে আলোচনা শুরু করলো কিশোর। 'গাড়িটা কার তৈরি সেটা আমাকে বলেনি ওরা, বেঁচেছি। আমি জানি না এর জবাব।'

'জানেন না?' অবাকই মনে হলো যেন হোফারকে। 'সব প্রশ্নের উত্তরই তো দেখলাম জানা আপনার।'

'হ্যাঁ,' কিশোর বললো। 'তবে গাড়ির দৃশ্যটায় আমি ছিলাম না। মড়ার খুলি, শিকারী কুকুর আর অন্যেরা ছিলো। আমার মনে হয় গাড়িটা কার তৈরি সেটা মিস্টার সাইনাসকে জিজ্ঞেস করেছিলো মড়ার খুলি, সে-জন্যেই বলতে পেরেছে ওটা পিয়ার্সঅ্যারো। কিন্তু ওই গাড়িটা তখন আমি দেখিইনি।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' শোফার বললো। 'আপনি ডাকার আগে এই ছবিটাই দেখছিলাম।' হাসলো সে। 'আপনি আর শজারুকাঁটা ঘরে বসে আসক্রীম বানাচ্ছিলেন।'

পানি ফুটেছে। কাপে ঢেলে তাতে কফি আর চিনি মিশিয়ে হোফারের দিকে ঠেলে দিলো কিশোর। জিজ্ঞেস করলো, 'পুরনো এই সিরিজটা বুঝি খুব পছন্দ আপনার?'

শ্রাগ করলো হোফার। 'ঠিক পছন্দ করি বলা যাবে না। বেশি ভাঁড়ামি। তবে মাঝে মাঝে বেশ হাসায়।'

'ঠিকই বলেছেন, ভাঁড়ামি বেশি। তবে পরিচালকেরও উদ্দেশ্য ছিলো সেটাই, তাই না? আমাদেরকে বেশি বেশি পাগলামি করতে বলেছেন, ছবির নামের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যে। মড়ার খুলিকে দিয়ে কান নাড়িয়েছেন। কুকুরের মতো জিভ বের করে রাখতে বলেছেন শিকারী কুকুরকে। আমাকে বলেছেন জিভে জড়িয়ে কথা বলতে। ভারিপদর পায়ের পাতা এমনিতেই বড়, তার ওপর বড়দের জুতো পরিয়েছেন। শজারুকাঁটার চুল খাড়াই, স্পেশাল কিছু করতে হয়নি তার জন্যে। তবে তাকে সুর করে কথা বলতে বলা হয়েছে, ন্যাকামি বোঝানোর জন্যে।'

এক মুহূর্ত থামলো কিশোর। তারপর শজারুকাঁটার স্বর অবিকল নকল করে একটা সংলাপ বললো।

হেসে উঠলো হোফার। 'দারুণ করতে পারেন তো!'

টেবিলে কনুই রেখে সামনে ঝুঁকলো কিশোর। 'এখন এসব শুনলে রাগ লাগে, এত্তো ন্যাকামি। তাই না? অন্তত আমার লাগে।'

'তা কিছু কিছু যে লাগে না তা নয়,' কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখলো হোফার। 'চলুন, যাওয়া যাক। কোথায় যাবেন?'

'আপাতত কোথাও নয়।' হাত বাড়িয়ে দিলো কিশোর। 'নিন, হাত মেলান।'

হাঁ করে তাকিয়ে রইলো মুসা আর রবিন। কি বলছে কিশোর? কি করতে চাইছে?

হাতটা বাড়িয়েই রাখলো কিশোর, যতোক্ষণ না হোফার তার সঙ্গে হাত মেলালো। তারপর হাসি হাসি গলায় বললো গোয়েন্দাপ্রধান, 'তোমার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় খুব খুশি হলাম, শজারু। তুমি করে বললাম, আশা করি কিছু মনে করোনি। আগেও তো তুমি করেই বলতাম।'

দশ

'চিনেই ফেললে তাহলে,' হোফার বললো। 'অন্য পাগলদের চেয়ে আমাকে লাকিই বলতে পারো, অন্তত মড়ার খুলির চেয়ে তো বটেই। আমার আসল নাম সিনেমায় কক্ষণো ব্যবহার করিনি। তাছাড়া কথা বলতাম সুর করে। অভিনয় ছেড়ে দেয়ার পর চুল লম্বা করে ফেললাম, ফলে কাঁটার মতো আর দাঁড়িয়ে থাকলো না, অনেক নুয়ে পড়লো। আমার আসল গলা শুনে শজারুর গলা বলে বুঝতে পারলো না কেউ। চিনতে পারলো না। কাজেই ইস্কুলে কোনো অসুবিধে হয়নি আমার।'

তাকে আরেক কাপ কফি ঢেলে দিলো কিশোর। রবিন আর মুসা অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো, হোফারের গল্প শোনার জন্যে।

'অভিনয় করে যা আয় করেছিলাম, সব জমিয়ে রেখেছিলো আমার বাবা,' হোফার বললো আবার। 'পড়ার খরচের অভাব হলো না। মাথাটাও মোটামুটি ভালো। ষোলো বছর বয়েসে ইস্কুল শেষ করে ভর্তি হলাম টীচার্স কলেজে। পাস করে এখন মাস্টারি করছি।'

টেবিলের ওপর দিয়ে ওপাশে বসা কিশোরের দিকে তাকালো সে। 'কাজটা আমার ভালো লাগে। ছাত্র সামলানো খুব কঠিন, তবে ওরা আমাকে বেশি বিরক্ত করে না। মানিয়ে ফেলেছি। ফলে অসুবিধে হচ্ছে না।'

তিক্ত হাসি হাসলো সে। 'যখন আবার পাগল সংঘ দেখাতে শুরু হলো, ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। যদি আমার ছাত্ররা জেনে যায় আমি শজারুকাঁটা, আমার জীবন অতিষ্ঠ করে দেবে তাহলে। খালি ভেঙাবে। মুখ ভেঙচে বলবেঃ হায়রে কপাল, ঘরের এতো কাজ একা আমি কি করে সারবো!' শজারুকাঁটার মতো সুর করে সংলাপ বললো সে। কিছুক্ষণ আগে এটাই বলেছিলো কিশোর। 'ওরা জেনে গেলে ওই ইস্কুলে আর ঢুকতে

পারবো না জীবনে।'

হোফারের মনের কষ্ট বুঝতে পারছে কিশোর। গরমের ছুটির আগের তিনটে হপ্তা তার ওপর দিয়ে যা গেছে, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে যন্ত্রণা কাকে বলে।

'ভয় পেয়েছি বটে,' হোফার বলতে লাগলো, 'পুরনো দিনের কথা ভেবে আনন্দও পেয়েছি। অবাক হয়ে ভেবেছি অন্য পাগলদের কি হলো? ওরা কি করছে? দুই বছর ধরেই ইস্কুল ছুটির সময় ইজি-রাইড কোম্পানিতে পার্ট টাইম চাকরি করি, ছুটির সময় কিছু বাড়তি আয় হয়। অনেক রকমের লোক গাড়ি ভাড়া নেয়া। এদের মধ্যে স্টুডিওর লোকও আছে। কাজেই মাঝে স্টুডিওতেও নিয়ে যেতে হয় ওদেরকে। যখন শুনলাম পাগলদের আবার একখানে করা হচ্ছে, দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। আরেকজন ড্রাইভারের সঙ্গে ডিউটি বদল করে নিলাম, যাতে স্টুডিওতে ঢুকে পাগলদের দেখতে পারি।'

'স্টুডিওতে যখন যাও,' কিশোর বললো, 'জায়গা তো তোমার চেনা। তাহলে নয় নম্বর স্টেজের কথা জিজ্ঞেস করছিলে কেন সেদিন?'

'অনেক বড় জায়গা,' হোফার বললো। 'মস্ত এলাকা। সব জায়গা সবাই চেনে না। তাছাড়া সেই ছেলেবেলায় গিয়েছি নয় নম্বরে, তা-ও একা নয়, বাবা গাড়িতে করে পৌঁছে দিতো আমাকে। তারপর আর যাইনি। ভুলে গেছিলাম স্টেজটা কোনদিকে।'

কফিতে চিনি মিশিয়ে আবার কিশোরের দিকে তাকালো হোফার। 'ভাবতে পারিনি আমাকে কেউ চিনে ফেলবে। অভিনয় ছাড়ার পর স্টুডিওর কেউ আর খোঁজ করেনি আমার, আমিও নিখোঁজ হয়ে থাকার চেষ্টা করেছি। ফলে বেকার আমাকে খুঁজে বের করতে পারেনি। জানেই না আমি কোথায় আছি, কেমন আছি।'

চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে বললো সে, 'তবে তুমি যে এতোটা চালাক হয়ে গেছ, ভাবতে পারিনি।'

'চালাক না,' সৌজন্য দেখিয়ে বললো কিশোর, 'আসলে লাকিলি চিনে ফেলেছি তোমাকে।' যদিও মনে মনে খুব ভালো করেই জানে সে, বুদ্ধির জোরেই শজারুকাঁটাকে চিনতে পেরেছে। রবিনের দেয়া সূত্র থেকেই বুঝে ফেলেছে, হোফার আর কেউ নয়, শজারুকাঁটা। সে জানে না ওটা কি গাড়ি ছিলো। কিশোরও জানে না। ওরা দু'জনই একমাত্র তখন অন্য জায়গায় ছিলো, যখন গাড়িটাকে নিয়ে যায় পুলিশ। হোফার জনাব গণ্ডগোলের আসল নাম জানে, তার কারণ হ্যানসনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে কুকুর চুরি করার অভিনয়ের সময়। একসাথে কাজ করেছে কয়েক দিন। সব সূত্র খাপে খাপে জোড়া লাগিয়েই নিশ্চিত হয়েছে কিশোর, অ্যালউড হোফার শজারুকাঁটা ছাড়া আর কেউ নয়।

'আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবে?' অনুরোধ করলো কিশোর।

'বলো।'

'সেদিন রান্নাঘরে যখন আলোচনার শুটিং হচ্ছিলো, তোমাকে পেছনের আর্কলাইটগুলো কানে যেতে দেখেছি। কেন গিয়েছিলে?'

'ও, সেটাও দেখে ফেলেছো,' হাসলো হোফার। 'সিনেমার টেকনিক্যাল ব্যাপার-গুলো নিয়ে সব সময়ই একটা কৌতূহল আছে আমার। এমনকি যখন শজারুকাঁটার অভিনয় করতাম, তখনও ছিলো। ফলে লাইট আর যন্ত্রপাতিগুলো দেখে আর লোভ সামলাতে পারিনি।'

'হুঁ, বুঝলাম,' হাসছে কিশোর। 'একবার তো আমি সন্দেহই করে বসেছিলাম, তুমিই কাপগুলো চুরি করে রিফ্লেকটরের বাক্সে লুকিয়েছো।'

'না, আমি লুকাইনি,' হোফার বললো। 'তা এখন কি করবে আমার পরিচয় সবাইকে বলে দেবে?'

'মোটেই না,' দুই সহকারীর দিকে তাকালো কিশোর। 'এরাও কিছু বলবে না। কি বলো, মুসা?'

'মাথা খারাপ!'

'আমিও বলবো না,' রবিন বললো। 'আপনার পরিচয়...'

'কিশোর যখন তুমি করে বলছে,' বাধা দিয়ে বললো হোফার, 'তোমরাও তুমি-করেই বলতে পারো। আপনি আপনি করে বন্ধুত্ব হয় না।'

'থ্যাংক ইউ। তোমার পরিচয় কেউ জানবে না, অন্তত আমাদের মুখ থেকে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো হোফার। 'যাক, বাঁচালে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কিশোর বললো, 'তো, হোফার, আমাদের কিছু সাহায্যের প্রয়োজন যে?'

'নিশ্চয়ই করবো। কি করতে হবে?'

চোরাই কাপগুলোর কথা খুলে বললো কিশোর। রাফায়েল সাইনাস যে তিন গোয়েন্দাকে তদন্তের ভার দিয়েছেন সেকথাও জানালো। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দেখিয়ে বললো, 'এই দেখো, আমরা সত্যিই গোয়েন্দা। কাপগুলো খুঁজে পেয়েছি বটে, কিন্তু সব রহস্যের মীমাংসা এখনও করতে পারিনি। না করে ছাড়বোও না।'

মাথা ঝাঁকালো হোফার। 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমি কিভাবে সাহায্য করবো?'

'আমাদের এখন দু'জনকে বেশি সন্দেহ,' জানালো কিশোর। 'মড়ার খুলি আর ভারিপদ। ধরা যাক, ওরা দু'জনে মিলে ওই কাপ সরিয়েছে। একসাথে কাজ করছে। তাহলে অনেক প্রশ্নেরই জবাব মিলে যায়। আমি এখনও জানি না, তবে গল্পটা এভাবে হতে পারেঃ আজ দুপুরের মুভি স্টুডিওতে দু'জনের দেখা করার কথা। চোরাই

কাপগুলো বাক্স থেকে বের করে আনার জন্যে। সাউণ্ড স্টেজের বাইরে ভারিপদর জন্যে অপেক্ষা করছিলো মড়ার খুলি। এই সময় আমাকে ঢুকতে দেখলো সে। সঙ্গে সঙ্গে একটা মতলব করে ফেললো। কাপগুলোর চেয়ে বাজিতে বিশ হাজার ডলার জেতা তার জন্যে বেশি জরুরী। আমাকে সরিয়ে রাখতে পারলে একজন প্রতিযোগী কমে গেল। সুতরাং আমাকে আটকে ফেললো স্টেজের ভেতর। তারপর যখন ভারিপদ এলো, তাকে আমার কথা কিছুই বললো না সে, শুধু বললো দরজায় তালা দেয়া। খোলা যাবে না। অন্য সময় এসে কাপগুলো নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তারপর দু'জনে ফিরে গেল টেলিভিশন স্টেশনে, কুইজ শোতে যোগ দিতে।'

'এজন্যেই তোমাকে সময়মতো হাজির হতে দেখেও অবাক হয়নি ভারিপদ,' মুসা বললো।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো রবিন। 'হবে কি? সে তো কিছু জানেই না। মড়ার খুলি জানে বলেই অবাক হয়েছে।'

'ঠিক,' বলে হোফারের দিকে তাকালো কিশোর। 'এখানেই তোমার সাহায্য আমাদের দরকার।'

'গোয়েন্দা কাহিনী পড়তে ভালো লাগে আমার, মনে হয় গোয়েন্দাগিরি করতেও ভালোই লাগবে,' হোফার বললো। 'কিন্তু এখনও বলোনি আমাকে কি করতে হবে।'

'ওদেরকে অনুসরণ করতে চাই,' অবশেষে বললো কিশোর। 'দেখবো, দেখা করে কিনা। আজ আবার সাউণ্ড স্টেজে যায় কিনা।'

'বেশ,' উঠে দাঁড়ালো হোফার। 'কোনখান থেকে শুরু করবো?'

'এটাই হলো আসল কথা,' বসে থেকেই হোফারের দিকে তাকালো কিশোর। 'তোমার সাহায্যটা ওখান থেকেই শুরু। মড়ার খুলি আর ভারিপদ কোথায় থাকে জানি না আমরা। ওদের ঠিকানা না পেলে কোনখান থেকে যে শুরু করবো, তা-ও বলতে পারবো না।'

'আমিও তো জানি না,' মাথা নাড়লো হোফার। দু'জনের কেউই আমাদের কোম্পানিতে কখনও গাড়ি ভাড়া নিতে আসেনি, কারণ ওদের নিজেদের বাহন আছে। মড়ার খুলির আছে একটা ব্রিটিশ ছাতখোলা স্পোর্টস কার। ভারিপদর আছে মোটর সাইকেল।'

'স্টুডিওর গেটের গার্ড জানতে পারে।' মনে করিয়ে দিলো কিশোর, 'আমার ঠিকানা তো জানে। প্রথম দিন ঢোকার আগে একটা লিস্ট ছিলো ওর হাতে। নিশ্চয় মড়ার খুলি আর ভারিপদরও আছে। তবে মনে হয় জিজ্ঞেস করলেই দিয়ে দেবে।'

'দেবে কি? আমাকে আর মুসাকে তো ঢুকতেই দিলো না,' রবিন বললো। 'ভীষণ কড়া।'

এক মুহূর্ত ভাবলো হোফার। 'চেষ্টা করে দেখতে পারি। গার্ডকে গিয়ে বলবো, আমাকে বলা হয়েছে সমস্ত পাগলকে একখানে করতে, একটা বিশেষ মীটিঙের জন্যে। আমাকে চেনে সে।'

ক্যাপ তুলে নিয়ে মাথায় দিলো সে। 'হয়তো কাজ হয়ে যাবে। এসো।'

স্টুডিওর গেট থেকে খানিকটা দূরে তিন গোয়েন্দাকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে গেল হোফার। অহেতুক দাঁড়িয়ে না থেকে হালকা নাস্তা করার জন্যে একটা স্ন্যাকবারে ঢুকলো ওরা। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটু পরেই হাসিমুখে ফিরে এলো হোফার। কাজ হয়ে গেছে।

একটা কাগজে সমস্ত পাগলদের ঠিকানা লিখে এনেছে সে, তার মধ্যে কিশোরের ঠিকানাও রয়েছে। হ্যামবার্গার চিবাতে চিবাতে ঠিকানাগুলো দেখলো কিশোর। নেলি থাকে সান্তা মনিকায়। শিকারী কুকুর থাকে বাবার সঙ্গে বেভারলি হিল-এ। মড়ার খুলি আর ভারিপদর অ্যাপার্টমেন্ট হলিউডে।

'মড়ার খুলিকে দিয়েই শুরু করা যাক,' কিশোর বললো।

'দাঁড়াও,' বলতে বলতে প্লেট থেকে আরেকটা হ্যামবার্গার তুলে নিলো মুসা, 'আগে ডান হাতের কাজটা সেরে নিই।'

হোফারও একটা স্যাণ্ডউইচ নিলো। খাওয়া শেষ হলে আবার বেরিয়ে পড়লো ওরা।

হলিউড বুলভার থেকে বেশি দূরে না মড়ার খুলির বাসা। বাড়িটার নাম ম্যাগনোলিয়া আর্মস, লা পামা স্ট্রীটে। মোটেলের মতো দেখতে লাগে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটাকে। খোলা চত্বরে, মুখোমুখি দুই সারি কাঠের কেবিন। এর পরে রয়েছে গাড়ি পার্ক করার ছোট জায়গা।

রাস্তায়ই গাড়ি রাখলো হোফার। চত্বরে ঢুকে পড়লো তিন গোয়েন্দা। অন্ধকার। কয়েকটা কেবিনের জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে।

মড়ার খুলির বাসার নম্বর ১০। চত্বরের শেষ ধারে পাওয়া গেল কেবিনটা, পর্দা টানা থাকা সত্ত্বেও ভেতর থেকে হালকা আলো আসতে দেখা গেল। বোধহয় বাড়িতেই রয়েছে মড়ার খুলি।

ঘাসে ঢাকা চত্বরের ওপর দিয়ে সেদিকে এগোলো তিনজনে। দশ নম্বরের দরজাটা মুখ করে রয়েছে বিরাট একটা ম্যাগনোলিয়ার ঝাড়ের দিকে। অন্ধকারে ওটার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে দরজার দিকে চোখ রাখলো তিন বন্ধু।

দরজার ওপরের অংশ কাঁচে তৈরি। পর্দা না লাগিয়ে খড়খড়ি লাগানো হয়েছে সেখানটায়। খড়খড়ির কয়েকটা পাত বেঁকে গেছে। কাঁচের গায়ে নাক ঠেকিয়ে ওই ফাঁক দিয়ে ভেতরে দেখা সম্ভব।

'মুসা, তোমার কাজ,' কিশোর বললো। 'তুমি বেশি লম্বা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মুসা। বিপজ্জনক কাজ করার জন্যে এরকম নির্দেশ অনেক পেয়েছে গোয়েন্দাপ্রধানের কাছ থেকে, অন্যান্য কেসে। তবে প্রতিবাদ কিংবা তর্ক করলো না। নিঃশব্দে উঠে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

ম্যাগনোলিয়ার ঝাড় আর দরজায় মাঝে একচিলতে ঘাসে ঢাকা জমি। কয়েক পা এগিয়েই হুমড়ি খেয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো মুসা। পারলে ঢুকে যেতে চায় মাটির ভেতরে।

মড়ার খুলির ঘরের দরজা খুলে যাচ্ছে।

ভেতরের আলোর পটভূমিকায় দেখা গেল চামড়ার জ্যাকেট পরা লম্বা শরীরটা।

যে কোনো মুহূর্তে তাকে দেখে ফেলতে পারে, মুসা ভাবলো। মাত্র কয়েক মিটার দূরে শুয়ে আছে সে।

বিকেলে কিভাবে কিশোরের হাত খামচে ধরেছিলো, মনে পড়লো তার। ওদেরকে এখন গোয়েন্দাগিরি করতে দেখলে ভীষণ খেপে যাবে সে। হয়তো বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।

পেছনের আলোকিত ঘরের দিকে ফিরে তাকালো মড়ার খুলি। ডাকলো, 'এই, এসো,' লম্বা চুলে চিরুণি চালালো সে। 'যাবার সময় হয়েছে।'

মুঠো শক্ত হয়ে গেছে কিশোরের। একা মড়ার খুলির সঙ্গে লাগতে যাওয়াই বিপজ্জনক, তার ওপর যদি তার সহকারী থেকে থাকে তাহলে তিনজনে মিলেও ওদের সঙ্গে পারবে না।

হোফার সাথে থাকলে ভালো হতো, ভাবলো সে। কিন্তু তাকে দেখাই যাচ্ছে না এখান থেকে। ডাকলেও শুনবে না, অনেক দূরে রয়েছে।

নীল জিনস আর ডেনিম শার্ট পরা আরেকজন এসে দাঁড়ালো মড়ার খুলির পাশে। দরজার পাশে হাত বাড়ালো মড়ার খুলি। সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিলো কেবিনের। বেরিয়ে এসে বন্ধ করে দিলো দরজা। অন্ধকারে হাঁটতে শুরু করলো।

মাথা তুলতেই সাহস করছে না মুসা। ঘাসের ওপর মুখ চেপে অনড় পড়ে রয়েছে। তার মাথার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পাগুলোও দেখতে পেলো না। তবে তার মনে হলো, বুঝি মাথা মাড়িয়েই এগিয়ে গেল।

আলো নেভানোর আগে দু'জনের চেহারাই দেখতে পেয়েছে কিশোর। চিনতে পেরেছে মড়ার খুলির সঙ্গীকে।

বটিসুন্দরী, নেলি।

অন্ধকারে আবছা হতে হতে মিলিয়ে গেল মূর্তিদুটো। রাস্তার দিকে চলে গেছে দু'জনে।

ঝাড়ের কাছে আগের জায়গায় ফিরে এলো মুসা। দম নিতে নিতে বললো সে। 'আরেকটু হলেই মাথা থেঁতলে দিয়েছিলো! গটগট করে হেঁটে চলে গেল মাথার কাছ দিয়ে!'

মুসার কথা শোনার সময় নেই কিশোরের। উঠে পড়েছে ইতিমধ্যেই। রওনা হয়ে গেল। তার পেছনে চললো রবিন আর মুসা।

কিছুদূর এগোতেই মড়ার খুলি আর নেলিকে দেখা গেল আবার। বিশ মিটার মতো দূরে। দ্রুতপায়ে চলেছে হলিউড বুলভারের দিকে। হোফারের লিমুজিনের নাক ওরা যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টোদিকে মুখ করে আছে। ওদেরকে ধরতে হলে গাড়ি ঘোরাতে হবে তাকে, সরু রাস্তায় তাতে অনেক সময় লেগে যাবে। ততোক্ষণে হয়তো হারিয়ে যাবে দু'জনে।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো কিশোর। মুসাকে বললো, 'তুমি হোফারকে গিয়ে বলো, গাড়ি ঘুরিয়ে রাখতে। রবিন, জলদি চলো, ওদের চোখের আড়াল করা চলবে না।'

গাড়ির দিকে দৌড় দিলো মুসা। কিশোর আর রবিন চললো বুলভারের দিকে।

লা পামায় এই সময়টায় রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই। ফিরে তাকালেই দুই কিশোর যে ওদেরকে অনুসরণ করছে দেখে ফেলবে মড়ার খুলি। কাজেই দূরে দূরে রইলো কিশোর।

মিনিটখানেক পরেই পেছনে লিমুজিনের শব্দ শোনা গেল। হলিউড বুলভার আর পনেরো মিটার দূরে। সামনের ট্র্যাফিক লাইটের কাছে গিয়ে থামলো মড়ার খুলি আর নেলি। কিশোররাও থেমে গেল। গাড়ি আসার অপেক্ষা করছে।

পাশে এসে দাঁড়ালো গাড়ি। ওঠার জন্যে পেছনের দরজা খুললো কিশোর।

এই সময় দ্রুত, প্রায় একই সঙ্গে ঘটে গেল কয়েকটা ঘটনার।

হলিউড বুলভার পেরোতে লাগলো মড়ার খুলি আর নেলি।

লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো রবিন আর কিশোর।

বুলভারের মোড়ের কাছে উদয় হলো একটা হলুদ গাড়ি।

ঝাঁকি দিয়ে আগে বাড়লো লিমুজিন।

জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিলো কিশোর, যাতে নজরে রাখতে পারে মড়ার খুলি আর নেলিকে।

কিন্তু রাখবে কি? দেখাই গেল না ওদের।

ছুটতে শুরু করলো হলুদ গাড়িটা।

'পিছু নাও ওটার,' হোফারকে বললো কিশোর।

পিছে ছুটতে গেল লিমুজিন। কিন্তু ওই মুহূর্তে ট্র্যাফিক লাইটের সবুজ আলো

নিভে লাল আলো জ্বলে উঠলো। সময়মতো ব্রেক কষলো হোফার। বাঁয়ে মোড় নিয়ে চলে যাচ্ছে হলুদ গাড়িটা। পলকের জন্যে কিশোরের চোখে পড়লো দুটো মুখ, মড়ার খুলি আর নেলি।

মাথা থেকে ক্যাপ খুলে নিয়ে নিরাশ ভঙ্গিতে সীটে হেলান দিলো হোফার। সবুজ আলো জ্বলার অপেক্ষা করছে। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'বোধহয় হারালাম!'

'সেটা তোমাদের দোষে নয়,' সান্ত্বনা দিলো তাকে কিশোর। ব্যাপারটা বুঝতে পারছে। লা পামা আর হলিউড বুলভারের এই মিলনস্থলে হলুদ গাড়িটাকে আসতে বলে দিয়েছিলো নিশ্চয় মড়ার খুলি। গাড়ি এলো। সবুজ আলো নেভার ঠিক আগের ক্ষণে লাফ দিয়ে তাতে উঠে বসেছে দু'জনে।

'তবে একেবারে বিফল হইনি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর।

'নেলির কথা বলছো?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'তবে তার চেয়েও জরুরী ব্যাপার হলো হলুদ গাড়িটা। ওটাকে আগেও দেখেছি। কার গাড়ি, জানি।'

'জানি?' মুসার গলায় সন্দেহ।

'কার?' রবিনের প্রশ্ন

'মুভি স্টুডিওর বিজ্ঞাপন ম্যানেজার,' শান্তকণ্ঠে বললো গোয়েন্দাপ্রধান, 'হ্যারিস বেকার।'

এগারো

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলো কিশোর। রান্নাঘরে এসে নিজেই ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে নিয়ে নাস্তা সেরে চলে এলো তার ওয়ার্কশপে।

দিনটা মেঘলা। জোরে জোরে বাতাস বইছে। কাজ করার আগে একটা তারপুলিন দিয়ে ঘিরে নিতে হলো ওয়ার্কবেঞ্চের চারপাশ।

নতুন জিনিসটা দিয়ে আপাতত কোনো কাজ হবে কিনা জানে না, তবু শুরু যখন করেছে শেষ করে ফেলা দরকার, এই ইচ্ছেতেই বসেছে। ক্যামেরাটার নাম দেবে সে গোয়েন্দা ক্যামেরা। সংক্ষেপে গোক্যা। কাজ করতে বসলো আরও একটা কারণে, এরকম কাজের সময় তার মাথা খোলে ভালো, চিন্তাশক্তি বাড়ে।

হাত জোড়া দিচ্ছে একের পর এক খুদে যন্ত্রপাতি, আর মগজ জোড়া দিচ্ছে রূপালি-কাপ-চুরি রহস্যের ছেঁড়া সূত্রগুলো।

বেশ কিছু সূত্র জোড়া দেয়া যাচ্ছে না। ভারিপদর কথাই ধরা যাক। টেলিভিশন

নেটওয়ার্ক বিল্ডিঙে ঢুকেই কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো? নির্দিষ্ট সময়ের দুই ঘন্টা আগে এলো। লিফটে করে উঠে গেল, কিন্তু সতেরো তলায় নয়। পাঁচ মিনিট পর নেমে এলো আবার লবিতে।

ওই পাঁচ মিনিট কি করেছে সে? কারও অফিসে দেখা করেছে?

কার সঙ্গে?

আর হ্যারিস বেকারের ব্যাপারটাই বা কি? রাতের বেলা হলিউড বুলভারের মোড় থেকে নেলি আর মড়ার খুলিকে তুলে নেয়ার তার কি দরকার পড়লো?

দু'জনকে হোটেলে ডিনার খাওয়াতে নিয়ে গেল? মনে হয় না। মড়ার খুলির সঙ্গে হ্যারিসের যা সম্পর্ক দেখা গেছে, তাতে খাওয়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা নয়। আর নিলোই যদি, সরাসরি ম্যাগনোলিয়া আর্মস থেকে ওদেরকে তুলে নিলো না কেন হ্যারিস?

হলিউড বুলভারের ঘটনাটা একটা স্পাই ছবির কথা মনে করিয়ে দিলো কিশোরের। ঠিক এরকম ঘটনাই ঘটেছিলো ছবিটাতে। দু'জন সন্দেহভাজনকে অনুসরণ করে চলেছিলো দু'জন স্পাই, তারপর হঠাৎ করে একটা গাড়ি এসে সামনের দু'জনকে তুলে নিয়ে গেল, যেন ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

ঘন্টা তিনেকের মধ্যেই ক্যামেরাটা বানিয়ে ফেললো কিশোর। পকেট চিরুনির চেয়ে বেশি মোটা হবে না জিনিসটা। জ্যাকেটের ভাঁজের মধ্যেই জায়গা হয়ে গেল। লোকের চোখে পড়ার মতো ফুলেও থাকলো না। সামান্য একটু ঠেলে চোখটা বোতামের ফুটোর কাছে নিয়ে এলো সে। ঠিক এই সময় জ্বলে উঠলো মাথার ওপরের লাল আলো।

তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই ট্রেলারে ঢুকে রিসিভার তুলে নিলো সে। 'কিশোর পাশা বলছি।'

'হাল্লো! যাক, বাড়িতেই আছো,' টেলিফোনেও গলার খুশি খুশি ভাবটা বোঝা যায়।

'মিস্টার বেকার?'

'ধরে নাও আমি একজন বন্ধু,' বললো হাসি হাসি কণ্ঠ। 'নেলির বন্ধু। সে কোনো দুর্ঘটনায় পড়ুক, এটা চাই না। তুমি চাও?'

'নিশ্চয়ই না। কিন্তু নেলি দুর্ঘটনায় পড়বে কেন? কোথায় আছে?'

'সেটা জানার দরকার নেই তোমার, মোটুরাম,' হাসি বাড়লো কণ্ঠটার। 'আপাতত নিরাপদেই আছে। তবে বেশিক্ষণ থাকবে না, সেকথাই বলতে চাইছি তোমাকে।' এক মুহূর্ত নীরবতা। 'যদি তুমি আজ ফার্স্ট হও, মোটুরাম, নেলি মারা যাবে। মরবে হাসপাতালে গিয়ে, অনেক কষ্ট পেয়ে।'

'শুনুন…,' কথা শেষ করতে পারলো না কিশোর। লাইন কেটে গেল ওপাশ থেকে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ডেস্কের পাশে এসে বসলো কিশোর। গতদিন পাগলদের বাসার যে লিস্টটা তাকে দিয়েছিলো হোফার, সেটা এখনও পকেটেই রয়েছে। বের করলো। রিসিভার তুলে নিয়ে সান্তা মনিকায় নেলির হোটেলের নম্বরে ফোন করলো।

সাড়া দিয়ে নেলির ঘরে লাইন দিলো ক্লার্ক। মিনিটখানেক পরে জানালো, 'ঘরে নেই।'

'হোটেল ছেড়ে চলে যায়নি তো?'

না, খাতায়-কলমে চলে যায়নি। কিশোর বলার পর সম্ভাবনাটা ঢুকলো ক্লার্কের মাথায়। সারা সকাল ধরে নেলিকে দেখেনি। বাক্সেই রয়েছে তার ঘরের চাবি।

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার রেখে দিলো কিশোর। কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে বসে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো সে। তারপর আনমনে মাথা নাড়লো কয়েকবার। মৃদুস্বরে নিজেকেই বোঝালো, 'হ্যারিস বেকার ফোন করেনি।'

একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত, বেকার তাকে মোটুরাম বলে ডাকবে না। ওই লোকটা এ-পর্যন্ত এ-নামে তাকে একবারও ডাকেনি। শুধু কিশোর বলে। তাহলে বেকার যদি না-ই হয়ে থাকে, তাহলে এমন কেউ, যে খুব ভালো অভিনেতা, কণ্ঠস্বর নকলে ওস্তাদ।

কে? মড়ার খুলি? কিন্তু মড়ার খুলি তো পাগলদের মধ্যে সব চেয়ে বাজে অভিনেতা ছিলো। কান নাড়ানো ছাড়া আর কিছুই পারতো না। অনেক সময় সংলাপ ভুলে বসে থাকতো। কথার সঙ্গে মুখ-হাত নাড়ানোরও মিল থাকতো না।

জঞ্জালের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ছে ঝড়ো হাওয়া, তীক্ষ্ণ শিস কাটতে কাটতে যেন মাথা কুটে মরছে ট্রেলারের ভেতরে ঢোকার জন্যে।

মড়ার খুলির একটা স্পোর্টসকার আছে, কথাটা মনে পড়তেই একটা বুদ্ধি এলো কিশোরের মাথায়। আবার রিসিভার তুলে হোফারকে ফোন করলো। মুসা আর রবিনকে ওদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যতো তাড়াতাড়ি পারে ইয়ার্ডে চলে আসতে বললো।

রিসিভার রেখে দিয়ে আরও কয়েক মিনিট ডেস্কের কাছে বসে রইলো সে। প্ল্যান করছে মনে মনে। গোয়েন্দা ক্যামেরাটা এতো তাড়াতাড়িই কাজে লেগে যাবে ভাবেনি।

ট্রেলারের ভেতরেই একটা ছোট ডার্করুম আছে। সেখানে এসে ঢুকলো কিশোর। সাধারণ ক্যামেরার গোল ফিল্ম ভরা যাবে না তার ক্যামেরাটাতে। কারণ জিনিসটা চ্যাপ্টা। কাজেই ফিল্ম থেকে কেটে মাত্র একটা ছবি তোলা যায় এরকম একটা টুকরো ভরা যাবে। একবার তোলার পর আবার তুলতে হলে আবার ফিল্ম কেটে ভরতে হবে।

তবে তার অনুমান যদি ঠিক হয়, আর টাইমিং ঠিক থাকে, তাহলে একবারই যথেষ্ট।

ফিল্ম ভরে ক্যামেরাটা আবার জ্যাকেটের ভাঁজে ভরলো কিশোর। বোতামের ফুটো দিয়ে বের করে দিলো ক্যামেরার চোখ। ভালো করে না তাকালে চোখে পড়ে না। আর তাকালেও ছোট গোল লেন্সটাকে দেখে আরেকটা বোতাম বলেই ভুল হবে। শুধু জ্যাকেটের অন্যান্য বোতামের সঙ্গে এটার রঙ মেলে না, এই যা।

গেটে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না তাকে। পৌঁছে গেছে রবিন আর মুসা।

'ব্যাপার কি?' সে লিমুজিনের পেছনের সীটে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো রবিন। 'কিছু পেলে?'

'হ্যাঁ।' আর কিছু বললো না, শুধু হোফারকে লা পামা স্ট্রীটে যেতে বললো।

ম্যাগনোলিয়া আর্মসের কাছে এনে গাড়ি রাখলো হোফার।

'তুমি যাও, মুসা,' কিশোর বললো।

'আবার! তা কোথায় যেতে হবে?'

হাসলো কিশোর। 'মরতে নয় অবশ্যই। চট করে কার পার্কে গিয়ে শুধু দেখে এসো মড়ার খুলির স্পোর্টসকারটা আছে কিনা।'

তিন মিনিটেই ফিরে এলো মুসা। জানালো, 'হ্যাঁ, আছে, লাল রঙের। ছোট।'

সীটে বসেই একপাশে কাত হলো কিশোর। 'ছাত তোলা, না নামানো?'

'নামানো। ক্যানভাসের ছাত।'

'গুড,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'দোয়া করি যেন নামানোই থাকে।'

ঘড়ি দেখলো সে। সাড়ে বারোটা বাজেনি এখনও। কতোক্ষণ বসে থাকতে হয় কে জানে। কখন বেরোবে মড়ার খুলি, টেলিভিশন স্টেশনের দিকে রওনা হবে, ঠিক নেই। একেবারে অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার পথের কাছে প্রায় গেট আগলে রয়েছে লিমুজিন। বেরোতে গেলে কালো গাড়িটা মড়ার খুলির চোখে পড়বেই।

দশ মিটার দূরে একটা গলি এসে পড়েছে লা পামা স্ট্রীটে।

'ওই মোড়টায় নিয়ে রাখতে পারবে?' হোফারকে অনুরোধ করলো কিশোর। 'লা পামার দিকে মুখ করে? তাহলে বেরিয়ে যেদিকেই যাক সে, তার পিছু নিতে পারবো আমরা সহজে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো।'

গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে গেল হোফার, তারপর পিছিয়ে এনে মোড়ের কাছে ঘাপটি মেরে বসে রইলো লা পামার দিকে মুখ করে।

ক্যামেরাটা ঠিকঠাক আছে কিনা, দেখলো আরেকবার কিশোর।

একটা বাজলে পরে দেখা গেল মড়ার খুলি বেরোচ্ছে। বেরিয়ে কার পার্কের দিকে

এগোলো। স্টার্ট দিলো হোফার। মড়ার খুলির লাল গাড়িটা না থামায় বেরিয়ে ডানে মোড় নিয়ে হলিউড বুলভারের দিকে এগোনোর আগেই চলতে শুরু করলো লিমুজিন।

বুলভারে পড়ে আবার ডানে ঘুরলো স্পোর্টসকার। তারমানে টিভি স্টেশনেই চলেছে মড়ার খুলি।

'পেছনে চলে যাও,' কিশোর বললো হোফারকে। 'তারপর যেই আমি বলবো "যাও", অমনি জোরে ছুটে চলে আসবে তার পাশে। ওর যতো কাছাকাছি সম্ভব নিয়ে যাবে আমাকে।'

পেছনের সীটে ডানপাশে বসেছে কিশোর। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে জানালার ভেতর দিয়ে, স্পোর্টসকার চালাচ্ছে মড়ার খুলি। লম্বা সোনালি চুল উড়ছে বাতাসে। সামনে ঝুঁকলো কিশোর। মাত্র একবার সুযোগ পাবে ক্যামেরা ব্যবহারের, আর একবারেই ছবিতে তুলে নিতে হবে। মিস করা চলবে না।

এবার আর লাল আলো বাধা দিলো না লিমুজিনকে। সবুজ আলো দেখে বেরিয়ে এলো দুটো গাড়িই। গতি বাড়াচ্ছে মড়ার খুলি। বাতাসে পেছনে প্রায় কাড়া হয়ে গেছে এখন তার চুল, ঝুলে ঝুলে গিয়ে বাড়ি মারছে কাঁধে। গাল, গলা, মাথার পেছনটা দেখা যায় এখন।

দেখতে দেখতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো কিশোর। বললো, 'যাও!'

লাফ দিয়ে গতি বেড়ে গেল লিমুজিনের। চোখের পলকে চলে এলো স্পোর্টসকারের পাশাপাশি। সীটের পাশে হেলে পড়ে ফিরে তাকালো কিশোর। জানালার কাঁচে চেপে ধরলো জ্যাকেটের ভাঁজে লুকানো ক্যামেরার চোখ।

এখন ফিরে গাড়িটার দিকে মড়ার খুলি তাকালেই কিশোরের আশা শেষ। নষ্ট হয়ে যাবে ওর পরিকল্পনা।

এখনও সামনে তাকিয়ে রয়েছে মড়ার খুলি। ক্যামেরার বোতাম টিপে দিলো কিশোর। এই সময় লিমুজিনের দিকে ফিরলো মড়ার খুলি। ফিরুক। আর অসুবিধে নেই। কাজ যা করার করে ফেলেছে গোক্যা। মড়ার খুলি বুঝতে পারেনি যে তার ছবি তোলা হয়েছে।

'হয়েছে, এবার পিছাতে পারো,' হোফারকে বললো কিশোর।

লিমুজিনটা যখন পিছাচ্ছে, জ্যাকেটের ভাঁজ থেকে ক্যামেরাটা বের করে রবিনের হাতে দিলো সে। 'আমাকে টিভি স্টেশনে নামিয়ে দিয়েই হেডকোয়ার্টারে চলে যাবে তোমরা। ছবিটা ডেভলপ করে বড় করবে। কুইজ শো দেখতে পারবে না তোমরা। কিন্তু রেকর্ডিং শেষ হতে হতে বড় একটা ছবি চাই আমার। ছবিটা নিয়ে স্টেজে চলে আসবে, শো শেষ হওয়ার পর পরই যেন ঢুকতে পারো।'

'আচ্ছা,' ক্যামেরাটা পকেটে ভরে রাখলো রবিন। 'কিন্তু ব্যাপারটা কি, কিশোর?

মড়ার খুলির ছবি নিলে কেন?'

হেসে বললো কিশোর, 'ঝড়ো দিনে খোলা গাড়িতে তার একটা প্রোফাইল নিলাম। নিশ্চয় কারণটা বুঝতে পেরেছো?'

'না,' স্বীকার করলো রবিন, 'পারিনি।'

'আমি কিছুই বুঝিনি,' মুসা বললো।

'একপাশ থেকে ছবি তুললাম, তার কারণ তার লম্বা সোনালি চুলগুলো দেখতে চাই,' বুঝিয়ে দিলো কিশোর। 'একটা ব্যাপার নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো, সব সময় আঁচড়ে ওগুলো সমান করে নামিয়ে রাখে সে। তবে আজকের ঝড়ো বাতাসকে ধন্যবাদ, ওর লুকিয়ে রাখা একটা অঙ্গের ছবি তুলতে পারলাম। এবার নিশ্চয় বুঝেছো?'

'না,' জবাব দিলো রবিন।

'কোন্ অঙ্গের কথা বলছো তুমি?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'ওর কান,' বলে দিলো কিশোর। 'ওর বিখ্যাত কান, যে দুটো নড়াতে পারে।'

বারো

দুটো বাজতে আর এক মিনিট বাকি। কিশোর দেখলো, উদ্বিগ্ন হয়ে ঘড়ি দেখছে হ্যারিস বেকার। এই নিয়ে তিনবার এরকম করলো সে।

আর মিনিটখানেক বাদেই শুরু হবে পাগলদের দ্বিতীয় কুইজ শো, অথচ হাজির রয়েছে মাত্র তিনজন। মড়ার খুলি, শিকারী কুকুর আর কিশোর। নেলি আর ভারিপদ আসেনি।

দর্শকমণ্ডলীর দিকে তাকালো কিশোর। শেষের সারিতে বসেছে আজ মুসা। সে-ও বেকারের মতোই উদ্বিগ্ন। কিশোরকে তার দিকে তাকাতে দেখে অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে শ্রাগ করলো। জবাবে কিশোরও শ্রাগ করলো। ভারিপদর জন্যে ভাবছে না সে, নেলির জন্যে চিন্তিত।

আরও পেছনে দৃষ্টি দিলো কিশোর। কন্ট্রোল বুদে জায়গামতোই রয়েছেন সাইনাস। পরনে সেই দোমড়ানো ধূসর স্যুট, এলোমেলো সাদা চুল, চোখের নিচে গাঢ় ছায়া। অতি ক্লান্ত বিধ্বস্ত একজন মানুষ।

ঘোরানো গলিতে একটা নড়াচড়া চোখে পড়লো কিশোরের। স্টেজের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে ভারিপদ। নিজের সীটে এসে বসলো।

ঠিক দুটো বাজে, কিন্তু নেলি এখনও অনুপস্থিত।

ভারিপদর দিকে ঝুঁকে নিচু গলায় বললো কিশোর, 'দেরি করে ফেলেছো।'

'হ্যাঁ,' হাসলো ভারিপদ। 'পথে খারাপ হয়ে গেল মোটর সাইকেল।' টাইয়ের

সঙ্গে মাইক বাঁধলো সে। 'তবে না আসতে পারলেও কিছু হতো না। জেতার সম্ভাবনা একটুও নেই আমার। টাকাও পাবো না।'

আবার বেকারের দিকে নজর দিলো কিশোর। ভারিপদ এসে বসার পর কিছুটা উজ্জ্বল হলো তার হাসি। কন্ট্রোল রুমকে তৈরি হওয়ার ইশারা করে দর্শকদের দিকে ফিরলো।

'প্রিয় দর্শকমণ্ডলী,' বলতে শুরু করলো সে, পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলো, 'আপনাদের জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে। আমাদের প্রতিযোগী নেলির কাছ থেকে একটু আগে একটা চিঠি পেয়েছি। চিঠিটা এসেছে আমার অফিসের ঠিকানায়। আপনাদেরকে পড়েই শোনাচ্ছি।' হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে একটা সেকেণ্ড বিরতি দিয়ে, তারপর জোরে জোরে পড়তে লাগলো, 'ডিয়ার মিস্টার বেকার। আপনাদেরকে এভাবে বেকায়দায় ফেলার জন্যে আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু আমার ছবি পত্রিকায় ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই বিপদ, বহুবছর আগে যে যন্ত্রণায় পড়েছিলাম, রাস্তায় বোরোলেই আবার বিরক্ত করছে লোকে। কুইজ শো জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই আর আমার, বুঝতে পেরেই ভাবলাম আর ক্যামেরার সামনে যাবো না। স্যান ফ্র্যান্সিসকোয় আমার বাড়িতে চলে যাচ্ছি। ওখানে অন্তত শান্তিতে থাকতে পারবো, লোকে বিরক্ত করবে না আমাকে। আপনি, এবং পাগলদের সবার প্রতি রইলো আমার শুভেচ্ছা।' আবার নাটকীয় ভঙ্গিতে বিরতি দিয়ে বেকার বললো, 'নিচে সই করেছে, বটিসুন্দরী।'

গুঞ্জন উঠলো দর্শকদের মাঝে। বিরক্ত নয়, সহানুভূতি, বটিসুন্দরীর মর্মযাতনা উপলব্ধি করতে পারছে ওরা।

'নেলি,' বেকার বললো ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে, 'আমাদের এই অনুষ্ঠান যদি এই মুহূর্তে দেখে থাকো তুমি, তাহলে বলছি তোমার এই সিদ্ধান্তের জন্যে আমরা খুব কষ্ট পেলাম। তোমাকে পেয়ে সত্যিই খুশি হয়েছিলাম আমরা। তোমাকে মিস করছি এ-মুহূর্তে।'

দর্শকরাও বেকারের সঙ্গে সায় দিয়ে গুঞ্জন করে উঠলো। নানারকম কথা বলতে লাগলো ওরা। হাত তুলে ওদেরকে শান্ত হতে অনুরোধ করলো বেকার, 'দয়া করে চুপ করুন আপনারা। আমাদের শো শুরু হতে যাচ্ছে। পাগলদের দ্বিতীয় এবং ফাইন্যাল কুইজ শো।'

নিভে গেল আলো। পর্দার দিকে তাকালো কিশোর। দুই মিনিটের টুকরো ছবি দেখানো আরম্ভ হলো। ওতে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারছে না সে, মাথায় ঘুরছে নানারকম চিন্তা। তবে যেটুকু পারলো, তাতেই পুরো ছবিটা রেকর্ড হয়ে গেল তার অসাধারণ স্মৃতিতে।

জনাব গণ্ডগোলের জন্যে একটা কুকুর চুরি করছে শজারুকাঁটা। ডোরাকাটা একটা স্ট্র-র সাহায্যে স্ট্রবেরি মিল্ক শেক খাচ্ছে বটিসুন্দরী। ভুট্টা পোড়া দেয়ার জন্যে বনের ভেতর আগুন জ্বেলেছে মড়ার খুলি আর শিকারী কুকুর। একটা জলাশয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ছে ভারিপদ। দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে বনে, তার মধ্যে আটকা পড়েছে মোটুরাম। চেককাটা একটা টেবিলক্লথ দিয়ে ভারিপদর মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে শিকারী কুকুর। আগুনের ভেতর থেকে মোটুরামকে উদ্ধার করে আনছে নেলি···

ছবি দেখছে আর ভাবছে কিশোর, নিশ্চয় ওই চিঠি নেলি লেখেনি। কারণ, কিছুতেই বটিসুন্দরী লিখে সই করবে না সে। কিশোর যেমন মোটুরামকে ঘৃণা করে, তেমনি নেলি ঘৃণা করে বটিসুন্দরীকে। তাছাড়া, সে বাড়িও যায়নি। হোটেলের ঘর ছাড়েনি। অথচ সারা সকাল তাকে হোটেলে দেখা যায়নি, ছিলো না।

নিশ্চয় বিপদে পড়েছে নেলি। তাকে আটকে রাখা হয়েছে কোথাও। তারপর তার নাম সই করে দিয়ে একটা জাল চিঠি পাঠানো হয়েছে। যে এসব করেছে, সেই একই লোক হুমকি দিয়ে ফোন করেছে কিশোরকে।

দুই মিনিট পর ছবি শেষ হয়ে গেল। জ্বলে উঠলো আলো।

ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ডের দিকে তাকালো কিশোর। পঁয়তাল্লিশ নম্বর পেয়েছে সে। মড়ার খুলি চল্লিশ। নেলি পঁয়তিরিশ। ভারিপদ আর শিকারী কুকুর আরও অনেক কম।

সুইভেল চেয়ার ঘুরিয়ে প্রতিযোগীদের মুখোমুখি হলো বেকার।

নেলি না থাকায় প্রথম জবাব দেয়ার পালা এলো মড়ার খুলির।

'বলতো, বটিসুন্দরী, যে স্ট্র দিয়ে মিল্ক শেক খাচ্ছিলো, ওটার বিশেষত্ব কি?'

'ডোরাকাটা,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো মড়ার খুলি। 'লাল, সাদা আর নীল।'

হাততালি পড়লো। কিশোরের সমান নম্বর হয়ে গেল তার।

শিকারী কুকুরের পালা। 'কি ধরনের মিল্ক শেক খাচ্ছিলো?'

দ্বিধা করলো শিকারী। মড়ার খুলির আগের মুহূর্তে কিশোরের হাত উঠে গেল।

'চকলেট?' জবাব নয়, যেন বেকারকে প্রশ্ন করলো শিকারী কুকুর।

'না না না,' চেঁচিয়ে উঠলো দর্শকরা। 'হলো না।'

'হলো না,' যেন খুবই দুঃখিত হয়েছে এমন ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে কিশোরের দিকে ফিরলো বেকার। 'বলো?'

দ্বিধা করার ভান করলো কিশোর। তার ভালো করেই জানা আছে জবাবটা কি। কিন্তু বললো, 'আমারও মনে হয় ওটা চকলেট।'

আশা করেছিলো দর্শকরা, কিশোর পারবেই, কিন্তু তাদেরকে নিরাশ হতে হলো। খুব আফসোস করলো তারা। পাঁচ নম্বর হারালো সে। এরপর থেকে হারাতেই

থাকলো। তার নিজের প্রশ্ন যখন এলো, জিজ্ঞেস করা হলো কি দিয়ে শিকারী কুকুরের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধছিলো ভারিপদ, আবারও দ্বিধায় অভিনয় শুরু করলো সে।

'টিসু পেপার?' বলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে বেকারের দিকে তাকালো।

জোর গুঞ্জন উঠলো দর্শকদের মাঝে। ওরা বিশ্বাসই করতে পারছে না যেন কিশোর ভুল করবে।

পঞ্চম এবং শেষ রাউণ্ডে দেখা গেল পঁয়ষট্টি নম্বর পেয়ে এগিয়ে রয়েছে মড়ার খুলি। শেষ জবাবটাও ঠিক ঠিক দিলো সে। শিকারী কুকুর আর ভারিপদ ভুল করলো। কিশোরের পালা এলো।

'তোমাকে এবার খুব সহজ একটা প্রশ্ন করি,' বেকার বললো। 'জনাব গণ্ডগোলের জন্যে কি চুরি করেছে শজারুকাঁটা?'

জবাব দেয়ার আগে স্কোরবোর্ডের দিকে তাকালো কিশোর।

মাথা চুলকালো। নেলির চেয়ে ইতিমধ্যেই পাঁচ নম্বর কম পেয়েছে। আবারও ভুল জবাব দিলো, 'ইয়ে, একটা বেড়াল।'

গুঙিয়ে উঠলো দর্শকরা।

প্রশ্ন-পর্ব শেষ হলো।

অনেক সময় নিয়ে ধীরে ধীরে প্রতিযোগীরা কে কতো নম্বর পেয়েছে, পড়তে লাগলো বেকার। মড়ার খুলি পেয়েছে সত্তর। নেলি পঁয়তিরিশে রয়েছে। তার চেয়েও পাঁচ নম্বর কম পেয়েছে কিশোর, অর্থাৎ তিরিশ। কাজেই নেলি দ্বিতীয় শোতে যোগ না দিয়েও দ্বিতীয় হয়ে আছে।

তিনটে ক্যামেরার চোখেই মড়ার খুলির দিকে ঘুরে গেল, যখন সে হাসিমুখে বিশ হাজার ডলারের চেকটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়ালো। সেদিকে তাকানোরও প্রয়োজন বোধ করলো না কিশোর। সে উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে দর্শকদের মাথার ওপর দিয়ে পেছনে, রবিনকে দেখার আশ্রয়।

অবশেষে ঘোরানো গলি দিয়ে রবিনকে ছুটে আস৮৩ দেখা গেল। দর্শকদের সারির মাঝ দিয়ে প্রায় দৌড়ে এলো স্টেজের দিকে। তার পেছনে এলো মুসা। হাতের বড় ম্যানিলা খামটা কিশোরের হাতে তুলে দিলো রবিন। ফিসফিসিয়ে বললো, 'খুব পরিষ্কার উঠেছে।'

রবিন আর মুসা ফিরে গেল সীটে। খামটা খুললো কিশোর। যা আশা করেছিলো, তার চেয়ে ভালো উঠেছে ছবিটা। মড়ার খুলির একটা চমৎকার ছবি, বাতাসে চুল উড়ছে পেছনে।

তার বাঁ কানটা স্পষ্ট।

'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান,' বেকার বলছে হাসি হাসি কণ্ঠে, 'এখন আমি

পাগলদের সবাইকে একটা করে পুরস্কার দিতে চাই।'

দর্শকদের গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল। ছবিটা আবার খামে ভরে ক্যামেরার চোখের দিকে তাকাতে তৈরি হলো কিশোর।

'অ্যানি,' ডাকলো বেকার, 'পুরস্কারগুলো নিয়ে এসো।'

আলোচনার দিন যে মেয়েটা কাপের বাক্স নিয়ে এসেছিলো, সে-ই এলো আরেকটা সোনালি কাগজে মোড়ানো বাক্স হাতে। একটা ভুরু উঠে গেল কিশোরের। এবার আর একা আসেনি মেয়েটা, সঙ্গে রয়েছে ইউনিফর্ম পরা একজন গার্ড।

বাক্সটা খুললো বেকার। নাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছে। সব শেষে বললো, '...পাগলদেরকে একটা করে রুপার কাপ উপহার দেবো আমরা।'

নানারকম কথা বলে আর শব্দ করে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো দর্শকরা, পাগলরা যখন পুরস্কার নিতে এগোলো।

'নেলির কাপটা ডাকযোগে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হবে,' বেকার বললো। 'নেলি, তুমি যদি এ-অনুষ্ঠান দেখে থাকো, আবার ধন্যবাদ তোমাকে। উপস্থিত পাগলবৃন্দ, দর্শকমণ্ডলী, আর যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখেছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আমাদের অনুষ্ঠান। গুড বাই।'

ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লো বেকার। পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঝলমল করছে তার হাসি। জোরে জোরে হাততালি দিচ্ছে দর্শকরা। শো শেষ।

থেমে গেল ক্যামেরার নড়াচড়া। নড়তে শুরু করেছে পাগলেরা। স্টেজের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে মড়ার খুলি। বেকার, শিকারী কুকুর, ভারিপদ, ক্যামেরাম্যান আর দর্শকদের কেউ কেউ তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

পেছনে দুই সহকারীকে নিয়ে ওই ভিড় ঠেলে ভেতর ঢুকলো কিশোর। চামড়ার জ্যাকেট পরা সোনালি-চুলোর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। ছবিটা বের করে দেখিয়ে বললো, 'এই ছবিটা কি তোমার?'

'কেন?' ছবির দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি ফুটলো মড়ার খুলির চোখে। কিন্তু অস্বীকার করতে পারলো না যে ছবিটা তার নয়। আশপাশের সকলে ঝুঁকে এলো ছবিটা দেখার জন্যে। 'হ্যাঁ, এটা আমারই ছবি। কেন?'

'কারণ এখানে তোমার কান ঢাকা নেই,' কিশোর বললো। পাশে দাঁড়ানো বেকারের দিকে তাকালো সে। 'বয়েস বাড়লে মানুষের চেহারা অনেক বদলে যায়, সন্দেহ নেই। শিকারী কুকুর, ভারিপদ, আমি, আমাদের সবার চেহারাই বদলেছে। পরিচয় না দিলে ছেলেবেলার সেসব ছবি দেখে লোকে এখন আমাদের চিনতে পারবে না। ঠিক?'

'ঠিক,' শিকারী কুকুর বললো।

মাথা ঝাঁকালো বেকার।

'কিন্তু কিছু কিছু জিনিস কখনও বদলায় না, বড় হলে আকারে বাড়ে এই যা,' বললো কিশোর। 'তার মধ্যে একটা অঙ্গ হলো মানুষের কান। মড়ার খুলির কান ছিলো অস্বাভাবিক বড়, কানের লতি এতো ঝোলা, মনে হতো জেলি লেগে আছে, ঝাড়া লাগলেই খসে পড়বে। কিন্তু ছবিতে যার কান দেখছেন, এইমাত্র যে বিশ হাজার ডলার পুরস্কার জিতলো, এর কান সম্পূর্ণ অন্যরকম। বয়েস বাড়লে কি কানের এরকম পরিবর্তন হয়?'

থাবা দিয়ে কিশোরের হাত থেকে ছবিটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলো চামড়ার জ্যাকেট পরা তরুণ। খপ করে তার চেপে ধরে ঠেলে পিছনে সরিয়ে দিলো মুসা।

'কি-কি বলতে চাও তুমি?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালো মড়ার খুলি।

'বলতে চাই,' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর, 'তুমি কোনোদিনই পাগল সংঘে অভিনয় করোনি। এই কুইজ শোতে অংশ নেয়ার কোনো অধিকার তোমার ছিলো না। আর মিস্টার বেকার নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবেন, এই পুরস্কার তোমার প্রাপ্য হতে পারে না, কারণ...'

ছবিটা তুলে নাটকীয় ভঙ্গিতে নাচালো কিশোর। 'কারণ, তুমি আর যেই হও, পাগল সংঘের মড়ার খুলি হতেই পারো না।'

তেরো

টেলিভিশন নেটওয়ার্ক বিল্ডিঙের একটা বড় অফিসে জমায়েত হয়েছে অনেকে। নকল মড়ার খুলি, হ্যারিস বেকার, রাফায়েল সাইনাস, তিন গোয়েন্দা, শিকারী কুকুর, ভারিপদ, আর টেলিভিশন কোম্পানির একজন সিকিউরিটি গার্ড।

ডেস্কের ওপাশে বসেছে বেকার। তার সামনে রাখা কিশোরের তোলা ছবিটা। মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসেছে নকল মড়ার খুলি। আরও কতগুলো চেয়ার নিয়ে তার পেছনে গোল হয়ে ঘিরে বসেছে অন্যান্যরা।

'ও-কে,' পরাজিত ভঙ্গিতে অবশেষে বললো মড়ার খুলি, 'স্বীকার করছি, আমি আসল মড়ার খুলি নই। আরও স্বীকার করছি আমি একটা গাধা। গর্দভ না হলে মোটুরামকে আমার ছবি তোলার সুযোগ দিই?' কিশোরের দিকে তাকালো সে। 'তোমাকে আগেই বলেছি, তুমি যে বোকা নও সেটা আমি বুঝেছি, যতোই বোকার অভিনয় করো না কেন। তবে যতোটা চালাক মনে করেছি, তার চেয়ে যে অনেক বেশি, এটা বুঝতে পারিনি।' চওড়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিরাশার ভঙ্গি করলো সে। হাত ওল্টালো। 'চেষ্টা করে দেখলাম, পারিনি। বিশ হাজার ডলার, কম কথা নয়। তবে প্রায় সেরে

ফেলেছিলাম।'

পকেট থেকে চেকটা বের করে দেখলো মড়ার খুলি। জ্বলে উঠলো একবার চোখের তারা। তারপর দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারলো বেকারের দিকে।

'কাপটাও ফেরত দাও,' হাত বাড়ালেন সাইনাস। কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে আবার।

পকেট থেকে কাপটা বের করে আছাড় দিয়ে রাখলো টেবিলে।

'এখন বলো তুমি কে?' মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করলো সিকিউরিটি গার্ড। 'তোমার আসল নাম কি?'

'সেটা জেনে কি লাভ?' আবার কাঁধ ঝাঁকালো মড়ার খুলি। 'আমার নাম দিয়ে কার কি এসে যায়? এ-শহরে আরও হাজারটা অভিনেতার মতোই আমিও একজন, অভিনয় জেনেও যারা সুযোগ পায় না। যদিও অভিনয় ভালোই জানি আমি।'

মনে মনে তার সাথে একমত না হয়ে পারলো না গোয়েন্দাপ্রধান। আসল মড়ার খুলির চেয়ে এ অনেক ভালো অভিনেতা।

দলা পাকানো চেকটা চেপেচুপে সোজা করে পকেটে ভরে রাখলো বেকার। জিজ্ঞেস করলো, 'কে তোমাকে একাজ করতে বলেছে?'

'কেউ না।' আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে আবার নকল মড়ার খুলির গলায়। 'আমাকে কেউ একাজ করতে বলেনি। টেলিভিশনে পাগল সংঘের ছবিগুলো দেখেছি। কাগজে পাগলদের সম্পর্কে পড়েছি। ইস্কুলে কিছুদিন আসল মড়ার খুলির সঙ্গে পড়েছিলাম। একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল সে, বোধহয় সহপাঠীদের টিটকারির জ্বালায়ই অনেক বছর হলো তার আর কোন খবর নেই। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, মারা গেছে সে। একেবারে বোকা ছিলো তো। গরুর গাড়ির চাকার নিচে পড়ে মরলেও অবাক হবো না।

'ওর চেহারার সঙ্গে কিছু কিছু মিল আছে আমার। কান বাদে। ছবি দেখতে দেখতে একটা মতলব এলো মাথায়। নিজেকে মড়ার খুলি বলে চালিয়ে দর্শকদের কাছ থেকে বাহ্‌বা আদায় করবো। প্রথমে ভেবেছিলাম পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবো। তৈরিও করে ফেলেছিলাম, এই সময় খবর শুনলাম নেটওয়ার্ক একটা কুইজ শো'র বন্দোবস্ত করেছে। লুফে নিলাম সুযোগটা। কেন নেবো না? বিশ হাজার ডলার কম কথা?'

সবাই নীরব। বেকার হাসছে, তবে প্রাণ নেই হাসিটায়, কেমন যেন দ্বিধায় ভরা।

'এখন আমাকে নিয়ে কি করতে চান?' জিজ্ঞেস করলো নকল মড়ার খুলি।

'পুলিশের হাতে তুলে দেবো,' সিকিউরিটি বললো। 'জালিয়াতির অভিযোগে...'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো বেকার। 'ওই কাজও করতে যেও না। নেটওয়ার্ক কিংবা মুভি স্টুডিও, কারোই সুনাম হবে না এতে। কল্পনা করতে পারো, খবরের

কাগজওয়ালারা শুনতে পেলে কি তুমুল কাণ্ড শুরু করে দেবে?' সিকিউরিটিকে একটা উজ্জ্বল হাসি উপহার দিলো সে। 'আসলে আমাদের এখনও কোনো ক্ষতি তো হয়নি। বিশ হাজার ডলারের চেকটা স্যান ফ্র্যান্সিকোয় নেলির কাছে পাঠিয়ে দেবো। খুশি হবে। আর একে...'

নকল মড়ার খুলির দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। 'পুরো ব্যাপারটাকেই একটা রসিকতা মনে করি না কেন আমরা?' সাইনাসের দিকে তাকালো বেকার। 'রাফায়েল, তুমি কি বলো?'

ক্লান্ত চোখ নামিয়ে নিলেন বৃদ্ধ পরিচালক। সাদা, পাতলা চুলে আঙুল চালালেন। 'তা তো হতেই পারে। আমার আপত্তি নেই।'

উঠে দাঁড়ালো কিশোর। তার ইশারায় রবিন আর মুসাও উঠলো।

'আমরা কাগজওয়ালাদের কিছু বলবো না,' কথা দিলো কিশোর। মীটিং শেষ হয়ে আসছে বুঝেই যেন তাড়াতাড়ি, সবার আগে বেরিয়ে যেতে চায়, বাইরের কার পার্কে, যেখানে লিমুজিন নিয়ে অপেক্ষা করছে হোফার। 'তাহলে, যদি অনুমতি দেন, মিস্টার বেকার, আমরা এখন যাই।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' উঠে দাঁড়ালো বিজ্ঞাপন ম্যানেজার। 'তোমাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে থাকলাম, কিশোর পাশা।' হাসিটা ঠিকই রয়েছে মুখে, তবে কণ্ঠস্বরে কৃতজ্ঞতার ছিটেফোঁটাও নেই। 'বুদ্ধিমান ছেলে তুমি, দারুণ গোয়েন্দা। তোমার সাহায্য না পেলে একটা সাংঘাতিক ভুল হয়ে যেতো। ঠকানো হতো নেলিকে।'

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে দুই সহাকারীকে নিয়ে বেরিয়ে এলো কিশোর। পেছনে দরজাটা বন্ধ করে দেয়ার আগে চট করে ফিরে তাকালো একবার। চেয়ারে হেলান দিয়ে স্বস্তির হাসি হাসছে বেকার, হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মড়ার খুলির মুখেও। চোখ নামিয়ে রেখেছেন সাইনাস, কোটে লেগে থাকা ময়লা নখ দিয়ে খুঁটে পরিষ্কারের চেষ্টা করছেন। ভুরু কুঁচকে জানালার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সিকিউরিটি ম্যান।

লিফট লোকে বোঝাই। নীরবে নেমে এলো তিন গোয়েন্দা। লবি থেকে বেরোনোর আগে কথা বলার সুযোগ পেলো না রবিন আর মুসা।

'ওদেরকে এভাবে ছেড়ে দিলে?' রাগ করে বললো মুসা। সে বিশ্বাস করতে পারছে না। কোনো কেসে কিশোর কোনো অপরাধীকে ছেড়ে দেয়নি। অথচ আজ তা-ই করে এলো! মুসার ধারণা, হ্যারিস বেকার প্রথম থেকেই জানতো যে মড়ার খুলি নকল। সে-জন্যেই লোকটা ধরা পড়ার পরও তাকে ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে।

'হ্যাঁ,' মুসার সঙ্গে সুর মেলালো রবিন, সে-ও রেগেছে, 'কেন ছাড়লে? আর নেলির ব্যাপারটাই বা কি? তুমিই আমাদেরকে বললে, সে স্যান ফ্র্যান্সিসকোয় যায়নি। বললে, ও বিপদের মধ্যে রয়েছে।'

'হ্যাঁ,' রবিনের কথার পিঠে বললো মুসা। রেগেছে তো বটেই, অবাকও মনে হচ্ছে এখন তাকে। 'কি ভাবছো তুমি, কিশোর?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে ফিরে তাকালো গোয়েন্দাপ্রধান। 'আমি ভাবছি নেলির কথা। আজ সকালে আমাকে হুমকি দিয়ে ফোনটা পাওয়ার পর থেকেই ভাবছি।' ফোন পাওয়ার কথা আগেই দুই সহকারীকে বলেছে সে। 'ওর জন্যেই সমস্ত প্রশ্নের ভুল জবাব দিয়েছি আমি। যাতে নেলি জিততে পারে। এখনও ভাবছি তার কথাই।' রবিনের দিকে তাকালো সে। 'ও বিপদেই রয়েছে। তাকে বাঁচাতে হবে আমাদের। এসো।'

আর একটিও কথা না বলে তাড়াতাড়ি চত্বর পেরিয়ে এলো কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে এলো রবিন আর মুসা।

গাড়িতে বসে ম্যাগাজিন পড়ছিলো হোফার। কিশোর পেছনের দরজায় হাত দিতেই ফিরে তাকালো। হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যেতে হবে?'

'কোথাও না।' গাড়ির পেছনের সীটে উঠে বসলো কিশোর। রবিন আর মুসাও উঠলো। জানালা দিয়ে হ্যারিস বেকারের হলুদ সিত্রোঁ গাড়িটার দিকে তাকালো সে। 'আরেকটু বোধহয় পিছানো দরকার। তাহলে ওদের চোখে না পড়েও গাড়িটার ওপর চোখ রাখতে পারবো।'

'নিশ্চয়ই,' জবাব দিলো হোফার।

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে কার পার্কের পেছন দিকে গাড়ি পিছিয়ে আনলো সে। ওরা এখানে আছে একথা জানা না থাকলে সহজে কারো চোখে পড়বে না লিমুজিনটা এখন, অন্তত হলুদ গাড়িটার কাছ থেকে। অথচ ওরা এখান থেকে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে গাড়িটার তিমির মুখের মতো নাক।

'হ্যারিস বেকারের পিছু নেবো নাকি?' জিজ্ঞেস করলো হোফার।

তাকে নিরাশ করলো না কিশোর, আনমনে মাথা ঝাঁকালো। সীটে হেলান দিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। রবিন বুঝতে পারছে, এখন ওভাবেই কিছুক্ষণ নীরব আর রহস্যময় হয়ে থাকতে চায় গোয়েন্দাপ্রধান, চায় না তাকে বিরক্ত করা হোক।

কিন্তু তাকে ওভাবে থাকতে দিলো না রবিন। বললো, 'এই, চুপ করে আছো কেন? ভেবেছো পার পেয়ে যাবে। তা হতে দিচ্ছি না। অফিসে ওরকম করলে কেন, জলদি বলো।'

'হ্যাঁ,' রবিনের পক্ষ নিলো মুসা, 'জলদি বলো। কেন করলে?'

'বেশ।' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো কিশোর। এক আঙুল তুললো, 'এক নম্বর,' বেশ জোরেই বললো, যাতে হোফারও শুনতে পায়, 'নেলিকে শেষ কখন দেখেছি আমরা?'

'কাল রাতে, হলিউড বুলভারে,' জবাব দিলো রবিন। 'ওকে তুলে নিয়েছিলো বেকার।'

'সাথে ছিলো মড়ার খুলি,' যোগ করলো কিশোর। 'তারপর আজ সকালে সে আমাকে ফোন করলো কিশোর। হ্যারিস বেকারের গলা নকল করে আমাকে শাসালো, যদি আমি ফার্স্ট হই তাহলে নেলি দুর্ঘটনায় পতিত হবে। এ থেকে কি বোঝা যায়?'

'সে কোথাও আটকে রেখেছে নেলিকে,' বললো রবিন। 'বন্দি করেছে। তবে সেটা নিশ্চয় তার ম্যাগনোলিয়া আর্মসের বাসায় নয়। ওখানে অনেক লোকের বাস। চেঁচামেচি করে বা অন্য কোনোভাবে লোকের দৃষ্টি আর্কষণ করে ফেলবে তাহলে নেলি।'

'ঠিক,' কিশোর বললো।

'কিন্তু এখন তো কুইজ শো জিতেছে,' মুসা বললো, 'আর জালিয়াত বলে চিহ্নিত হয়ে গেছে মড়ার খুলি, এখন আর নেলির কি বিপদ? ছেড়ে দেবে না?'

'না।' কেন ছাড়বে না বুঝিয়ে দিলো গোয়েন্দাপ্রধান, 'ওই অফিসে যা-ই বলে থাকুক, একা কাজ করছে না মড়ার খুলি। কেউ তাকে ধরে এনেছে ওই রোলে অভিনয় করার জন্যে। তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে। পাগলদের ব্যাপারে সব মুখস্থ করিয়েছে। যেমন, তাকে বলা হয়েছে, অভিনয়ের সম্মানী হিসেবে শুক্রবারে নগদ টাকা দেয়া হতো আমাদেরকে। বাদামী খামে ভরে, লাল সুতোয় বেঁধে। তাকে বলে না দিলে ওরকম তথ্য হাজার চেষ্টা করেও নকল মড়ার খুলির জানার কথা নয়। তার জানার কথা নয় যে, জনাব গণ্ডগোলের গাড়িটা ছিলো একটা পিয়ার্স-অ্যারো কনভার্টিবল, টোয়েন্টি নাইন মডেলের। এসব কথা নিশ্চয় বলে দেয়া হয়েছে তাকে।'

'তারমানে তার সহযোগী আছে,' বুঝতে পারলো রবিন।

'আছে। আর সেই সহযোগীই নেলিকে কিডন্যাপ করতে তাকে সাহায্য করেছে। এখন ওকে কিছুতেই ছাড়বে না ওরা। কারণ নেলি জানে সেই সহযোগী লোকটি কে। জালিয়াতির চেয়ে কিডন্যাপিং অনেক বড় অপরাধ। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে যাবে।'

'হ্যারিস বেকার। মড়ার খুলিকে সে-ই ছেড়ে দিয়েছে। শুরু থেকে সব শয়তানী সে-ই করে আসছে।'

'কিশোর, তাই?' মুসা জিজ্ঞেস করলো। 'বেকারের বাড়িতে আটকে রাখেনি তো নেলিকে?'

জবাব দিলো না কিশোর। চোখ তার হলুদ গাড়ির দিকে এগিয়ে যাওয়া লোকটার দিকে। গাড়িতে উঠে বসলো সে। এঞ্জিন স্টার্ট দিলো। তারপর বেরিয়ে যেতে লাগলো পার্ক থেকে।

'না,' মুসার প্রশ্নের জবাবে বললো কিশোর, 'হ্যারিস বেকার নয়। সে বিজ্ঞাপনের

লোক। কিসে কিসে স্টুডিওর ক্ষতি হবে ভালো করেই জানে। সে স্টুডিও আর নেটওয়ার্ককেই বাঁচাতে চেয়েছে। সে জানতো না যে মড়ার খুলি নকল। এমন এক লোক মড়ার খুলির ওস্তাদী করেছে, ছবির প্রতিটি ইঞ্চি যার জানা। কোথায় কি আছে না আছে মুখস্থ। সেই লোকই নেলিকে কিডন্যাপ করতে সাহায্য করেছে মড়ার খুলিকে। এবং সেই লোকই এখন ওই হলুদ গাড়িটা চালাচ্ছে।'

'কে?' দেখার জন্যে রবিন আর মুসাও সামনে ঝুঁকে পড়লো।

হোফার পিছু নিয়েছে। হলিউড বুলভারের কাছে মোড় নেয়ার সময় ক্ষণিকের জন্যে হলুদ গাড়ির গতি শ্লথ হলো। সেই সুযোগে ওটার একেবারে কাছে চলে গেল লিমজিন।

ধীরে সুস্থে বোমাটা ফাটালো গোয়েন্দাপ্রধান, 'রাফায়েল সাইনাস'।

চোদ্দ

মোড় নিয়ে বেভারলি হিলের গিরিখাতগুলোর দিকে এগিয়ে চললো হলুদ গাড়িটা।

ধীরগতি, সাবধানী ড্রাইভার সাইনাস। বৃদ্ধ পরিচালকের সন্দেহ না জাগিয়েও তাঁর পিছে লেগে থাকতে অসুবিধে হলো না হোফারের।

এঁকেবেঁকে চলে গেছে পথ, ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে, তারপর একসময় ঢুকে গেল পাহাড়ের মধ্যে। বাড়িঘর এখন অনেক দূরে দূরে। আকারেও বড় এখন ওগুলো। বিরাট বিরাট এলাকা নিয়ে একেকটা বাড়ি, প্রাসাদের মতো, পাথরের দেয়ালে ঘেরা। ওগুলো সিনেমার লোকদের বাড়িঘর। তবে এখনকার নয়, আগের, যখন সিনেমা কোম্পানিগুলো হঠাৎ করে অনেক টাকা কামাতে শুরু করেছিলো। এই পথে যাতায়াতের জন্যে বিশেষ বাসের ব্যবস্থা আছে। বাস বোঝাই হয়ে আসে ট্যুরিস্টরা। ওসব বাড়ির সামনে কিছুক্ষণের জন্যে থামে। আর বলে দেয় ড্রাইভাররা কোনটা কার বাড়ি, কোন পাথরের দেয়ালের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকতো সিনেমা-দর্শকদের অতি-পরিচিত কোন প্রিয় মুখটি।

কিশোর জানে, এখন বেশির ভাগ বাড়িই আসল মালিকের হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন এগুলোর মালিক ব্যাংক, তেল কোম্পানি, আর আরব শেখেরা। সিনেমার লোকেরা সরে চলে গেছে বেভারলি হিলের ভেতরের 'চ্যাপ্টা অঞ্চল' নামে পরিচিত এলাকায়।

গতি কমালো হোফার। মোড় নিয়ে একটা খোলা গেটের ভেতরে ঢুকছে হলুদ গাড়ি। মোড়ের কাছে এসে থেমে গেল সে।

'এখন কি করবো?' কিশোরের দিকে ফিরে তাকালো হোফার। 'ঢুকবো?'

'না, থ্যাংক ইউ।' পেছনের দরজা খুলে রাস্তায় নামলো গোয়েন্দাপ্রধান। 'নিশ্চয় তাঁর বাড়িতে অনেক লোক। গার্ড, চাকর-বাকর, মালি। আমাদেরকে ঢুকতে দেখলে সর্তক হয়ে যাবে। তুমি এখানেই থাকো, আমরা যাই। নেলিকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে জানার চেষ্টা করবো।'

'ঠিক আছে।' ম্যাগাজিন বের করলো হোফার। 'গুড লাক। সাহায্যের দরকার পড়লে ডেকো।'

ওকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে দেয়ালের ধার ঘেঁষে রওনা হলো কিশোর। সাথে চললো রবিন আর মুসা।

গেট খোলাই রয়েছে। বন্ধ করতে এলো না কোনো দারোয়ান। কাউকে চোখেও পড়লো না। সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বেকারের হলুদ গাড়িটা। কেমন যেন অবাস্তব লাগছে ওটা ওখানে। দক্ষিণাঞ্চলের এই পরিত্যক্ত প্রাসাদটায় আধুনিক সিত্রোঁ বেমানান।

নীরব হয়ে আছে সব কিছু। প্রচুর পয়সা খরচ করে তৈরি হয়েছিলো এই প্রাসাদ, কিন্তু এখন মনে হয় এটাকে সংস্কারের পয়সাও আর নেই। এখানে ওখানে প্লাস্টার খসে পড়েছে, মেরামত করতে পারছে না। রঙ চটে গেছে, নুতন রঙ করা হয়নি। সিঁড়ির পাশে ঘাস গজিয়ে উঠেছে, সাফ করা হয়নি। আশপাশে ঝোপঝাড় বেড়ে উঠেছে বেয়াড়াভাবে।

গেটের ডান পাশ থেকে একসারি গাছ চলে গেছে বাড়িটার দিকে। ইশারায় সহকারীদেরকে কাছের গাছটা দেখালো কিশোর। গাছের গোড়ায় ঘাস এতো লম্বা হয়েছে, হুমড়ি খেয়ে ওরা বসে পড়লে স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকতে পারবে। আড়ালে আড়ালে এগোতেও পারবে।

'খাইছে!' বিড়বিড় করলো মুসা। 'এখনও এখানে লোক থাকে? এ-তো ভূতের বাড়ি!'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। আগে বাড়িটা কেমন ছিলো কল্পনা করার চেষ্টা করছেঃ ছিমছাম লন, রঙিন বাগান, উজ্জ্বল রঙের বীচ-চেয়ার, নতুন সাদা রঙ করা খিলান আর অসংখ্য স্তম্ভ, ঝকঝকে জানালা কাজ।

কিন্তু কতো আর বয়েস হয়েছে বাড়িটার? চোদ্দ-পনেরো বছর হবে। ক্ষতিটা বেশি করেছে প্রকৃতি। মাঝে মাঝেই কোনোরকম জানার না দিয়ে আচমকা ধেয়ে আসে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বন্যা, লাভার মতো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামে গলিত কাদার ঢল। তার ওপর রয়েছে প্রচণ্ড কড়া রোদ, আর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের গাছপালা, বাগান আর বাড়িঘরের সাংঘাতিক ক্ষতি করে। যত্ন করতে না পারলে দ্রুত নষ্ট করে একেবারে ধ্বংস্তূপে পরিণত করে ফেলে। পাগল সংঘ যখন পরিচালনা করতেন সাইনাস, তখনও

নিশ্চয় এটা ছিলো একটা জমকালো প্রাসাদ। এখন প্রায় শেষ অবস্থা।

আরেকটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলো কিশোর, দারোয়ান-বেয়ারা-মালি বহুকাল আগে বিদায় হয়ে গেছে এখান থেকে। সাইনাস নিশ্চয় একেবারে একা থাকেন এখন, আর হয়তো কাল থেকে রয়েছে নেলি।'

'এসো,' সহকারীদের বললো সে। 'লুকোচুরির আর দরকার নেই। সোজা গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে সাইনাসকে ডাকবো। কথা বের করে নেবো তাঁর মুখ থেকে।'

একমত হলো দুই সহকারী গোয়েন্দা। বৃদ্ধ সাইনাসের কাছ থেকে ভয়ের কিছু নেই।

ইলেকট্রিক কলিং বেল নিই। দরজার পাশে রাখা একটা পিতলের পুরানো আমলের ঘন্টা আর কাঠের হাতুড়ি রাখা। সেটা তুলে নিয়ে ঘন্টায় বাড়ি মারলো কিশোর। সাথে সাথে খুলে গেল দরজা। তাদের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন সাইনাস।

'কিশোর পাশা,' তিনি বললেন, 'তোমরা আসবে জানতাম। পুরস্কার নিতে। কাপ-রহস্যের সমাধান করে দিলে দেবো বলেছিলাম যে। এসো, ভেতরে এসো।'

ভেতরে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা। পেছনে দরজা লাগিয়ে দিলেন সাইনাস। মস্ত একটা হলঘর, আবছা আলো। এতোবড় ঘরটায় আসবাব বলতে কিছু নেই, শুধু দুটো পুরনো ক্যানভাসের চেয়ার আর একটা নড়বড়ে ডেস্ক ছাড়া।

দেয়ালে চোখ পড়লো কিশোরের। ফ্রেমে বাঁধাই অসংখ্য ফটোগ্রাফ, সুদর্শন তরুণ আর সুন্দরী তরুণীদের। সিনেমা আর টেলিভিশনের কয়েকজন অভিনেতাকে চিনতে পারলো সে। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের বড় বড় অভিনেতা তাঁরা।

ছবির দিকে কিশোরকে তাকিয়ে থাকতে দেখলেন সাইনাস। পিঠ সোজা করলেন। মুহূর্তে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন তিনি, একজন সফল মানুষ, ওই ছবিগুলোর মতোই। 'ওরা আমার পুরানো বন্ধু,' বললেন তিনি। 'স্টুডিও আমাকে অপমান করে পাগল সংঘের মতো ছবি তৈরি করতে দেয়ার আগে, ওসব বড় বড় অভিনেতার ছবি পরিচালনা করেছি আমি। বললে বিশ্বাস করবে, এদের অনেকেই অভিনয় শিখেছে আমার কাছে?' গলা চড়লো পরিচালকের, গমগম করে উঠলো হল জুড়ে, 'শিখিয়েছি কি করে কি করতে হয়। নরম কাদার মতো ছাঁচে ফেলে ওদের গড়েছি আমি। সৃষ্টি করেছি।'

কেঁপে উঠলো রবিন। জানালার কাঁচ ভাঙা, সেগুলো দিয়ে বাতাস আসছে বটে, তবে কেঁপে ওঠার মতো শীত নয় ঘরে। তবু কেমন যেন গা ছমছমে একটা পরিবেশ, অনেকটা পুরনো, ভাঙা কবরখানার মতো, যেন অতীতের মানুষের ভূত হয়ে উঠে এসে ঘোরাফেরা করছে চারপাশে।

'হ্যাঁ, আসল কথা বলি,' সাইনাস বললেন, 'পুরস্কার। আমার কাছে নগদ টাকা নেই এখন, তবে বিজ্ঞাপন বিভাগ…'

বাধা দিয়ে কিশোর বললো, 'পুরস্কারের জন্যে আসিনি আমরা।' গোয়েন্দাপ্রধানেরও যে অস্বস্তি লাগছে তাঁরই মতো এটা বুঝতে পারলো রবিন কণ্ঠস্বর শুনেই। 'নেলিকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'নেলি? মানে বটিসুন্দরী?' মলিন জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকালেন সাইনাস। 'এখানে আছে কে বলো তোমাকে?'

'কাল রাতে হলিউড বুলভার থেকে তাকে তুলে নিতে দেখেছি আপনাকে,' মুসা বললো। 'মড়ার খুলি আর নেলি আপনার গাড়িতে উঠছে…'

'অসম্ভব,' হাসার চেষ্টা করলেন পরিচালক। 'এখন কোনো গাড়িই নেই আমার। রোলস রয়েসটা গ্যারেজে। আর আমার…'

'বাইরের গাড়িটা আমার বিশ্বাস,' কিশোর বললো, 'হ্যারিস বেকারের। কিংবা বিজ্ঞাপন বিভাগের। কুইজ শো পরিচালনার সময়টাতে আপনাকে ব্যবহার করতে দিয়েছে। খানিক আগে আপনাকে চালিয়ে আনতে দেখলাম। কাল রাতে নেলি আর মড়ার খুলিকেও তুলে নিতে দেখেছি।'

প্রতিবাদ তো করলেনই না, এবার আর হাসারও চেষ্টা করলেন না সাইনাস। ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে গিয়ে বসে পড়লেন একটা ক্যানভাসের চেয়ারে। বেরিয়ে এলো ক্ষোভ, 'একটা লিমুজিন পর্যন্ত ওরা ভাড়া করে দেয়নি আমাকে। কুইজ শো পরিচালনার জন্যে যতোটা কম টাকা দেয়া সম্ভব, দিয়ে কাজটা করিয়ে নিয়েছে ওরা। প্রায় ভিখিরির মতো হাত পেতে বেকারের কাছ থেকে গাড়িটা চেয়ে নিয়েছি ক'দিন ব্যবহারের জন্যে। কিংবা বলা যায় হুমকি দিয়ে নিয়েছি। যদি গাড়ি না দেয়, তাহলে কুইজ শো পরিচালনা করবো না বলে। পাগল সংঘের পরিচালককে বাদ দিয়ে…' থেমে গেলেন আচমকা। হাঁটুর দিকে চোখ। সুতো-ওঠা প্যান্টের একটা সুতো টানছেন আনমনে। 'নেলিকে আমি কিডন্যাপ করিনি। তুমি ভুল করছো।'

'প্লীজ, মিস্টার সাইনাস,' নরম গলায় অনুরোধ করলো কিশোর, 'যদি কিছু জানা থাকে আপনার, বলুন। আমরা জানি, নেলি ওই চিঠি বেকারকে লেখেনি। নিজের ইচ্ছেয় কুইজ শোতে অনুপস্থিত থাকেনি। এখন তাকে না পেলে পুলিশের কাছে যেতেই হবে আমাদের। পুলিশ এসে সারা বাড়ি খুঁজবে।'

'নেলি এখানে অবশ্যই আছে,' মাথা তুললেন পরিচালক। আবার সেই আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর ফিরে এসেছে। 'আমার মেহমান হয়ে এখানে আছে সে। ওকে আমি বড় অভিনেত্রী বানাবো। ধনী, বিখ্যাত বানিয়ে ছাড়বো।' উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে হাত তুললেন তিনি। 'এই মানুষগুলোর মতো, যারা ওদের সবকিছুর

জন্যে আমার কাছে ঋণী। সিনেমায় অভিনয় করিয়ে নেলিকে আমি...'

'চুপ করো বুড়ো ভাম। বেকুব কোথাকার।'

দরজার কাছ থেকে ভেসে এলো কঠিন কণ্ঠ। ফিরে তাকালো তিন গোয়েন্দা। সোনালি চুলওয়ালা, চামড়ার জ্যাকেট পরা তরুণ ঢুকে পড়েছে ভেতরে।

পনেরো

'একদম চুপ!' সাইনাসের দিকে তাকিয়ে আবার ধমক দিলো নকল মড়ার খুলি। 'তোমার সব কথাই শুনেছি। আমাকে এসবে ঢুকিয়েছো তুমি। কাপগুলো চুরি করিয়েছো। আমাকে দিয়ে। বলেছো আধা বখরা দেবে। পুরস্কার যাতে জিততে পারি তার জন্যে সব প্রশ্নের জবাব শিখিয়ে দিয়েছো। এখন আমি কি কচুটা পেয়েছি? কিচ্ছু না।'

কিশোরের দিকে তাকালো মড়ার খুলি। 'সব কিছুর মূলে এই বুড়ো। হলিউডের এক থিয়েটারে কাজ করতাম আমি। স্টেজের পেছন দিয়ে ঢুকে আমার সঙ্গে দেখা করে বহুত ফোলালো, বললো, আমি নাকি খুব ভালো অভিনেতা। আমার অভিনয়ের তুলনা হয় না।'

পকেটে হাত ঢোকানো রয়েছে সাইনাসের। বিসণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। 'হ্যাঁ, সত্যিই মিথ্যে কথা বলেছি। কোনোদিনই বড় অভিনেতা হতে পারবে না তুমি, এমনকি আমার সাহায্য পেলেও না।'

তার কথা যেন কানেই ঢুকলো না মড়ার খুলির। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'বেকারের অফিসে সব কথা খুলে বলতে পারিনি। অসুবিধে ছিলো। আমি জানি সাইনাস এখানে একটা ঘরে নেলিকে তালা আটকে রেখেছে। কিডন্যাপিঙের সাজা আমার জানা আছে। পুলিশকে হাজার বোঝালেও ওরা বুঝতে চাইবে না, বলবে আমিও এর সঙ্গে জড়িত। আসলেই তো তাই। এই বুড়োর কথায়ই কাল নেলিকে ফোন করে রাতে আমার বাসায় দেখা করতে বলেছি। বলেছি, হ্যারিস বেকার আমাদের দু'জনের সঙ্গে কথা বলতে চায়। গোপনে। শুধু আমাদের দু'জনের সঙ্গে, আর কারো সাথে না। এবং একথা যেন আমরা কাউকে না জানাই। বেকার আমাদেরকে হলিউড বুলভার থেকে তুলে নেবে।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। তার ধারণার সাথে মিলে যাচ্ছে মড়ার খুলির কথা। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছে না, এতো কিছু করে বিনিময়ে কি পেতে চেয়েছিলো এই লোকটা?

'আসলে নেলিকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম,' বলে গেল মড়ার খুলি। 'যাতে সে

আমাকে টেক্কা দিয়ে বাজি জিততে না পারে। এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিলাম। নেলির কথা বলে তোমাকেও ঠেকাতে চেয়েছিলাম।'

'তো এখন কি চান?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

'চুক্তি,' মড়ার খুলি বললো। 'তোমার সঙ্গে একটা চুক্তি করতে চাই। নেলির কাছে নিয়ে যাবো তোমাদেরকে। তারপর,' হাসলো সে, 'তারপর আমরা সবাই মিলে তাকে উদ্ধার করবো। আমার পক্ষ হয়ে কথা বলবে তুমি। বলবে, তোমাদেরকে নিয়ে আমিই এসেছি তাকে বের করে নিয়ে যেতে। তোমার কথা বিশ্বাস করবে ও। কারণ পুরস্কারটা ইচ্ছে করেই তাকে জিতিয়ে দিয়েছো তুমি।'

দুই সহকারীর দিকে তাকালো কিশোর। এই চুক্তি করার অধিকার তার নেই। সাইনাস আর মড়ার খুলির বিরুদ্ধে যদি কেস করে দেয় নেলি, পুলিশ জানবেই। পুলিশ তাকে জিজ্ঞেস করবে। তখন মিথ্যে কথা বলতে পারবে না সে।

অথচ এখন যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় নেলিকে মুক্ত করাও দরকার। তারপর পুলিশের কাছে যাওয়া সেটা তার ব্যাপার।

মাথা ঝাঁকালো মুসা।

আরও এক সেকেন্ড দ্বিধা করে রবিনও সায় দিলো।

'বেশ,' কিশোর বললো, 'আমি ওকে বোঝানোর চেষ্টা করবো যে আপনি ওর কোনো ক্ষতি করতে চাননি। বলবো, আপনি এখানে এসেছেন ওকে মুক্ত করতে। এরপর যা করার নেলি করবে, আমি আর কিছু বলতে পারি না। ও কোথায়?'

'ওপরতলায়। এদিক দিয়ে এসো। একটা বেডরুমে ওকে তালা আটকে রেখেছে বুড়োটা।' এক পা এগিয়েই থেমে গেল মড়ার খুলি।

জ্যাকেটের পকেট থেকে সাইনাসের ডান হাত বেরিয়ে এসেছে। সে হাতে উদ্যত একটা ছোট কালো পিস্তল। 'না, তোমরা যেতে পারবে না! নেলি এখানে আমার সাথে থাকবে!'

দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছেন তিনি। মাথা উঁচু। রাফায়েল সাইনাসের সেই তখনকার চিত্রটা মনে পড়লো কিশোরের, পাগল সংঘ পরিচালনার সময় যেরকম আস্থার সাথে দাঁড়াতেন তিনি, তাকাতেন।

'ওকে দিয়ে আমি একবার অভিনয় করিয়েছিলাম,' ভারি গলায় বললেন পরিচালক, 'আরেকবার করাবো। ওর প্রতিভা আছে। ওকে দিয়ে হবে। হবেই। অনেক, অনেক বড় অভিনেত্রী আমি বানাবো ওকে। ছবি বানিয়ে অসকার জিতবো। আরেকবার বিখ্যাত হবো আমি।'

সাইনাস আর তার মাঝের দূরত্বটা আন্দাজ করলো মুসা। ওর একটা বিশেষত্ব, ডাইভ দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়া। মাথা নিচু করে এভাবে গিয়ে শত্রুর হাঁটুতে কিংবা পেটে

পড়ে দুই বন্ধুকে নিয়ে কতোবার বেঁচে এসেছে। বেরিয়ে এসেছে বিপদ থেকে।

কিন্তু এবার সেটা করতে পারবে বলে মনে হলো না। দূরত্ব অনেক বেশি। আর দৌড়ে গিয়েও সুবিধে করতে পারবে না, সে গিয়ে পৌছানোর আগেই বুলেট এসে লাগবে তার গায়ে।

মুসার মনোভাব বুঝতে পেরে হাত তুলে তাকে সতর্ক করলো কিশোর। বললো, 'মিস্টার সাইনাস, আমি জানি গুলি করা আপনার উদ্দেশ্য নয়। গুলি করতে পারবেন না। আপনি খুনী নন। একজন পরিচালক, অনেক বড় পরিচালক। আপনি...'

'এতো বিশ্বাস করো না,' বাধা দিলো মড়ার খুলি। 'ও পাগল। যা খুশি করে বসতে পারে তোমার চেয়ে আমি ওকে ভালো চিনি। কুইজ শোর পুরস্কারে ভাগ পেলে কি করতো জানো? পার্টি দিতো। ওর মতো ফতুর হয়ে যাওয়া বেকুব বুড়োগুলো দাওয়াত করে আনতো। ওর মতোই ওরাও কোনোমতে ধুঁকে ধুঁকে টিকে আছে। জিপসি অর্কেস্ট্রাদলকে ভাড়া করতো, পত্রিকার রিপোর্টারদের খবর দিতো...'

'চুপ!' ধমকে উঠলেন পরিচালক। বাঁ হাত তুললেন। 'একেবারে চুপ! এখন একসারিতে দাঁড়াও সবাই। মাথার ওপরে হাত তোলো।'

সবার আগে আদেশ মানলো মড়ার খুলি। তার পেছনে লাইন দিয়ে দাঁড়ালো অন্য তিনজন।

'এখন,' সামরিক বাহিনীর কমান্ডারের মতো আদেশ দিলেন সাইনাস, 'আমি হাঁটো বললেই ডানে ফিরে মার্চ করে হেঁটে যাবে সিড়ির দিকে। রেডি?'

আবার আগে সাড়া দিলো মড়ার খুলি। মাথা ঝাঁকালো সে। তিন গোয়েন্দাও ঝাঁকালো।

'লাইট!' চিৎকার করে বললেন পরিচালক। 'ক্যামেরা! অ্যাকশন! মার্চ!'

যেদিকে যেতে বলেছেন তিনি, সেটা হলের পেছন দিক। সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছে কিশোর, নেমে যাওয়া সিঁড়ি। নিশ্চয় সিঁড়ির নিচে মাটির তলায় ঘর-টর কিছু আছে। ওখানে যদি আটকান ওদেরকে পরিচালক, যা ভুলো মন, হয়তো খাবার দিতেই ভুলে যাবেন। আশেপাশে কোনো বাড়িঘরও নেই যে চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসবে। বাঁচতে চাইলে এখনি কিছু করতে হবে।

ঠিক তার পেছনেই রয়েছে মুসা। কদম ছোট করে ফেললো কিশোর।

'এই, এই কিছু করো না,' আতঙ্কিত কণ্ঠে অনুরোধ করলো মড়ার খুলি। 'গুলিটা আমার গায়ে লাগবে।'

খিলানের কাছে পৌছে সিঁড়িতে পা রাখলো কিশোর।

'মার্চ!' পেছন থেকে চিৎকার করছেন সাইনাস। 'মার্চ! মার্চ মার্চ...'

হঠাৎ থেমে গেল কণ্ঠ। অস্ফুট একটা ভয়ার্ত শব্দ কানে এলো কিশোরের। একটা

থাতব জিনিস খটাং করে পড়লো মেঝেতে। এসব পরিস্থিতির আগেও পড়েছে তিন গোয়েন্দা, কি করতে হয় জানে। চোখের পলকে লাইন ভেঙে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লো ওরা।

প্রথমেই কিশোরের চোখে পড়লো পিস্তলটা পড়ে আছে দরজার কয়েক ফুট দূরে। তারপর দেখতে পেলো, যেন শূন্যে উঠে চার হাত-পা ছড়িয়ে সাঁতার কাটছেন সাইনাস। কোমর জড়িয়ে ধরে তাঁকে ওপরে তুলে ফেলেছে দুটো শক্তিশালী হাত।

এমনভাবে ধরেছে হোফার, যাতে ব্যথা না পান বৃদ্ধ পরিচালক। তাঁকে নিয়ে গিয়ে একটা ক্যানভাসের চেয়ারে বসিয়ে দিলো সে। 'এখানে চুপ করে বসুন, মিস্টার সাইনাস। কিশোর, পিস্তলটা তুলে নাও। সেফটি ক্যাচ অন করে দিয়ে পকেটে ভরে রাখো।'

যা বলা হলো করলো কিশোর। মড়ার খুলির দিকে তাকালো। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ অভিনেতা। মুখ সাদা। অল্প অল্প কাঁপছে।

'থ্যাঙ্ক ইউ, হোফার,' কিশোর বললো।

'ওকে চোরের মতো ঢুকতে দেখলাম এখানে,' মড়ার খুলিকে দেখিয়ে বললো হোফার। 'তখনই সন্দেহ হলো। ভাবলাম, কি করে দেখি তো।'

'ভালো করেছো।' বলে মড়ার খুলির দিকে ফিরলো কিশোর। 'আসুন। নেলিকে কোথায় রেখেছে দেখান।'

তখনও সুস্থির হতে পারেনি তরুণ অভিনেতা। তবে কিশোরের কথামতো এগিয়ে চললো দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির ওপরে উঠে দেখা গেল লম্বা করিডর, ধুলোয় ঢাকা। ঘরের দরজার বাইরেই চাবিটা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো কিশোর।

তক্তা দিয়ে বন্ধ করে রাখা একটা জানালার পাশে ক্যানভাসের চেয়ারে বসে আছে নেলি। মুখে রুমাল গোঁজা। হাত বাঁধা চেয়ারের হাতলের সঙ্গে, পা বাঁধা পায়ার সঙ্গে।

তাকে ওই অবস্থায় দেখেই অস্ফুট শব্দ করে উঠলো মড়ার খুলি। 'আমি ভাবতেই পারিনি,' সে বললো, 'এভাবে বেঁধে রাখবে। জানলে···জানলে কখনোই এখানে আনতে দিতাম না।'

ওর কথা বিশ্বাস করলো কিশোর। গত কয়েক মিনিটে তার যা আচরণ দেখেছে, তাতে বুঝতে পেরেছে মড়ার খুলি কঠোরতা যা দেখিয়েছে আগে, সব মেকি, অভিনয়। আস্ত একটা ভীতু।

আবার দুর্বল ভঙ্গিতে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে মড়ার খুলি। তাকে দিয়ে কিছু হবে না। দ্রুত গিয়ে নেলির বাঁধন খুলে দিলো তিন গোয়েন্দা।

মাথা ঝাড়া দিয়ে যেন মাথার ভেতরটা পরিষ্কার করে নিতে চাইলো নেলি। হাতের

বাঁধনের জায়গা ডললো। মুখের ওপর এসে পড়া চুলগুলো হাত দিয়ে ঠেলে সরালো পেছনে। পা টানটান করে, ঝাড়া দিয়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলো।

উঠে দাঁড়াতে বেশ কষ্ট হলো তার। হাসলো। 'বেশ একটা মজার কাণ্ড হয়ে গেল, না? আমাদের সেই পুরনো পাগল সংঘ ছবির মতো। শুধু একটা ব্যাপার উল্টো হয়েছে। ওখানে আমি তোমাকে বাঁচাতাম, কিশোর, আর এখানে তুমি আমাকে বাঁচালে।'

ষোলো

'পুরস্কারের টাকা পেয়ে এতো খুশি হয়েছে নেলি,' কিশোর বললো, 'মিস্টার সাইনাস বা মড়ার খুলি, কারো বিরুদ্ধেই অভিযোগ করেনি।'

'এখন সে কলেজে যেতে পারবে,' রবিন বললো। 'যা সে চাইছিল। টাকার জন্যে পারছিলো না এতোদিন।'

'সেপ্টেম্বরেই বার্কেলিতে ভর্তি হবে,' মুসা জানালো।

প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে মুখ করে থাকা জানালার সারিওয়ালা, ভিকটর সাইমনের মস্ত লিভিং রুমে বসেছে তিন গোয়েন্দা। মিস্টার সাইমনের অনুরোধেই কাপচুরির কেসের গল্প বলতে ওরা এসেছে এখানে। তিনিই ফোন করেছিলেন হেডকোয়ার্টারে, সাইনাসের মুখে কাপ চুরি যাওয়ার খবর শুনে বেশ আগ্রহী হয়েছিলেন সব কথা জানার জন্যে।

টেবিলের পাশে রাখা একটা লম্বা বীচ-চেয়ারে আরাম করে বসেছেন বিখ্যাত রহস্য-কাহিনী লেখক। 'তাহলে আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেছে নকল মড়ার খুলি? থিয়েটারে অভিনয় করতে?'

'গেছে,' হাত নাড়লো কিশোর, 'তবে আমার মনে হয় না এবারেও সুবিধে করতে পারবে। বেঁচে থাকার জন্যে এখনও তাকে মোটর মেকানিকের কাজই করতে হবে।'

এক মুহূর্ত থেমে বললো গোয়েন্দাপ্রধান, 'মজার ব্যাপার হলো, মড়ার খুলিকে দেখতে পারতাম না বলে তার ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেই ওই কুইজ শোতে অংশ নিয়েছিলাম। তাকে এতো বেশি ঘৃণা করতাম, চেয়েছিলাম যেভাবেই হোক পরাজিত করবোই। কিন্তু পরে গিয়ে যে মড়ার খুলিকে দেখলাম, তাকে পছন্দই করে ফেললাম। নেলির কোনো ক্ষতি করতে চায়নি সে এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ও শুধু রাফায়েল সাইনাসের কথামতো নেচেছে, টাকার লোভে যতোটা, তার চেয়ে বেশি বড় অভিনেতা হওয়ার লোভে।'

'হুঁ, অভিনেতা হওয়ার লোভে কতো লোকে যে কতো কিছু করে বসে,' ধীরে

মাথা দোলালেন সাইমন। 'তা রাফায়েল সাইনাস কি করছেন এখন? সেই পুরানো ভাঙা প্রাসাদেই কি ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে অতীতের স্বপ্ন দেখছেন?'

'না,' মুসা বললো। 'নেলিকে যখন আমরা নামিয়ে নিয়ে আসছিলাম, শুনলাম পাগলের মতো চিৎকার করছেনঃ চুপ, কোনো গোলমাল নয়! লাইট ক্যামেরা! অ্যাকশন! অনেক কষ্টে তাঁকে গাড়িতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেছে অ্যালউড হোফার।'

সমবেদনা দেখিয়ে মাথা ঝাঁকালেন লেখক। 'একসময় অনেক বড় পরিচালক ছিলেন তিনি। তাঁর তৈরি অনেক ছবি দেখেছি আমি, ভালো ভালো ছবি। এখনও কি হাসপাতালেই আছেন?'

'না,' কিশোর জানালো,' 'মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশনের লোকেরা এসে গেছে। অবসর পাওয়া, অক্ষম সিনেমার লোকদের জন্যে একটা কলোনি বানিয়েছে ওরা, সেখানেই জায়গা দিয়েছে তাঁকে। আর কিছু না পান, পুরনো বন্ধুদের দেখা সাক্ষাৎ ওখানে পাবেন সাইনাস, কথা বলে মনের ভার কিছুটা হলেও হালকা করতে পারবেন।'

'হ্যাঁ, তা পারবেন। তা হ্যারিস বেকার নিশ্চয় একেবারেই নিরপরাধ? সাইনাস আর মড়ার খুলির পরিকল্পনার কিছুই জানতো না?'

'না। ওই কুইজ শো-র ব্যবস্থা করে প্রমোশনের আশায় ছিলো বেকার। শো শেষ হলে সব জানার পর সেটা ফাঁস করে নিজের পায়ে কুড়াল মারতে চায়নি। তাই মড়ার খুলিকে ছেড়ে দিয়ে গোপন করতে চেয়েছে।'

'ভারিপদ আর শিকারী কুকুরের কি খবর?'

'অনেক দিন বেকার থাকার পর ভারিপদ একটা কাজ পেয়ে গেছে। একটা জুতোর কোম্পানি ওই কুইজ শো দেখে তাকে ডেকে নিয়ে গেছে, বিজ্ঞাপনের কাজ করার জন্যে। কাজটা পেয়ে খুব খুশি ভারিপদ। আর শিকারী কুকুর কলেজ শেষ করে আইন পড়বে। অসুবিধেয় পড়া, বেকার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের হয়ে আদালতে লড়াই করবে মুভি স্টুডিও আর টেলিভিশন নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে। হুট করে যেন আর কাউকে বিদায় করে দিতে না পারে ওরা।'

'ভালো, খুব ভালো,' মন্তব্য করলেন লেখক। রান্নাঘরের দিকে তাকালেন একবার। যেখানে হাড়ি-পাতিল নিয়ে খুটুর-খাটুর করছে তাঁর ভিয়েতনামি বাবুর্চি নিসান জাং কিম। তারপর আবার তিনগোয়েন্দার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর অ্যালউড হোফার? তার পরিচয় গোপন আছে তো?'

'নিশ্চয়ই,' মুসা বললো। 'ওর কথা কাউকে বলিনি আমরা। ছুটি শেষ হলে সেপ্টেম্বরে নিরাপদেই ইস্কুলে ফিরে যেতে পারবে।'

ইস্কুলের কথায় আবার রান্নাঘরের দিকে তাকালেন সাইমন। 'কিমও ইস্কুলে যাবে।'

'ইস্কুলে যাবে?' রবিন বললো। 'কি পড়বে?'

'রান্না। আপাতত ফরাসী রান্না। কোন্ কোন্ জিনিস খেলে শরীর-স্বাস্থ্য ভালো থাকে, সে-ভূত নেমেছে মাথা থেকে। নানারকম জটিল রান্নার দিকে ঝুঁকেছে আজকাল। এই যেমন, সাগরের শ্যাওলা দিয়ে মুখরোচক খাবার কি করে তৈরি করা যায়। অবশ্য হজম করতে কিছুটা কষ্টই হচ্ছে আমার।' সামনে ঝুঁকলেন তিনি। 'তোমরা কিন্তু দুপুরে না খেয়ে যেতে পারবে না। বিশেষ করে তুমি, মুসা।'

ঝট করে পরস্পরের দিকে তাকালো রবিন আর কিশোর। এর আগের বার যখন এসেছিলো, ওদেরকে গিনিপিগ আর শামুক খাওয়ানোর জন্যে অনেক জোর-জবরদস্তি করেছিলো কিম। কাজেই এখানে দাওয়াত খাওয়ার কথা শুনলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে দু'জনে।

'কেন, বিশেষ করে আমাকে কেন?' মুসাও অস্বস্তি বোধ করছে।

'কারণ, তোমাকে খুব পছন্দ করে কিম,' মুচকি হাসলেন লেখক। 'যা দেয় তা-ই মুখ বুজে খেয়ে ফেলো তো। বলে, রান্না করে যদি কাউকে মন মতো খাওয়াতেই না পারলাম তাহলে শান্তি কোথায়?'

কেশে উঠলো মুসা। 'স্যার, একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। কি খাওয়াবে না খাওয়াবে সেটা আপনি বলে দেন না কেন? আপনি পছন্দ করে দিলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়।'

'আমি জানতাম এক সময় না একসময় তোমরা একথা বলবে আমাকে।' চেয়ারের পাশে রাখা লাঠিটা তুলে নিয়ে তাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন লেখক, পা এখনও পুরোপুরি ঠিক হয়নি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন। 'ঝাল মাংসের পুর দেয়া হ্যামবার্গার খাওয়ার জন্যে আমার প্রাণটা কি কম আঁই-ঢাই করে? পারি না, বুঝলে, একদম পারি না। জোর করে কিছু বলতে গেলেই ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেয় কিম।'

'ও-কি, কোথায় যাচ্ছেন?' ভয় পেয়ে গেছে মুসা।

'বলে আসি, অন্তত প্লেন হ্যামবার্গার যাতে দেয়,' তবে বিনিময়ে তার কথা তোমাকে শুনতে হবে, মুসা।'

রান্নাঘর থেকে হাসিমুখে ফিরে এলেন সাইমন। 'হ্যামবার্গার দেবে।' আবার বসলেন চেয়ারে। নীরবে ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'তোমাদের কেসের গল্প সবটাই শুনলাম। একটা ব্যাপার পরিষ্কার হচ্ছে না এখনও।'

'কী?' সামনে ঝুঁকলো কিশোর।

'সাইনাসকে সন্দেহ করলে কেন?'

'সন্দেহটা জাগিয়েছে ভারিপদ। প্রথমে করিনি, কিন্তু যতোই ভাবলাম, ততোই ধারণাটা দৃঢ় হতে লাগলো যে কেউ না কেউ তাকে মুভি স্টুডিওতে পাঠিয়েছে। কোনো কাজে। সেটা দু'জন লোক হতে পারে। হ্যারিস বেকার, কিংবা রাফায়েল সাইনাস। হ্যারিস বেকারের, পাঠানোর কোনো কারণ নেই, সে বিজ্ঞাপন ম্যানেজার, চিঠি বা অন্য জিনিস আনা-নেয়ার জন্যে অফিসের লোকই আছে তার। বাকি থাকলেন সাইনাস। ভাবলাম, তিনিই বা কি আনতে পাঠাবেন? যতোই ভাবলাম, সন্দেহ ততোই বাড়তে লাগলো। তাছাড়া কিছুকিছু সূত্রও মিলে যেতে লাগলো তাঁর আচরণের সঙ্গে।'

'হুঁ, বুঝেছি,' মাথা ঝাঁকালেন প্রাক্তন গোয়েন্দা। 'তোমাকে যেমন আগে ডেকে এনেছেন টিভি স্টেশনে, তেমনি ভারিপদকেও এনেছেন। তাকে একটা চিঠি দিয়ে অযথা পাঠিয়েছেন স্টুডিওর অফিসে, আর তোমাকে বলেছেন তাকে সন্দেহ করেন। লিফটে করে উঠে সাইনাসের অফিসেই ঢুকেছিলো ভারিপদ, খাম নিয়ে বেরিয়ে এসে স্টুডিওতে রওনা হলো। তুমি পিছু নিলে।

'টেলিফোনের তার-টার ছিঁড়ে আগেই সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে রেখে এসেছিলেন সাইনাস। তুমি গিয়ে নয় নম্বর স্টেজে ঢুকতেই তালা লাগিয়ে দিলো মড়ার খুলি। তাকে ওকাজ করতে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন পরিচালক। তোমাকে আটকাতে চেয়েছিলেন, যাতে কুইজ শো-তে অংশ নিয়ে তুমি মড়ার খুলির পুরস্কার জেতায় বাধা হয়ে না দাঁড়াও।

'হুঁ, সব বুঝলাম। বড় বেশি খুঁতখুঁতে মন তোমার, কিশোর পাশা, এটা ভাবতেও পারেননি বেচারা পরিচালক।' রান্নাঘরের দিক থেকে আসা পায়ের শব্দ শুনে ঝট করে সোজা হলেন সাইমন। ফিসফিসিয়ে বললেন, 'ওই যে, আসছে!'

টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে, খবর দিলো কিম।

ভয়ে ভয়ে গিয়ে বসলো সবাই। তবে গন্ধ ভালোই আসছে। একটা প্লেটের ঢাকনা তুলে দেখালো কিম। ইয়া বড় বড় চারটে হ্যামবার্গার। ভেতরে গরুর মাংসের কিমা। আর পেঁয়াজের কুঁচি। লোভনীয় গন্ধ বেরোচ্ছে ওগুলো থেকে।

একটা নিয়ে কামড় বসালো মুসা।

'ভালো না?' জিজ্ঞেস করলো কিম।

'চমৎকার। ফার্স্ট ক্লাস।'

'গুড!' খব খুশি হলো বাবুর্চি। বললো, 'এবার আমার একটা উপকার করতে হবে।'

'নিশ্চয়ই ক...,' বলেই মাঝপথে কামড় থামিয়ে কিমের দিকে তাকালো গোয়েন্দা-সহকারী। 'কি-কি উপকার!'

'কিছু না,' আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাত নাড়লো কিম। 'এই একটু চেখে দেখতে হবে আরকি। একটা প্রাচীন খাবারের উল্লেখ দেখলাম একটা চীনা খাবারের বইয়ে। লোভ সামলাতে না পেরে রেঁধেই ফেললো। আর কেউ তো খেতে জানে না, খেতে বললেও রাজি হয় না। তাই তোমাকে অনুরোধ করছি। দয়া করে যদি...'

'তা জিনিসটা কি?'

'না, তেমন কিছু না। খুব ভালো খাবার বলেই মনে হয় আমার। তুমি যদি খেয়ে ভালো বলো, আমিও খাবো। হাজার হোক, প্রোটিন যখন বেশি...'

'অতো ভণিতা করছো কেন? দেখি, ঢাকনা তোলো।'

ঢাকনা তুললো কিম। মাংস ভাজি। গন্ধটা বেশ চমৎকার।

হাসি ফুটলো মুসার মুখে। 'তা এর জন্যে এতো অনুরোধ? দাও দেখি, খাই। মাংসই তো, কি আর হবে খেলে? শুয়োরটুয়োর না হলেই হলো। ওটা ভাই খেতে পারবো না, ধর্মে মানা।'

'না না শুয়োর না, শুয়োর না। এই নাও,' প্লেটটা ঠেলে দিলো কিম।

একটুকরো মুখে দিয়ে দেখলো মুসা। চিবাতে চিবাতে মাথা নাড়লো, 'হুঁ, মন্দ না।' আরও কয়েক টকুরো খেয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তা কিসের মাংস এটা?'

হাসলো কিম। প্লেটটা সরিয়ে নিলো মুসার সামনে থেকে। বললো, 'থাক, আর খেতে হবে না। বুঝেছি, রান্না ভালো হয়েছে।'

'কিসের মাংস?' আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'তুমি খাবে?'

'না না, আর দরকার নেই,' হাত নাড়লো কিশোর। 'শুধু জিজ্ঞেস করছি, কিসের মাংস?'

'ইঁদুরের। একেবারে খাঁটি চীনা ইঁদুর। অনেক দেখেশুনে বেছে এনেছি,' শান্তকণ্ঠে জানালো কিম।

সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল রবিনের। ওয়াক ওয়াক করতে করতে উঠে দৌড় দিলো বেসিনের দিকে।

বিকৃত হয়ে গেছে কিশোরে মুখ। রবিনের মতো বমি করতে না ছুটলেও মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না, পেট থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা খাবার চাপতে কষ্ট হচ্ছে।

পাথরের মতো মুখ করে বসে রইলেন লেখক। কিমের এসব অত্যাচার গা-সওয়া হয়ে গেছে তাঁর।

কয়েকটা সেকেণ্ড নিথর হয়ে রইলো মুসা। তারপর হাসি ফুটলো মুখে। 'যাকগে, যা খাওয়ার তো খেয়েই ফেলেছি। এখন আর বলে কি হবে? এর চেয়ে কতো খারাপ

জিনিস খেয়েছি। আমাজানের জঙ্গলে সাপ, প্রশান্ত মহাসাগরের মরুদ্বীপে শুঁয়াপোকা…মরুকগে। তা ভাই, কিম, দয়া করে দুই বোতল কোকাকোলা এনে দাও তো দেখি।' বলে আবার অর্ধেক খাওয়া হ্যামবার্গারটা তুলে নিলো সে। 'আর গোটা চারেক হ্যামবার্গার। একটা খেয়ে কি হয়?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' ইঁদুরের মাংসের প্লেট হাতে রান্নাঘরের দিকে ছুটলো নিসান জাং কিম।

—ঃ শেষ ঃ—
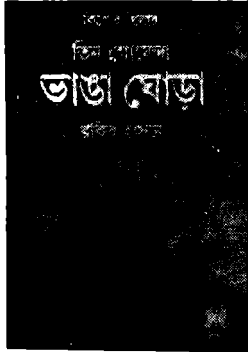
ভাঙা ঘোড়া

প্রথম প্রকাশঃ জুন, ১৯৯১

'এইই, কিশোর,' ইস্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে ডাক দিলো মুসা আমান, 'পিনটু আলভারেজ কথা বলতে চায় তোমার সঙ্গে।' সবে ছুটি হয়েছে ইস্কুল, বাইরে তারই জন্যে অপেক্ষা করছে রবিন আর কিশোর।

'ওই নামের কাউকে চেনো বলে জানতাম না তো,' রবিন বললো কিশোরকে।

'ঠিক চিনি বলতে পারবো না এখনও,' জবাব দিলো গোয়েন্দাপ্রধান। 'ক্যালিফোর্নিয়া হিস্টরি ক্লাবে মাঝে মাঝে দেখা হয়। তবে কথা বিশেষ বলে না। নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে। মুসা, কি চায় ও?'

কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা। 'জানি না। আমাকে অনুরোধ করলো তোমাকে বলতে, ইস্কুল ছুটির পর যেন তার সাথে দেখা করো, অবশ্য যদি তোমার সময় হয়। জরুরী কথা বলবে বলেই মনে হলো।'

'তিন গোয়েন্দার সাহায্য চায় নাকি?'

শ্রাগ করলো মুসা। 'চাইতেও পারে।'

'চল তো, কি বলে শুনি। কোথায় দেখা করতে বলেছে?'

'খেলার মাঠে।'

আগে আগে চললো কিশোর। ইস্কুল বিল্ডিঙের পাশ দিয়ে এসে পড়লো শান্ত, নীরব একটা রাস্তায়। দুই ধারে গাছের সারি। শেষ মাথায় একটা গেট, ওটা দিয়ে যেতে হয় খেলার মাঠে। গায়ের জ্যাকেট টেনেটুনে নিলো ওরা। নভেম্বরের বিকেল। রোদেলা দিন, কিন্তু তারপরেও ঠাণ্ডা, কনকনে বাতাস বইছে।

'কই, পিনটু কোথায়?' এদিক ওদিক তাকালো রবিন।

'সর্বনাশ হয়েছে!' নিমের তেতো ঝরলো মুসার কণ্ঠে। 'দেখো, কে!'

গেটের ঠিক বাইরে ছোট একটা হুডতোলা পিকআপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। এগুলোর ডাকনাম র‍্যাঞ্চ ওয়াগন, র‍্যাঞ্চের কাজে ব্যবহার হয়। চওড়া কাঁধ, গাট্টাগোট্টা একজন মানুষকে দেখা গেল গাড়ির সামনের বাম্পারের ওপর বসে থাকতে। মাথায় কাউবয় হ্যাট, গায়ে ডেনিম জ্যাকেট, পরনে নীল জিনস, পায়ে ওয়েস্টার্ন বুট। ওর পাশে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিপছিপে, লম্বা এক তরুণ। ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো, লম্বা, পাতলা নাক। পিকআপটার দরজায় সোনালি অক্ষরে বড় বড় করে

লেখা রয়েছেঃ ডয়েল র‍্যাঞ্চ।

'শুঁটকি টেরি!' নাকমুখ কুঁচকে ফেললো রবিন। 'ও এখানে…'

রবিনের কথা শেষ হওয়ার আগেই ওদেরকে দেখে ফেললো লম্বা ছেলেটা, বলে উঠলো, 'বাহ্, শার্লক হোমস এসে গেছে দেখি। সঙ্গে দুই চেলাও আছে।'

খিকখিক করে গা জ্বালানো হাসি হাসলো তিন গোয়েন্দার চিরশত্রু টেরিয়ার ডয়েল। ধনী ব্যবসায়ীর বখে যাওয়া ছেলে সে। সুযোগ পেলেই ওদের পেছনে লাগে, জ্বালিয়ে মারে। নিজেকে খুব চালাক ভাবে, কিন্তু প্রতিবারেই হেরে যায় তিন গোয়েন্দার কাছে।

শুঁটকির টিটকারির জবাব না দিয়ে পারা যায় না, গেটের কাছে থমকে দাঁড়ালো কিশোর। ভোঁতা গলায় বললো, 'রবিন, ঘেউ ঘেউ করে উঠলো যেন কেউ?'

'কই, কোনো মানুষকে তো দেখতে পাচ্ছি না,' শুঁটকির দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো রবিন।

'মানুষ দেখছি না, তবে একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছি,' নাক কোঁচকালো মুসা। 'বোধহয় শুঁটকির।'

রসিকতাটা বুঝলো কাউবয়, হেসে উঠলো। লাল হয়ে গেল টেরির মুখ। ঘুসি পাকিয়ে হুমকির ভঙ্গিতে এগোলো তিন গোয়েন্দার দিকে। এই সময় ডেকে উঠলো আরেকটা নতুন কণ্ঠ, 'কিশোর পাশা, দেরি করে ফেললাম, সরি। একটা উপকার চাইতে এসেছি তোমার কাছে।'

সুন্দর স্বাস্থ্য, কালো চোখ, কালো চুলওয়ালা একটা ছেলে বেরিয়ে এলো গেট দিয়ে। পিঠ এতো খাড়া করে হাঁটে যে যতোটা না লম্বা তার চেয়ে বেশি লম্বা মনে হয়। পরনে আঁটো পুরানো জিনস, পায়ে খাটো রাইডিং বুট, গায়ে ঢলঢলে সাদা শার্ট, জোড়াগুলো রঙিন সুতো দিয়ে সেলাই করা। কথায় কোনো টান নেই, তবে পোশাকেই বোঝা যায় পুরানো স্প্যানিশ জমিদারের রক্ত রয়েছে শরীরে।

'কি উপকার?' জানতে চাইলো কিশোর।

হেসে উঠলো টেরি। 'হাহ্-হাহ্, শার্লক, শেষমেষ ঘেঁড়োদের সঙ্গে মিশলে? লাল কাপড় দেখিয়ে ষাঁড় খেদানো ছাড়া ওরা আর কি বোঝে? একটা উপকার অবশ্য করতে পারো। ঘাড়টা ধরে মেকসিকোতে ফেরত পাঠাতে পারো। উপকারটা আমাদের সবারই হয় তাহলে।'

চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো পিনটু। এতোই দ্রুত, অবাক করে দিলো টেরিকে, মুখের হাসি মুছে দিলো তার। কঠিন কণ্ঠে বললো, 'কথাটা ফিরিয়ে নাও! আর মাপ চাও আমার কাছে!'

শুঁটকির চেয়ে খাটো ছেলেটা, ওজনও কম হবে, কিন্তু পরোয়াই করলো না।

মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে টেরির মুখোমুখি, একেবারে স্প্যানিশ জমিদার। কিংবা ডন।

'পাগল!' বললো বটে, কিন্তু হাসলো না টেরি। 'আমি মেকসিকানদের কাছে মাপ চাই না।'

সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঠাস করে টেরির গালে চড় মারলো ছেলেটা।

'শয়তানের বাচ্চা!' ভীষণ রাগে গাল দিয়ে উঠে এক ধাক্কায় ছেলেটাকে মাটিতে ফেলে দিলো টেরি। কিন্তু চোখের পলকে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল পিনটু। আবার তাকে ফেলে দিলো টেরি। আবার উঠলো পিনটু, আবার পড়লো। আবার উঠলো। টেরির শার্টের বুক খামচে ধরলো। তাকে ঠেলে রাস্তার দিকে নিয়ে চললো টেরি, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, যেন আশা করছে কেউ এসে এই অসম লড়াইটা থামায়। চেঁচিয়ে বললো, 'এই, এই জোঁকটাকে সরাও তো...'

জোঁকটাকে সরানোর জন্যে নয়, অন্য উদ্দেশ্যে শার্টের হাতা গুটিয়ে আগে বাড়লো মুসা। হেসে উঠলো মোটা কাউবয়। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো বাম্পার থেকে। পিনটুকে বললো, 'এই ছেলে, থামো। পারবে না ওর সাথে। অহেতুক মার খাবে আরও।'

'নাআআ!'

তীক্ষ্ণ, কঠিন আরেকটা কণ্ঠ যেন চাবুকের মতো আছড়ে পড়ে জমিয়ে দিলো সবাইকে। কোনদিক থেকে এসেছে সে, উত্তেজনার মাঝে খেয়াল করেনি কেউ। পিনটুর একটা বড় সংস্করণ মনে হচ্ছে লোকটাকে। চেহারার মিল তো রয়েছেই, পোশাক-আশাকও অবিকল একরকম, শুধু পিনটুর চেয়ে লম্বা আর বয়েস কিছু বেশি এই যা। আর মাথায় একটা কালো সমব্রেরো হ্যাট রয়েছে। পাথর কুঁদে তৈরি যেন মুখ, কালো শীতল চোখ। 'কেউ এগোবে না,' গর্জে উঠলো আবার লোকটা। 'ওরা লেগেছে, ওদেরকেই মীমাংসা করতে দাও।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার ফিরে এলো কাউবয়, হেলান দিয়ে দাঁড়ালো গাড়ির গায়ে। মুসাও দাঁড়িয়ে গেছে। চেয়ে রয়েছে রবিন আর কিশোর। জ্বলন্ত চোখে সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে আবার পিনটুর দিকে তাকালো টেরি। রাস্তায় নেমে গেছে দু'জনে। টেরির শার্ট ছেড়ে দিয়েছে পিনটু। ঘুসি তুলে এগিয়ে গেল তাকে মারার জন্যে।

'বেশ, ষেঁড়ো, দেখাচ্ছি মজা!' বলে খেঁকিয়ে উঠলো টেরি।

র‍্যাঞ্চ ওয়াগনের একটু দূরে আরেকটা গাড়ি পার্ক করা। মাঝখানের খালি জায়গায় বাধলো লড়াই। হঠাৎ লাফিয়ে পিছিয়ে গেল টেরি, ভালোমতো সই করে একটা ঘুসি ঝাড়ার জন্যে।

'সরো! সরো!' একসাথে চেঁচিয়ে উঠলো রবিন আর মুসা।

পিছিয়ে একেবারে রাস্তার মাঝে চলে গেছে টেরি। খেয়ালই করেনি গাড়ি আসছে। চোখ পিনটুর দিকে। টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল। ব্রেক কষেছে ড্রাইভার, কিন্তু বাঁচাতে পারতো না টেরিকে, যদি সময়মতো ডাইভ দিয়ে না পড়তো পিনটু। কাঁধের এক প্রচণ্ড ধাক্কায় টেরিকে সরিয়ে দিলো গাড়ির সামনে থেকে। তাকে নিয়ে গিয়ে পড়লো মাটিতে।

ক্ষণিকের জন্যে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলো দুটো দেহ। চেঁচামেচি করে ছুটে গেল দর্শকরা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো পিনটু, হাসিমুখে। টেরিও উঠলো। ক্ষতি হয়নি তারও।

পিনটুর পিঠ চাপড়ে বাহবা দিলো মুসা। গাড়ি থেকে নেমে তাড়াহুড়ো করে ছুটে এলো ড্রাইভার। পিনটুকে বললো, 'দারুণ ছেলে তো হে তুমি! তা কোথাও লাগেনি তো?'

মাথা নাড়লো পিনটু। ওকে ধন্যবাদ দিয়ে টেরির দিকে এগোলো ড্রাইভার। তার খোঁজখবর নিলো। যখন দেখলো কারোরই কোনো ক্ষতি হয়নি, আবার গিয়ে উঠলো গাড়িতে। চলে গেল। টেরি তখনও পা ছড়িয়ে বসে আছে। কাঁপছে মৃদু মৃদু। চেহারা ফ্যাকাসে।

এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে টান দিলো তার কাউবয় সঙ্গী। 'ওঠো! অল্পের জন্যে বেঁচেছো। ওঠো!'

'ও…ও আমাকে বাঁচালো!' বিড়বিড় করলো টেরি।

'কি মনে হয় তোমার?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা। 'ধন্যবাদ দাও ওকে।'

'থ্যা—থ্যাংকিউ, পিনটু,' কাঁপা গলায় বললো টেরি।

'শুধু থ্যাংকিউ?' কড়া গলায় বললো পিনটু। 'আর কিছু না?'

দ্বিধায় পড়ে গেল টেরি। 'আর আবার কি?'

'আর? কেন ভুলে গেছো মাপ চাওয়ার কথা? জলদি মাপ চাও। নইলে এসো, দেখি, আবার হয়ে যাক এক হাত।'

ছেলেটার দিকে দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবে চেয়ে রইলো টেরি।

'কি হলো?' ভুরু নাচালো পিনটু। 'কথা বলছো না কেন? কথা ফিরিয়ে নাও। আর মাপ চাও।'

লাল হয়ে গেল টেরির গাল। 'বেশ, তাতে যদি খুশি হও…ফিরিয়ে নিলাম আমার কথা…'

হাত তুললো পিনটু। 'ঠিক আছে, আর মাপ চাইতে হবে না। এমনিতেই মাপ করে দিলাম।' বলে ঘুরে দাঁড়ালো সে।

'এই, শোনো...,' বলতে বলতেই টেরির চোখ পড়লো তিন গোয়েন্দার হাসিমুখের দিকে, তার দিকে তাকিয়েই হাসছে। রাগে লাল হয়ে গেল মুখ। ঝটকা দিয়ে ঘুরে গটমট করে এগোলো র‍্যাঞ্চ ওয়াগনের দিকে। 'ডরি!' হেঁকে বললো কাউবয়কে, আদেশের সুর, 'চলো!'

পিনটুর দিকে তাকালো এবার ডরি। তারপর তার পাশে দাঁড়ানো কঠিন চেহারার লোকটার দিকে। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'কাজটা ঠিক করোনি তোমরা। এজন্যে পস্তাতে হবে।'

র‍্যাঞ্চ ওয়াগনে টেরির পাশে উঠে বসলো ডরি। গাড়ি স্টার্ট দিলো।

দুই

ডরির হুমকি তখনও যেন কানে বাজছে তিন গোয়েন্দার। দেখলো, চলন্ত ওয়াগনটার দিকে তাকিয়ে আছে পিনটু, চোখে বিতৃষ্ণা।

'এই অহংকারই সর্বনাশ করলো আমাদের!' দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তার অন্তর থেকে বেরিয়ে এলো ক্ষোভটা।

'না, পিনটু,' প্রতিবাদ করলো লম্বা লোকটা, 'এটা অহংকার নয়। আত্মসম্মানজ্ঞান। আলভারেজদের গর্ব।'

তিন গোয়েন্দার সঙ্গে লোকটার পরিচয় করিয়ে দিলো পিনটু, 'আমার ভাই, রিগো। বর্তমানে আমাদের পরিবারের কর্তা। ভাইয়া, এরা হলো আমার বন্ধু, কিশোর পাশা, মুসা আমান, আর রবিন মিলফোর্ড।'

ছেলেদের দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু মাথা নোয়ালো রিগো। বয়েস পঁচিশের বেশি নয়, পরনের কাপড়-চোপড়ও পুরানো কিন্তু তবু আচার-আচরণই স্পষ্ট বলে দেয় এককালে বড় জমিদার ছিলো বাপ-দাদারা। বললো, 'তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'ডা নাদা!' বলে স্প্যানিশ কায়দায় বাউ করলো কিশোর।

'বাহ্!' এই প্রথম হাসি ফুটলো রিগোর মুখে। 'তুমি স্প্যানিশ জানো?'

'একআধটু চর্চা করি ইস্কুলে,' কিছুটা লজ্জিত কণ্ঠেই বললো কিশোর। 'তবে তেমন পারি না। আপনাদের মতো করে বলার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'স্প্যানিশ বলার দরকার নেই আমাদের সঙ্গে,' ভদ্রতা করে বললো রিগো। 'আমরা নিজেরা যখন কথা বলি দেশী ভাষায়ই বলি। কিন্তু এখন আমরা আমেরিকারও নাগরিক, তোমাদেরই মতো, কাজেই ইংরেজিও আমাদের ভাষা বলা চলে।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো কিশোর, তার আগেই অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লো

মুসা, বলে উঠলো, 'আচ্ছা, পস্তাবে বলে শাসিয়ে গেল কেন কাউবয়টা?'

'ওই এমনি বলেছে,' বিশেষ পাত্তা দিলো না রিগো, 'কথার কথা।'

পিনটুর কণ্ঠে অস্বস্তি ফুটলো, 'কিন্তু ভাইয়া, মিস্টার ডয়েল...'

'থাক থাক,' বাধা দিয়ে বললো রিগো, 'আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যা ওটা। অন্যকে বিরক্ত করার দরকার নেই।'

'কোনো গোলমাল হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'কিছু করেছে ডরি আর টেরিয়ার?'

'না, না, তেমন কিছু না।'

'ভাইয়া,' প্রতিবাদ জানালো পিনটু, 'আমাদের র‍্যাঞ্চ চুরি করে নিয়ে যেতে চাইছে, আর একে তুমি কিছু না বলছো!'

হাঁ হয়ে গেল রবিন আর মুসা। রবিন বললো, 'তোমাদের র‍্যাঞ্চ?' মুসা বললো, 'চুরি করে কিভাবে?'

'কথা শুদ্ধ করে বলবে, পিনটু,' বললো তার ভাই। 'চুরি শব্দটা ঠিক হয়নি।'

'কোন শব্দটা হলে ঠিক হতো?' ফস করে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

দ্বিধায় পড়ে গেল যেন রিগো। মুখ ফসকে বলে ফেলেছে, এখন বাকিটা বলবে কিনা ভাবছে যেন। শেষে বলেই ফেললো, 'কয়েক মাস আগে আমাদের পাশের র‍্যাঞ্চটা কিনেছেন মিস্টার ডয়েল। তারপর আশেপাশে যত বড় বড় র‍্যাঞ্চ আছে সব কিনে ফেলবেন ঠিক করেছেন। আমার বিশ্বাস জমির ওপর টাকা খাটাচ্ছেন। আমাদের র‍্যাঞ্চটাও চাইছেন। অনেক টাকা দাম দিতে চেয়েছেন। কিন্তু আমরা বিক্রি করতে রাজি না হওয়ায় ভীষণ রেগে গেছেন তিনি।'

'তোমার শব্দ-চয়নও ঠিক হয়নি,' হেসে বললো পিনটু। 'বরং বলো পাগলা ঘোড়া হয়ে গেছেন।'

ভাইয়ের কথায় কান না দিয়ে বলতে থাকলো রিগো, 'বুঝেছো, আসলে আমাদের জমির দরকার খুব একটা নেই তার কাছে। তিনি চাইছেন অন্য জিনিস। পুরানো একটা ড্যাম আর রিজারভোয়ার রয়েছে আমাদের এলাকায়, নাম সান্তা ইনেজ ক্রীক। মিস্টার ডয়েলের বিশাল র‍্যাঞ্চের জন্যে পানি দরকার, তাই বাঁধ আর ওই দীঘিটা চায়। প্রথমে এসে কেনার প্রস্তাব দিলো আমাদের কাছে, রাজি হলাম না। আরও বেশি দাম দিতে চাইলো। তারপরও যখন রাজি হলাম না, আমাদের পুরানো দলিল ঠিক না বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করলো। পারলো না। আমাদের জমি আমাদেরই রইলো।'

'তখন অন্য পথ ধরলো ডয়েল,' মিস্টার ডয়েলকে সৌজন্য দেখানোর ধার দিয়েও গেল না পিনটু। 'ডরিকে দিয়ে শেরিফকে বলে পাঠালো, প্রায়ই আমাদের র‍্যাঞ্চে আগুন লাগে। সেই আগুন নাকি তার র‍্যাঞ্চেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। বলে আমাদের লোক

কম। আরও লোক রাখা দরকার যাতে ওরকম দুর্ঘটনা আর না ঘটতে পারে।' রাগ চাপা দিতে পারলো না সে।

'এই ডরিটা কে?' রবিন জানতে চাইলো।

'মিস্টার ডয়েলের র‍্যাঞ্চ ম্যানেজার,' জানালো রিগো। 'মিস্টার ডয়েল হলেন গিয়ে ব্যবসায়ী মানুষ। র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। তাই লোক রেখে চালাতে চাইছেন আমার মনে হয়।'

'ডরির কথা নিশ্চয় বিশ্বাস করেননি শেরিফ,' মুসা আশা করলো। 'নইলে এতোদিনে হাতছাড়া হয়ে যেতো আপনাদের র‍্যাঞ্চ, তাই না?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো রিগো। 'কাগজ-পত্র সব ঠিক আছে বলেই কিছু করতে পারছে না। কিন্তু আমাদের টাকা নেই, কতোদিন ঠেকাবো? ট্যাক্স জমে গেছে অনেক। সেটা জেনে ফেলেছেন মিস্টার ডয়েল। কাউন্টিকে ফুসলাচ্ছেন যাতে নীলামে তোলে আমাদের জমি, তাহলে তিনি কিনে নিতে পারবেন। এখন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ট্যাক্স ক্লিয়ার করতে হবে আমাদের...'

'ব্যাংকের কাছে বাধা দিয়ে টাকা ধার নিতে পারেন,' কিশোর বললো।

'হ্যাঁ,' কিশোরের কথা সমর্থন করতে পারলো না মুসা, 'তারপর ব্যাংক এসে জমিটা নিয়ে নিক। ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত চুলায় ঝাঁপ দেয়ার পরামর্শ দিচ্ছো।'

'না, তা কেন হবে?' কিশোরের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তার পক্ষ নিলো রবিন। 'নিশ্চয় অনেক টাকা ট্যাক্স জমেছে। সেটা ব্যাংক দিয়ে দেবে। সেই টাকার ওপর কিছু সুদ ধরে কিস্তিতে শোধ দিতে বলবে জমির মালিককে। একবারে দেয়ার চেয়ে অল্প অল্প করে দেয়া অনেক সহজ, আর দেয়ার সময়ও পাওয়া যাবে।'

'তা ঠিক,' রাগ ফুটলো রিগোর কণ্ঠে। 'কিন্তু কথা হলো আমাদের মতো বাইরের লোকদের ধার দিতে চায় না ক্যালিফোর্নিয়ার ব্যাংক। খাঁটি আমেরিকান না হলে বিশ্বাস করে না। জমি বন্ধক রেখে ট্যাক্সের জন্যে ধার আমরা নিয়েছি, আমাদেরই এক পুরানো বন্ধু, প্রতিবেশী, আমাদের মতোই মেকসিকান-আমেরিকান রডরিক হেরিয়ানোর কাছ থেকে। কয়েক দিনের জন্যে। টাকাটা শীঘ্রি শোধ করতে হবে। সে-কারণেই তোমার কাছে এসেছি, কিশোর পাশা।'

'আমার কাছে?'

'যেহেতু র‍্যাঞ্চ ছাড়ছি না আমরা, জায়গা আর বিক্রি করতে পারছি না। বিক্রি করার মতো জমিই নেই। যা আছে সেগুলো দিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে। অনেক পুরুষ ধরে অনেক জিনিসপত্র কিনেছে আলভারেজরা, অনেক কিছু জমিয়েছে। এই যেমন আসবাবপত্র, ছবি, ভাস্কর্য, বই, পোশাক, যন্ত্রপাতি, আরও নানারকম জিনিস। আলভারেজদের ইতিহাসই বলা চলে ওগুলোকে। কিন্তু জমির চেয়ে তো বড় না, তাই

ওগুলো বিক্রি করে ধার শোধ করবো ঠিক করেছি। পিনটুর কাছে শুনেছি, তোমার চাচা নাকি সব ধরনের পুরানো জিনিস কেনেন।'

'নিশ্চয়ই কেনেন,' কিশোরের আগেই চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'আর যতো বেশি পুরানো জিনিস হয় ততো বেশি খুশি হন।'

'হ্যাঁ,' কিশোর বললো, 'পুরানো হলে খুশি হয়েই কিনবেন। আসুন।'

সত্যিই খুশি হলেন রাশেদ পাশা। মুসা আর কিশোরের মুখে শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে বললেন, 'তাহলে আর বসে আছি কেন?' উত্তেজনায় চকচক করছে চোখ।

কয়েক মিনিট পরেই স্যালভিজ ইয়ার্ডের একটা ট্রাক উত্তরে রওনা হলো। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, পার্বত্য এলাকার দিকে চলেছে, আলভারেজদের র‍্যাঞ্চের দিকে। গাড়ি চালাচ্ছে ইয়ার্ডের কর্মচারী, ব্যাভারিয়ান ভাইদের একজন, বোরিস। পাশে বসেছেন রাশেদ পাশা আর পিনটু। ট্রাকের পেছনে চড়ে চলেছে কিশোর, মুসা, রবিন আর রিগো। নভেম্বরের বিকেলের রোদ এখনও মুছে যায়নি, তবে পর্বতের মাথায় কালো মেঘ জমতে আরম্ভ করেছে।

সেদিকে তাকিয়ে রবিন বললো, 'বৃষ্টি তাহলে নামবে মনে হয়।' গত মে-এর পর থেকে এক ফোঁটা বৃষ্টিও হয়নি। সময় হয়েছে এখন। যখন তখন শুরু হতে পারে শীতের বর্ষণ।

কাঁধ ঝাঁকালো রিগো। 'মনে হয়। না-ও হতে পারে। গত কিছু দিন ধরেই দেখছি, মেঘ জমে, কেটে যায়, জমে আবার কেটে যায়। বৃষ্টি হলে ভালোই হতো। পানি দরকার। আমাদের দীঘিটা আছে বলে বেঁচে গেছি। ওটার পানিতেই চলে সারা বছর। তবে এবছর খরা পড়েছে বেশি, পানি একেবারে নিচে নেমে গেছে। শীঘ্রি বৃষ্টি না হলে বিপদ হবে।'

পথের পাশে শুকনো বাদামী অঞ্চল। মাঝে মাঝে ওক গাছ, সবুজ পাতাগুলো লালচে হয়ে আছে ধূলিতে।

সেদিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো রিগো, 'একসময় এসবই ছিলো আলভারেজদের জায়গা। এদিকের উপকূল থেকে শুরু করে ওদিকে ওই যে ওই পর্বতের একেবারে গোড়া পর্যন্ত। বিশ হাজার একরের বেশি।'

'দ্য আলভারেজ হাসিয়েনডা,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললো রবিন। পড়েছি। স্পেনের রাজার কাছ থেকে এই জমি ভোগদখলের অনুমতি পেয়েছিলো আলভারেজরা।'

'হ্যাঁ,' রিগো বললো। 'অনেক দিন ধরে এখানে আছি আমরা। প্রথম যে ইউরোপিয়ান মানুষটি ক্যালিফোর্নিয়ায় পা রাখেন তাঁর নাম হুয়ান ক্যাবরিলো। পনেরো

শো বিয়াল্লিশ সালে এটা স্পেনের সম্পত্তি বলে দাবি করেন। কিন্তু তাঁরও আগে থেকেই আমেরিকায় ছিলেন নিরো আলভারেজ। হারনানদো করটেজের সেনাবাহিনীতে একজন সৈনিক ছিলেন তিনি। করটেজের নাম নিশ্চয় শুনেছো, পনেরোশো একুশ সালে দক্ষিণ মেকসিকোতে আজটেকদেরকে পরাজিত করেছিলেন যে বীর সেনাপতি।'

'খাইছে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'তারমানে প্লাইমাউথ রকে খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের ঢোকারও একশো বছর আগের ঘটনা সেটা!'

'তাহলে আলভারেজরা ক্যালিফোর্নিয়ায় এলো কবে?' এই ইতিহাস শুনতে খুব ভালো লাগছে কিশোরের, আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো।

'অনেক পরে,' রিগো জানালো। 'ক্যাবরিলো ক্যালিফোর্নিয়ায় ঢোকার পর থেকেই ধীরে ধীরে স্প্যানিশরা এই এলাকায় ঢুকতে আরম্ভ করলো। তবে ঠিকমতো বসতি জমাতে দুশো বছরেরও বেশি সময় লেগে গেল তাদের। এর কারণ, নিউ স্পেনের তৎকালীন রাজধানী মেকসিকো সিটি থেকে ক্যালিফোর্নিয়া অনেক দূরে। দুর্গম ছিলো তখন এই এলাকা, আর ভয়ংকর ছিলো এখানকার ইনডিয়ানরা। শুরুর দিকে তো স্থলপথে এখানে আসতেই পারতো না স্প্যানিশরা, আসতো সমুদ্রপথে।'

'ক্যালিফোর্নিয়াকে তখন দ্বীপ মনে করতো স্প্যানিশরা, তাই না?' কিশোর বললো।

মাথা ঝাঁকালো রিগো। 'হ্যাঁ। তারপর, সতেরোশো উনসত্তর সালে স্থলপথে এক অভিযান চালালেন ক্যাপ্টেন গ্যাসপার ডা পরটোলা। উত্তরে এগোতে এগোতে তিনি পৌঁছে গেলেন স্যান দিয়েগোতে। আমাদের পূর্বপুরুষ লেফটেন্যান্ট ডারিগো আলভারেজ ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে। স্যান ফ্র্যানসিসকো বে-এর অনেক জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখলেন পরটোলা। তারপর সতেরোশো সত্তর সালে মনটেরোতে বসতি স্থাপন করলেন। ওই সময়ই রকি বীচকে চোখে লেগে গিয়েছিলো ডারিগোর। ঠিক করলেন, এখানেই বসতি করবেন। ক্যালিফোর্নিয়ার প্রভিনশিয়াল গভার্নমেন্টের কাছে দরখাস্ত করলেন জায়গা চেয়ে। অনুমতি পেলেন সতেরোশো চুরাশি সালে।'

'আমার তো ধারণা ছিলো স্পেনের রাজা তাঁকে জমি দিয়েছেন,' মুসা বললো।

মাথা ঝাঁকালো রিগো। 'একদিক থেকে তা-ই করা হয়েছে আসলে। নিউ স্পেনের সমস্ত জায়গাই অফিশিয়ালি তখন রাজার সম্পত্তি। তাঁর পক্ষেই অনুমতিপত্র সই করতেন তৎকালীন মেকসিকো আর ক্যালিফোর্নিয়ার গভার্নার। ডারিগো পেলেন ফাইভ স্কোয়ার লীগস, অর্থাৎ বিশ হাজার একরেরও বেশি। এতো জায়গা ছিলো, অথচ এখন আমাদের আছে মাত্র একশো একর।'

'বাকি জমি?' জানতে চাইলো রবিন।

'বাকি?' বিষণ্ন চোখে ট্রাকের পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া জমির দিকে তাকিয়ে রইলো রিগো এক মুহূর্ত। বোধহয় ঈশ্বরের বিচার! ইনডিয়ানদের কাছ থেকে তাদের জায়গা কেড়ে নিয়েছিলো স্প্যানিশরা, কাজেই ও-জমি তাদের দখলে থাকবে কেন? যাবেই। বছরের পর বছর আলভারেজদের সংখ্যা বেড়েছে, জমি ভাগাভগি হয়েছে। কিছু বিক্রি করেছে, কিছু কায়দা করে দখল করে নিয়েছে শত্রুরা, আর কিছু কেড়ে নিয়ে গেছে কলোনির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা।

'ধীরে ধীরে ছোট থেকে ছোট হয়ে এলো আমাদের র‍্যাঞ্চ। কিন্তু জমিদারি মেজাজ আর অহংকার ছাড়তে পারিনি আমরা। বড় বড় লোকদের সঙ্গে ছিলো আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মীয়তা। ক্যালিফোর্নিয়ার শেষ মেকসিকান গভার্নার পিও পিকো ছিলেন আমাদের আত্মীয়। বহু বছর আগে করটেজের একটা মূর্তি স্থাপিত হয়েছিলো আলভারেজদের জমিতে, এখনও সেটা আমাদের সীমানার মধ্যেই আছে।'

'মিষ্টার ডয়েল তাহলে আপনাদের এই শেষ সম্বলটুকু ছিনিয়ে নিতে চাইছেন,' সহানুভূতি মিশিয়ে বললো মুসা।

'এতো সহজে নিতে দেবো না,' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলো যেন রিগো। 'খুব একটা ভালো জায়গা নয় ওটা, ভালো তৃণভূমি নেই, ফসল ফলানো কঠিন। শুধু বাপ-দাদার জায়গা বলেই ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছি। পড়ে থাকবো। ঘাস বেশি নেই বলে গরু তেমন পোষা যাচ্ছে না। তবে বিকল্প হিসেবে ঘোড়ার প্রজনন শুরু করেছি আমরা। অ্যাভোক্যাডো গাছ লাগিয়েছি। ছোটখাটো একটা তরকারীর খামারও করেছি। তারপরেও আমার বাবা আর চাচাকে গিয়ে শহরে নানারকম কাজ করতে হয়েছে র‍্যাঞ্চটা খাড়া রাখার জন্যে। এখন তারা নেই, মারা গেছে। র‍্যাঞ্চটা টিকিয়ে রাখতে হলে এখন আমাকে আর পিনটুকেও গিয়ে তাদের মতো কাজ করতে হবে।'

কাউন্টি রোড ধরে চলেছে এখন ট্রাক। পাহাড়ী অঞ্চল। উত্তরে চলেছে ওরা। ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে পথ। হঠাৎ করেই যেন পাহাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ছড়ানো একটা সমতল জায়গায়। বাঁয়ে সামান্য মোড় নিয়ে পশ্চিমে এগিয়ে গেছে এখন রাস্তাটা। মোড়ের কাছ থেকে আরেকটা কাঁচা রাস্তা বেরিয়ে গেছে ডানে।

সেই রাস্তাটা দেখিয়ে রিগো বললো, 'ডয়েল র‍্যাঞ্চে গেছে ওটা।'

দূরে ডয়েল র‍্যাঞ্চ দেখতে পেলো গোয়েন্দারা, তবে বাড়িটার পাশে কোনো গাড়িটাড়ি চোখে পড়লো না। টেরি আর ডরি কি তাহলে ফেরেনি?

কাউন্টি রোডটা যেখানে মোড় নেয়া শেষ করেছে ওখানে একটা ছোট পাথরের ব্রিজ আছে। নিচে শুকনো খট খটে বুক চিতিয়ে রেখেছে যেন পাহাড়ী নালা, পানি নেই।

'সান্তা ইনেজ ক্রীক,' নালাটা দেখিয়ে বললো রিগো, 'আমাদের সীমানা এখান

থেকে শুরু। বৃষ্টি না নামলে আর পানি আসবে না ওটাতে। ওটা ধরে মাইলখানেক উত্তরে বাঁধ। ওই ওদিকে।'

কতগুলো শৈলশিরা দেখালো সে। বোঝালো বাঁধটা ওগুলোর ওপাশে। নালার অন্যপাশে রয়েছে একটা শিরা, কাউন্টি রোডের সঙ্গে তাল রেখে পাশাপাশি এগিয়ে গেছে। উত্তরের পর্বতের গায়ে শিরাগুলো এমনভাবে বেরিয়ে রয়েছে, দেখে মনে হয় হাতের ছড়ানো আঙুল।

আঙুলগুলোর পাশ দিয়ে গেছে পথ। শেষ আঙুলের কাছে এসে হাত তুলে দেখালো রিগো। ওটার ওপরে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা কালো বিশাল মূর্তি—ঘোড়ার পিঠে বসে আছে ঘোড়সওয়ার, একটা হাত এমন ভাবে তুলে রেখেছে, মনে হয় যেন পেছনের সেনাদলকে এগোনোর নির্দেশ দিচ্ছে।

'মহাবীর করটেজ,' গর্বের সঙ্গে বললো রিগো। 'আলভারেজদের প্রতীকই বলা চলে ওটাকে। আলভারেজ হীরো। দুশো বছর আগে বানিয়েছিলো ইনডিয়ানরা।'

শেষ শিরাটা পেরোনোর পর আবার দেখা গেল সমভূমি। আরেকটা পাথরের ব্রিজ পেরোতে হলো। নিচে গভীর খাদ, এটাও শুকনো।

'আরেকটা নালা?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'নালা হলে তো ভালোই হতো,' রিগো বললো। 'এটার মেকসিকান নাম অ্যারোইও। জোর বৃষ্টি হলেই শুধু এসব অ্যারোইওতে পানি জমে। আর কোনো উৎস নেই।'

'আর উৎস মানে?'

'পর্বতের গা থেকে বেরোনো ঝর্নার কথা বলছি। সান্তা ইনেজ ক্রীকে যেমন আসে।'

'সান্তা ইনেজ ক্রীকেও না বললেন বৃষ্টি হলে পানি আসে?'

'হ্যাঁ, তাই তো। বৃষ্টি হলে পর্বতের ভেতরের ফাঁকফোকরে পানি ঢুকে যায়, ঝর্না হয়ে বেরিয়ে আসে আবার নিচের নালা বেয়ে। কিন্তু অ্যারোইওর মুখ বন্ধ থাকে বলে ঢুকতে পারে না।'

ডানে মোড় নিয়ে একটা কাঁচা রাস্তায় নামলো ট্রাক। পথের দু'পাশে এখানে অ্যাভোকাডো গাছ লাগানো। আরেকবার ডানে মোড় নিয়ে পথটা বেরিয়ে এলো একটা ছড়ানো, খোলা চত্বরের মতো জায়গায়।

'হাসিয়েনডা অ্যালভারেজে স্বাগতম,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো রিগো।

নিচের মাটিতে ধুলো জমে আছে। লাফ দিয়ে দিয়ে ট্রাক থেকে নামলো গোয়েন্দারা। লম্বা, নিচু ছাতওলা একটা বাড়ি। দেয়ালে সাদা চুনকাম। কোটরে বসা চোখের মতো যেন পুরু দেয়ালের গভীরে বসে রয়েছে জানালাগুলো। লাল টালির ঢালু

ছাত। কালচে বাদামী রঙের খুঁটি আর কড়িকাঠের ওপর ভর দিয়ে ছাতটা এসে যেন ঝুলে রয়েছে বারান্দার ওপর। এই বাড়িটাই অ্যালভারেজদের হাসিয়েনডা। বাঁয়ে ঘোড়ার ঘর, এটারও ছাত নিচু। অনেকটা গোলাঘরের মতো দেখতে। সামনে তারের বেড়া দিয়ে তৈরি করা হয়েছে কোরাল। মুরগীর খোঁয়াড়ের বাইরে যেমন দিনের বেলা চরে খাওয়ার জন্যে ঘেরা জায়গা থাকে, কোরালও অনেকটা ওরকমই। কোরাল আর গোলাঘরের চারপাশে গজিয়ে উঠেছে বাঁকাচোরা ওকগাছ। নভেম্বরের এই মেঘলা বিকেলে সব কিছুই কেমন যেন মলিন, বিষণ্ন দেখাচ্ছে।

হাসিয়েনডার পেছনে খানিক দূরেই দেখা গেল সেই অ্যারোইওটা, যেটা পেরিয়ে এসেছে ট্রাক। তার ওপাশে মাথা তুলে রেখেছে শৈলশিরাগুলো। হাত তুলে করটেজের মূর্তিটা চাচাকে দেখালো কিশোর।

'ওটাও কি বিক্রি হবে?' রিগোকে জিজ্ঞেস করে বসলেন রাশেদ পাশা কিছু না ভেবেই।

'না না,' রিগো মাথা নাড়লো। 'বিক্রির জিনিস রয়েছে গোলাঘরের ভেতরে।'

কোরালের কাছে ট্রাক পিছিয়ে নিতে শুরু করলো বোরিস। অন্যেরা দ্রুত এগোলো ধুলো মাড়িয়ে গোলাঘরের দিকে। ভেতরে আলো খুব কম। একটা কাঠের হুকের মাথায় হ্যাটটা প্রায় ছুঁড়ে ফেললো রিগো, পারিবারিক 'রত্ন'গুলো ভালোমতো দেখার এবং দেখানোর জন্যে। হাঁ হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা।

লম্বা ঘরটার অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে ঘোড়া রাখার স্টল, আর কৃষিকাজের সাধারণ যন্ত্রপাতি। বাকি অর্ধেকটা গুদাম। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত জিনিসপত্রে বোঝাই। টেবিল, চেয়ার, ট্রাংক, আলমারি, লণ্ঠন, কাজের যন্ত্রপাতি, জমকালো পোশাক, তৈজসপত্র, গোসল করার বিরাট গামলা আর আরও নানা জিনিস। দুই চাকার একটা পুরানো ঠেলাগাড়িও দেখা গেল। দেখে তিন গোয়েন্দার মতোই স্তব্ধ হয়ে গেছেন রাশেদ পাশাও।

'অনেক ঘর ছিলো আলভারেজদের,' জানালো রিগো। 'এখন অবশিষ্ট আছে মাত্র একটা হাসিয়েনডা। ওসব ঘরের প্রায় সমস্ত জিনিসপত্রই এনে রাখা হয়েছে এখানে।'

'সব কিনবো আমি!' ঘোষণা করে দিলেন রাশেদ পাশা।

'এই দেখো দেখো!' প্রায় চিৎকার করে বললো রবিন। 'পুরানো আরমার! একটা হেলমেট, একটা ব্রেস্ট-প্লেট ...'

'...একটা তলোয়ার, একটা জিন!' রবিনের কথাটা শেষ করলো মুসা। 'দেখো, জিনের গায়ে আবার রূপার কাজ!'

মালপত্রের মাঝে মাঝে সরু গলিমতো করে রাখা হয়েছে ভেতরে ঢোকার জন্যে। ঢুকে পড়লো তিন গোয়েন্দা। তালিকা তৈরি করার জন্যে সবে নোটবুক বের করেছেন

রাশেদ পাশা, এই সময় বাইরে শোনা গেল চিৎকার।

ভালো করে শোনার জন্যে কান পাতলো সবাই। আবার শোনা গেল চিৎকার। স্পষ্ট বোঝা গেল এবার কি বলছেঃ আগুন! আগুন!

আগুন লেগেছে! জিনিস দেখা বাদ দিয়ে দৌড় দিলো সবাই দরজার দিকে।

তিন

গোলাঘর থেকে ছুটে বেরোলো তিন গোয়েন্দা। হালকা ধোঁয়ার গন্ধ নাকে ঢুকলো। চত্বরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে আর চিৎকার করছে দু'জন লোক। 'রিগো! পিনটু! আগুন! ওই যে! বাঁধের কাছে!'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রিগোর মুখ। কোরালে দাঁড়িয়েই দেখতে পেলো সবাই, উত্তরের শুকনো বাদামী পর্বতের ভেতর থেকে মেঘলা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে ধোঁয়া। বিপদটা বুঝতে দেরি হলো না কারোই। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার ওসব পর্বতের ঢালে, খাঁড়িতে, গিরিপথের যেখানে সেখানে ঘন হয়ে জন্মায় মেসকিট আর চ্যাপারালের ঝোপ। খরায় শুকিয়ে ঝনঝনে হয়ে আছে নিশ্চয় এখন। একটা ঝোপে আগুন লাগার মানেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা, এবং তার অর্থ দাবানল!

'জলদি দমকল আর বনবিভাগকে খবর দাও!' চেঁচিয়ে উঠলো দু'জনের একজন। 'বেলচা! কুড়াল! জলদি!'

'দৌড়ে গিয়ে পারবো না!' বললো আরেকজন। 'ঘোড়া লাগবে, ঘোড়া!'

'তারচে আমাদের ট্রাকে করে চলুন!' পরামর্শ দিলো কিশোর। 'ঠিক!' সায় জানালো রিগো। 'এই, বেলচা আর কুড়াল রয়েছে গোলাঘরে!'

ট্রাক স্টার্ট দেয়ার জন্যে দৌড় দিলো বোরিস। অন্যেরা গোলাঘরের দিকে ছুটলো আগুন নেভানোর যন্ত্রপাতি আনতে। আগের মতোই বোরিসের পাশে উঠে বসলেন রাশেদ পাশা আর পিনটু। অন্যেরা টপাটপ লাফিয়ে উঠে পড়লো ট্রাকের পেছনে। ট্রাকের দু'ধার খামচে ধরে দাঁড়িয়ে রইলো, যাতে উঁচু-নিচু জায়গায় চলার সময় ঝাঁকুনিতে ছিটকে না পড়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে দু'জন লোকের পরিচয় করিয়ে দিলো রিগো, যারা চিৎকার করে আগুনের কথা জানিয়েছে।

'আমাদের বন্ধু, পুয়ের্তো হুগো, আর ডা স্টেফানো,' এক এক করে দু'জনকে দেখালো রিগো। 'কয়েক পুরুষ ধরে হাসিয়েনডা আলভারেজে কাজ করছে। এই পথের ধারেই এখন বাড়ি করেছে দু'জনে। শহরে কাজ করে। তবে অবসর সময়ে এখনও আমাদের র‍্যাঞ্চের কাজ করে দেয়।'

দু'জনেই বেঁটে। কালো চুল। খুব ভদ্রভাবে মাথা নুইয়ে সৌজন্য দেখালো তিন

গোয়েন্দাকে। তবে চোখের উৎকণ্ঠা তাতে ঢাকা পড়লো না। ট্রাকের কেবিনের ওপর দিয়ে আবার ফিরে তাকালো ওরা আগুনের দিকে। রোদ-বাতাসে অল্প বয়েসেই ভাঁজ পড়েছে মুখের চামড়ায়, উদ্বেগে গভীর হলো সেগুলো। অস্বস্তিতে হাত ডললো পুরানো জিনসের প্যান্টের পেছনে।

সোজা উত্তরে ছুটেছে ট্রাক। ঘন হচ্ছে এখন ধোঁয়া। ঢেকে দিচ্ছে মেঘের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা মলিন রোদকে। আগুনের দিকেই নজর, তবু, পথের পাশের সব্জী বাগানগুলো চোখ এড়ালো না ওদের। দক্ষিণের একটা মাঠের দিকে ছুট দিয়েছে একপাল ঘোড়া। শুরুতে অ্যারোইও আর শৈলশিরার পাশাপাশি চললো কাঁচা রাস্তাটা, তারপর পর্বতের কাছাকাছি এসে দু'ভাগ হয়ে গেল। আগুনটা ডান দিকে, তাই ডানের পথই ধরলো বোরিস। রুক্ষ এবড়োখেবড়ো পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটে চলেছে ট্রাক, ছড়িয়ে পড়া ধোঁয়া লক্ষ্য করে। বাঁক নিয়ে সোজা অ্যারোইওর দিকে এগিয়েছে পথ। হঠাৎ করেই যেন হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়েছে একটা পাথুরে শৈলশিরার গোড়ায়। খানিক দূরে শিরাটাও যেন আচমকাই শেষ হয়ে গেছে। এবং তার পরে ডানে একটা পুরানো পাথরের বাঁধ, তার ওপর দিয়ে ছুটলো ট্রাক। বাঁধের নিচে সান্তা ইনেজ ক্রীকের শুকনো বুক দীর্ঘ বাঁক নিয়ে এগিয়ে গেছে দক্ষিণ-পুবে শৈলশিরার একেবারে দূরতম প্রান্তের কাছে। বাঁধের পেছনে রিজারভোয়ার অর্থাৎ 'রিগোর দীঘি', বড়জোর একটা পুকুর বলা চলে ওটাকে, পর্বতের পায়ের কাছে শুয়ে শুয়ে যেন ঝিমোচ্ছে ক্লান্তিতে। পুকুরের পাশ দিয়ে ঘুরে ছুটলো ট্রাক। সামনে লাফিয়ে ওঠা আগুনের শিখা চোখে পড়লো এতোক্ষণে।

'থামো! থামো!' কেবিনের জানালার পেছনে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো রিগো।

ঘ্যাচ করে ব্রেক কষলো বোরিস। এগিয়ে আসা আগুনের কাছ থেকে শ'খানেক গজ দূরে। লাফিয়ে নেমে পড়লো সবাই।

'ছড়াও! ছড়িয়ে পড়ো!' নির্দেশ দিলো রিগো। 'ঝোপের মাঝখানে কেটে দাও, আলাদা হয়ে যাক। বালি ছুঁড়বে আগুনের ওপর। কোনোমতে ঠেলে পুকুরের দিকে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচোয়া! জলদি শুরু করো!'

নালার দুই পাশেই আগুন জ্বলছে, অনেকটা অর্ধচন্দ্রাকারে। নিচে লাল আগুন, ওপরে কালো ধোঁয়ার একটা বিচিত্র দেয়াল যেন কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসছে, ছড়িয়ে পড়ছে দু'পাশে। ছড়াচ্ছে লাফ দিয়ে দিয়ে। এইমাত্র যেখানে দেখা যাচ্ছে সবুজ ঝোপ, পরমুহূর্তেই সেখানে লাল আগুন, দেখতে দেখতে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলছে।

'বাতাস কম, তাই রক্ষা!' মুসা বললো।

নালার বাঁ দিকে ছুটে গেল তিন গোয়েন্দা। কুপিয়ে কেটে ফেললো ছোট ছোট গাছ, ঝোপ পরিষ্কার করে মাঝখানে একটা লম্বা গর্ত করে ফেললো, অনেকটা ট্রেঞ্চের

মতো। মাটি নরম, কাটতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না। খুঁড়ে তোলা মাটি ছিটিয়ে দিলো আগুনের ওপর।

'আরি, দেখো!' হাত তুলে দেখালো রবিন। 'শুঁটকি! আর ম্যানেজারটা!'

লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে আসছে টেরি আর ডরি। আরও লোক আসছে ওদের পেছনে। ডয়েলদের র‍্যাঞ্চ ওয়াগন আর আরও দুটো ট্রাকে করে এসেছে ওরা। হাতে কুড়াল, বেলচা। আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলো ওরাও। কিশোর দেখলো এমন.কি মিস্টার ডয়েলও চলে এসেছেন। হাত নেড়ে নেড়ে চেঁচিয়ে আদেশের পর আদেশ দিয়ে চলেছেন।

দুই র‍্যাঞ্চের দুটো দল, আগুন আর ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে না ভালো করে, লড়ে চললো আগুনের সঙ্গে। মনে হলো কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। অথচ মেঘ আর ভাঙা ঘোড়া ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যাওয়া সূর্য দেখেই আন্দাজ করতে পারলো গোয়েন্দারা, সময় কেটেছে মাত্র আধ ঘণ্টা। ইতিমধ্যে পুরো কাউন্টিই যেন এসে হাজির হয়েছে আগুন নেভানোর জন্যে।

রাসায়নিক পদার্থ ভরা ট্যাংক আর বুলডোজার নিয়ে এসেছে বনবিভাগ। শেরিফের সহকারীরা হাত লাগিয়েছে আলভারেজ আর ডয়েলদের সঙ্গে। জোরালো এঞ্জিনের গর্জন তুলে আর ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে মাটি কাঁপিয়ে ছুটে এলো দমকলের গাড়ি। লাফিয়ে নামলো কর্মীরা। পাইপ খুলে নিয়ে দৌড় দিলো পুকুরের দিকে। পানি ছিটানো শুরু করলো আগুনের ওপর।

এলাকার আরও লোক ছুটে আসছে সাহায্য করতে। নালার দুই তীরেই অপেক্ষা করছে অনেকে, দূরে। ওদেরকে আনতে ছুটলো সিভিলিয়ানদের ট্রাকগুলো। বোরিস গেল একদিকে। ডয়েলদের ওয়াগন আর ট্রাকগুলো গেল দক্ষিণে কাউন্টি রোডের দিকে।

উড়ে এলো বনবিভাগের হেলিকপ্টার আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত বম্ব'র প্লেন। খুব নিচু দিয়ে উড়তে উড়তে আগুনের ওপর রাসায়নিক পদার্থ ছিটাতে লাগলো। পানিও ছিটাচ্ছে কোনো কোনোটা। কয়েকটা উড়ে গেল পর্বতের অন্যপাশে, আগুন ছড়িয়ে গেছে ওদিকেও। কয়েকটা উড়তে লাগলো দমকল-কর্মীদের ওপর, পানি ছিটিয়ে আগুন নেভাতে গিয়ে ভিজিয়ে চুপচুপে করে দিলো ওদের।

পরের একটা ঘণ্টা ধরে চললো জোর লড়াই, মনে হচ্ছে সব বৃথা। আগুনকে পরাজিত করা যাবে না। ধোঁয়া আর আগুনের চাপে ক্রমেই পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো দমকল-কর্মীরা। তবে বাতাস কম থাকায় বেশিক্ষণ আর সুবিধে করতে পারলো না আগুন। প্রতিপক্ষের চাপের মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলো একটু একটু করে। দাউ দাউ করে জ্বলতে জ্বলতে প্রথমে দ্বিধা করলো যেন কিছুক্ষণ, তারপর ঘন কালো

ধোঁয়ায় আকাশ কালো করে দিয়ে কমতে আরম্ভ করলো। তবে খুব ধীরে।

'থেমো না! চালিয়ে যাও!' চেঁচিয়ে আদেশ দিলো দমকল বাহিনীর ক্যাপ্টেন। 'ঢিল পেলেই আবার লাফিয়ে উঠবে!'

আরও দশ মিনিট পর বেলচায় ভর দিয়ে দাঁড়ালো কিশোর। হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছলো। গালে এসে লাগলো কিছু। চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি আসছে!'

একটা দুটো করে বড় বড় ফোঁটা পড়তে শুরু করলো। কাজ থামিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালো কয়েকজন দমকল-কর্মী। হঠাৎ করেই যেন ফাঁক হয়ে গেল আকাশের ট্যাংক, ঝমঝম করে নেমে এলো বারিধারা। ঘামে ভেজা, ধোঁয়ায় কালো মুখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আনন্দের হুল্লোড় বয়ে গেল নালার একমাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত। সেই চিৎকারকে ছাপিয়ে হিসহিস করে উঠলো আগুনের অন্তিম আর্তনাদ।

মাথার ওপর দু'হাত তুলে দিয়েছে রবিন। মুখ আকাশের দিকে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, সেই পানিতে ধুয়ে নিচ্ছে হাত-মুখের কালি-ময়লা। ঝিলিক দিয়ে গেল বিদ্যুতের তীব্র নীল শিখা। বাজ পড়লো ভীষণ শব্দে। তারপর থেকে একটু পর পরই পড়তে লাগলো পর্বতের মাথায়।

পানিতে ধুয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে ধোঁয়া, তবে এখনও কিছু কিছু ভাসছে এখানে ওখানে। মার খাওয়া কুকুরের মতো নেতিয়ে পড়ছে আগুন, শেষ ছোবল হানার চেষ্টা করছে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে যেখানে বৃষ্টি সরাসরি পড়তে পারছে না সেসব জায়গায়। তবে ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় সুবিধে করতে পারবে না আর।

বিপদ কেটেছে। সাহায্য করতে যারা এসেছিলো আস্তে আস্তে সরে পড়তে লাগলো তারা। বাকি কাজ শেষ করার দায়িত্ব রেখে গেল বনবিভাগ আর দমকল বাহিনীর ওপর।

সারা শরীরে কালি মাখা, ভিজে চুপচুপে হয়ে এসে পুকুরের পাড়ে দাঁড়ালো আলভারেজদের দল। ট্রাকে করে লোক নামিয়ে দিতে গেছে বোরিস, এখনও ফেরেনি।

কমে আসছে বৃষ্টি। শেষে গুঁড়ি গুঁড়িতে এসে স্থির হলো। কিছুটা পরিষ্কার হলো শেষ বিকেলের আকাশ।

'চল, যাই,' রিগো বললো। 'এক মাইলও হবে না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে হেঁটেই চলে যাই।'

ক্লান্ত, ভেজা শরীর নিয়ে অন্যদের পেছন পেছন চলেছে তিন গোয়েন্দা। কিন্তু মনে সুখ, আগুনটা শেষ পর্যন্ত নেভাতে পেরেছে। বৃষ্টিতে ভিজে কাদায় প্যাচপ্যাচ করছে এখন কাঁচা রাস্তা, তার ওপর দিয়েই চলেছে মানুষ আর গাড়ির মিছিল, দক্ষিণে। সামনে মাথা তুলে রেখেছে উঁচু শৈলশিরা, যেটা শুকনো অ্যারোইও আর সান্তা ইনেজ ক্রীককে

আলাদা করে রেখেছে।

ভিড় আর কাদার দিকে তাকালো রিগো, নিজের দলকে সরিয়ে নিয়ে এলো বাঁয়ে। বললো, 'আরেকটা পথ আছে। এতো ভিড়ও নেই, কাদাও কম থাকবে, সহজেই চলে যেতে পারবো হাসিয়েনডায়।'

বাঁধের কিনার দিয়ে হেঁটে উঁচু শৈলশিরার গোড়ায় একটা বড় ঢিবির কাছে চলে এলো ওরা। জংলা জায়গা, ঝোপঝাড় জন্মে রয়েছে। শৈলশিরার পশ্চিম অংশে অ্যারোইওর পথ রোধ করেছে এই ঢিবিটাই। প্রায় মুছে যাওয়া একটা পায়ে-চলা পথ চোখে পড়লো এখানে, নেমে গেছে বাঁধের তিরিশ ফুট নিচে নালার বুকে। ওটাতে নামার আগে মুখ ফেরালো একবার সবাই, পেছনে দেখার জন্যে। বাঁধের দু'ধারে যতো দূর চোখ যায়, শুধু পোড়া ঝোপঝাড়। কিছু পুড়ে ছাই হয়ে মিশে গেছে মাটিতে, কিছু কালো ডাঁটা এখনও মাথা তুলে রেখেছে এখানে ওখানে।

'গাছপালা নেই। পোড়া মাটি এখন পানি আটকাতে পারবে না,' হুগো বললো গম্ভীর হয়ে। 'বৃষ্টি যদি বাড়ে, বন্যা হয়ে যাবে।'

ঢিবির নিচের পথ ধরে নিচে নামতে আরম্ভ করলো দলটা। নালার বুকও এখন আর আগের মতো শুকনো নেই, কাদা হয়ে গেছে। অন্য পারে আরেকটা কাঁচা রাস্তা আছে, ওটা গেছে ডয়েল র‍্যাঞ্চের ভেতর দিয়ে। যানবাহন আর লোকের ভিড় ওটাতেও। কাউন্টি সড়কের দিকে ওই রাস্তা দিয়েই ফিরে চলেছে দমকল বাহিনী। ডয়েলদের র‍্যাঞ্চ ওয়াগনটাকে ধীরে ধীরে পাশ কাটিয়ে যেতে দেখলো তিন গোয়েন্দা। কয়েকজন লোকের সঙ্গে পেছনে বসেছে টেরি। গোয়েন্দাদের দেখলো ঠিকই, কিন্তু সে–ও এতো পরিশ্রান্ত, টিটকারি মারারও বল পেলো না যেন। এমনকি তার গা জ্বালানো হাসিটা পর্যন্ত হাসলো না।

'ওটা কি ডয়েলদের এলাকা?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

মাথা ঝাঁকালো রিগো। 'নালাটাই হলো সীমানা, এদিকটা আমাদের, ওদিকটা ওদের।'

ডানে, উঁচু শৈলশিরা যেন হঠাৎ করে ডুব মেরেছে বালির তলায়। ওটার ওপাশে এখন কি আছে দেখা যায়। গোয়েন্দারা দেখলো, একসারি শৈলশিরা এগিয়ে গেছে দক্ষিণে। নালার বুক থেকে উঠে এসে মোড় নিলো রিগো। পায়েচলা পথটা এখানে ঘাসে ঢেকে গেছে। চলে গেছে কতগুলো ছোট পাহাড়ের ভেতর দিয়ে, অনেকটা গিরিপথের মতো। এতো সরু, দু'জন পাশাপাশি চলতে কষ্ট হয়। ফলে একসারিতে এগোলো দলটা। এখানে কিছু পোড়েনি, আগুন আসতেই পারেনি এ-পর্যন্ত। প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে চললো তিন গোয়েন্দা। পাহাড়ের ঢালে জন্মে রয়েছে নানা জাতের ঝোপ। ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে রয়েছে বাদামী পাথর। মাথার ওপরে এখনও

ঝুলে রয়েছে যেন ছাড়া ছাড়া ধোঁয়া। বৃষ্টি থেমে গেছে পুরোপুরি। মেঘের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এসেও থাকার সময় পানি আর সূর্য, প্রায় ডুবে গেছে।

আগে আগে হাঁটছে এখন মুসা। তার পাশে চলে এলো কিশোর। পায়েচলা পথ ধরে ওরা যখন শেষ শৈলশিরাটার ওপর উঠলো, দলের অন্যেরা তখন প্রায় বিশ গজ পেছনে পড়েছে।

'খাইছে! কিশোওর!' হঠাৎ করে ওপরে হাত তুলে দেখালো মুসা।

ওদের মাথার ওপরে ভেসে যাওয়া ধোঁয়ার ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসছে একজন মানুষ। কালো একটা ঘোড়ার পিঠে বসা। গোধূলীর আলোয় হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে দু'জনে। সামনের দু'পা তুলে দিয়ে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে ঘোড়াটা, সামনের খুর দিয়ে যেন লাথি মারতে চাইছে ধোঁয়াকে, মাথাটা…

'আরে …আরে…,' কথা আটকে যাচ্ছে কিশোরের, 'ও-ওটার মা-ম্মাথা কই!'

চূড়ার ওপর পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক মুণ্ডুহীন ঘোড়া!

'খাইছেরে! ভূউত!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

চার

দেখে মনে হচ্ছে ধোঁয়ার ভেতর থেকে এই বুঝি লাফিয়ে এসে ওদের ঘাড়ে পড়বে ঘোড়াটা।

তার জন্যে অপেক্ষা করলো না আর দু'জনে, ঘুরেই দিলো দৌড়। চিৎকার শুনে ওদের দিকে ছুটে আসতে লাগলো রবিন আর পিনটু। পেছনে সরু পথে চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন রাশেদ পাশা, রিগো, হুগো আর স্টেফানো।

'মাথা নেই! মাথা নেই!' চেঁচালো আবার মুসা। 'ঘোড়া-ভূতটার মাথা নেই! এসো না! পালাও!'

থমকে দাঁড়ালো রবিন। মুসার মাথার ওপর দিয়ে তাকালো ঘোড়াটার দিকে। ধোঁয়া পাতলা হয়ে এসেছে এখন। তাকিয়েই চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার।

'কিশোর, ওটা, ওটা…,' কথা শেষ করতে পারলো না রবিন।

হো হো করে হেসে উঠলো পিনটু। 'আরে কি শুরু করলে! ওটা তো মূর্তি, করটেজের মূর্তি। ধোঁয়া ভাসছে, ফলে ধোঁয়ার ভেতরের মূর্তিটাকে মনে হচ্ছে নড়ছে।'

'অসম্ভব!' কিছুতেই মানতে রাজি নয় মুসা। 'করটেজের মূর্তির ঘোড়ার মাথা ছিলো!'

'মাথা?' তাজ্জব হয়ে গেল পিনটু। 'আরে, তাই তো! মাথা গেল কই! নিশ্চয় কেউ ভেঙে ফেলেছে! ভাইয়া, দেখে যাও!'

অন্যদেরকে নিয়ে এসে হাজির হলো রিগো। ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আশ্চর্য! চল তো দেখি!'

কাঠের মূর্তিটার কাছে এসে জড়ো হলো সবাই। এখনও হালকা ধোঁয়া উড়ছে ওটার ওপরে। বিশাল একটা গাছের কাণ্ড কুঁদে তৈরি হয়েছে ঘোড়া আর মানুষের আস্ত ধড়টা, পুরোটাই একটা অংশ। হাত, পা, তলোয়ার আর জিন আলাদা তৈরি করে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে ওটার সঙ্গে। ঘোড়াটার শরীরের রঙ কালো, তাতে লাল আর হলুদের অলংকরণ করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে ওখানটায় ঝুলে আছে উঁচু জিনের নিচের ঝালর। আরোহীর রঙও কালো। দাড়ি হলুদ, চোখ নীল, আর লাল রঙে আঁকা রয়েছে আরমার-প্লেট। মলিন হয়ে এসেছে সমস্ত রঙ।

'আগে নিয়মিত রঙ করা হতো,' পিনটু জানালো। 'কিন্তু অনেক দিন থেকেই আর তেমন যত্ন নেয়া হয় না। কাঠও নিশ্চয় পচে নরম হয়ে গেছে এতেদিনে।'

মূর্তির পাশে ঘাসের ওপর পড়ে আছে ভাঙা মাথাটা। মুখের হাঁ-এর ফাঁকে লাল রঙ করা। কাছেই মাটিতে পড়ে আছে একটা ধাতব ভারি জিনিস।

'ওটা পড়েই ভেঙেছে,' বললো সে। 'আগুন নেভানোর কেমিক্যালের সিলিণ্ডার। নিশ্চয় প্লেন থেকে পড়েছে, মূর্তিটার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় ফেলা হয়েছে।'

মাথাটা ভালোমতো দেখার জন্যে ওটার কাছে বসে পড়লো মুসা। ঘাড়ের অনেকখানি নিয়ে ভেঙেছে মাথা। ভেতরটা ফাঁপা। নিশ্চয় ওজন কমানোর জন্যেই ওরকম করে তৈরি করা হয়েছিলো। কি যেন একটা বেরিয়ে রয়েছে ভেতর থেকে। টেনে বের করলো সে। 'কি জিনিস?'

'দেখি তো?' ওর হাত থেকে জিনিসটা নিলো কিশোর।

চামড়া আর ধাতুর তৈরি লম্বা, পাতলা একটা সিলিণ্ডারের মতো জিনিস, ভেতরে ফাঁপা। 'হুঁ,' ধীরে ধীরে বললো কিশোর, 'লাগছে তো তলোয়ারের খাপের মতো। ওই যে, কোমরে ঝুলিয়ে নিতো যেগুলো সৈন্যরা...'

'কিন্তু বেশি বড়,' রবিন বললো। 'খাপে খাপে মিলবে না, ঢিলে হয়ে থাকবে তলোয়ার।'

'হ্যাঁ। আর বেল্টে ঝোলানোর জন্যে কোনো হুকটুকও নেই।'

'দেখি,' হাত বাড়ালো রিগো। 'না, তলোয়ারের খাপ না এটা, ঢাকনা। খাপের খোলস। খুব দামী তলোয়ারকে আগে এভাবেই যত্ন করে রাখা হতো। যাতে খাপটারও ক্ষতি না হয়। বিশেষ করে যখন ব্যবহার হতো না। অনেক পুরানো মনে হচ্ছে।'

'পুরানো? দামী?' উত্তেজিত হয়ে উঠলো পিনটু। 'করটেজ সোর্ড-এর খোলস না তো! মুসা, দেখো তো, মাথাটার ভেতরে ভালো করে দেখো...'

ততোক্ষণে ভাঙা ঘাড়ের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে মুসা। ঘাড় দেখলো, মাথা

দেখলো, তারপর পুরো মূর্তিটার ভেতরেই দেখলো। মাথা নেড়ে বললো, 'ঘাড়-মাথার ভেতরে কিছু নেই। ধড় আর পায়ের ভেতরে ফাঁপা নয়। সলিড।'

'বোকামি করছিস, পিনটু,' রিগো বললো। 'অনেক আগেই হারিয়ে গেছে করটেজ সোর্ড।'

'দামী ছিলো?' মুসার প্রশ্ন।

'হয়তো ছিলো, তবে আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না। হয়তো আর দশটা সাধারণ তলোয়ারের মতোই ছিলো ওটা, ঐতিহাসিক কারণে দামী হয়ে গেছে। অনেক দিন নাকি ছিলো আমাদের পরিবারে।'

'করটেজের ব্যক্তিগত জিনিস?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'পারিবারিক ইতিহাস তো তাই বলে। ডন নিরো আলভারেজ, নিউ ওয়ার্ল্ডে আমাদের প্রথম পূর্ব-পুরুষ, একবার গুপ্ত আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছিলেন করটেজের সেনাবাহিনীকে। খুশি হয়ে তখন তাঁকে নিজের তলোয়ারটা উপহার দিয়েছিলেন করটেজ। তলোয়ারটা সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে, স্পেনের রাজা নাকি বিশেষ উপলক্ষে অনেক আয়োজন করে ওটা উপহার দেন করটেজকে। খাঁটি সোনার তৈরি বাঁট, দামী পাথর বসানো। ফলা আর খাপটাতেও নাকি পাথর বসানো ছিলো। ওটা এই অঞ্চলে নিয়ে আসেন নিরো আলভারেজের বংশধর লেফটেন্যান্ট ডারিগো আলভারেজ।'

'তারপর কি হলো ওটার?' আগ্রহী হয়ে উঠেছে কিশোর।

'আঠারোশো ছেচল্লিশ সালে মেকসিকোর যুদ্ধের সময় আমেরিকানরা যখন রকি বীচে ঢুকতে আরম্ভ করে, তখন হারিয়ে যায় ওটা। একেবারে গায়েব।'

'আমেরিকান সৈন্যরা চুরি করেছিলো?'

'হয়তো। দামী জিনিস যা-ই পেতো তুলে নিয়ে যাওয়ার স্বভাব ছিলো ওদের। পরে সেনাবাহিনীর দপ্তরে খোঁজ নেয়া হয়েছে। দপ্তরের লোকেরা সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তলোয়ারটার কথাই শোনেনি ওরা। হয়তো সত্যিই বলেছে, কে জানে। আমার দাদার-বাবার-বাবা পিউটো আলভারেজ লড়াই করেছিলেন আমেরিকানদের বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যে পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে সাগরে পড়ে যান। তাঁর লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। রকি বীচ গ্যারিসন কমাণ্ডারের ধারণা, তলোয়ারটা তখন পিউটোর হাতে ছিলো, ওটা নিয়েই সাগরে পড়েছেন। যা-ই হোক, তলোয়ারটা আর পাওয়া যায়নি।'

'কিন্তু,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর, 'একটা কথা ঠিক, কেউ ঠিক করে বলতে পারে না তলোয়ারটা আসলে কোথায় গেছে। এবং কেউ একজন নিশ্চয় ওই খাপের খোলসটা ঢুকিয়ে রেখেছিলো ঘোড়ার গলার মধ্যে…'

'ভাইয়া! হাসিয়েনডা!' শৈলশিরার কিনারে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো পিনটু।

কি হয়েছে দেখার জন্যে ছুটে গেল সবাই। আঁতকে উঠলো হাসিয়েনডার দিকে তাকিয়ে।

'আরি, ঘরেও আগুন!' রাশেদ পাশা চিৎকার করে বললেন।

'জলদি!' চেঁচিয়ে উঠলো রিগো।

ঢাল বেয়ে দৌড়ে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটলো সবাই। লাফিয়ে উঠছে আগুনের শিখা। আকাশে এখনও ভাসমান দাবানলের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশতে চলেছে নতুন আগুনের কালো ধোঁয়া। হাসিয়েনডার চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে একটা দমকলের গাড়ি, হোসপাইপ হাতে নিয়ে গোলাঘরের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে কয়েকজন দমকল-কর্মী। রিগোর দল ওখানে পৌছতে পৌছতে ক্ষতি যা করার করে ফেললো আগুন, ধড়াস করে ধসে পড়লো পোড়া ছাত। দুটো বাড়িই পুড়েছে ভালোমতো। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

'নাহ,' হতাশ ভঙ্গিতে বললো দমকল বাহিনীর ক্যাপ্টেন, 'লাভ হলো না! দাবানলের আগুনই নিশ্চয় ছিটকে এসেছিলো।'

'তা কি করে হয়?' প্রতিবাদ করলো মুসা। 'বাতাসই তো ছিলো না। কি করে আসবে?'

'নিচে ছিলো না,' ক্যাপ্টেন বললো। 'তবে মাটির কাছে না থাকলেও অনেক সময় ওপরে জোর বাতাস থাকে। আর আগুন লাগলে তো বটেই। গরম বাতাস দ্রুত ওপরে উঠে যায়, সাথে করে নিয়ে যায় স্ফুলিঙ্গ, ওপরের বাতাস সেই স্ফুলিঙ্গকে বয়ে নিয়ে যেতে পারে অনেক দূর। ওরকম ঘটতে দেখেছি। ঘরগুলোর কাঠ শুকিয়ে খটখটে হয়েছিলো। আগুন লাগতে দেরি হয়নি। পুরানো বাড়ির কড়িবর্গার কাঠ বেয়ে আগুন নিচে নেমেছে, টালির ছাতের নিচে চলে আসার পর সেই আগুনকে আর ছুঁতে পারেনি বৃষ্টি। আরও আগে দেখলে হয়তো বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু তখন এতো ধোঁয়া ছিলো, কোনটা যে কোনখান থেকে উড়ছে বোঝা যায়নি...'

পুরানো হাসিয়েনডার দুটো দেয়াল ধসে পড়ার শব্দে থমকে গেল ক্যাপ্টেন। দ্রুত কমে আসছে আগুন, পোড়ানোর মতো কিছু না পেয়ে। স্তব্ধ হয়ে গেছে দুই ভাই, পিনটু আর রিগো। রাশেদ পাশা চুপ, ছেলেরা নীরব। কি বলবে?

নীরবতা ভাঙলো মুসা। চেঁচিয়ে উঠলো, 'জিনিসগুলো!'

ভাঁড়ারের দিকে ঝট করে ফিরলেন রাশেদ পাশা। কিশোর আর রবিনও তাকালো। তবে এগোনোর চেষ্টা করলো না কেউ। পোড়া ধ্বংসস্তূপ। কয়েকটা দেয়াল এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে, তবে ভেতরের জিনিস কিছুই নেই, পুড়ে ছাই। রাশেদ পাশার কেনার মতো কিছুই নেই ওখানে।

'সব গেছে!' কান্নার সুর বেরোলো রিগোর কণ্ঠ থেকে। 'সঅব! বীমাও করানো

ছিলো না! সব গেল আরকি আমাদের!'

'যাবে কেন?' ফুঁসে উঠলো পিনটু, কার বিরুদ্ধে রাগ কে জানে। 'আবার হাসিয়েনডা বানিয়ে নেবো আমরা।'

'তা নাহয় নিলাম। ধারের টাকা শোধ করবো কোত্থেকে, ট্যাক্স দেবো কি দিয়ে? জায়গাই তো রাখতে পারবো না, ঘর বানিয়ে কি হবে?'

'চাচা,' রাশেদ পাশার দিকে তাকিয়ে বললো কিশোর, 'জিনিসগুলো আমরা কিনে নিয়েছিলাম। টাকা দিইনি বটে, কথা তো দিয়েছি। তারমানে আমাদের জিনিস পুড়লো। টাকাটা আমাদের দিয়ে দেয়া উচিত।'

সামান্যতম দ্বিধা না করে হাসলেন রাশেদ পাশা কিশোরের দিকে চেয়ে, তারপর মাথা ঝাঁকালেন, 'ঠিক বলেছিস, কিশোর। পোড়ার আগে আমরা সরাতে পারিনি, সেটা আমাদের দোষ...'

জোরে জোরে মাথা নাড়লো রিগো। 'না, তা হয় না। ভিক্ষে আমরা নিতে পারবো না। বাপ-দাদার অপমান করতে পারবো না এভাবে। তারচে জায়গাই বিক্রি করে দিয়ে শহরে চলে যাবো। কিংবা ফিরে যাবো মেকসিকোতে।'

'কিন্তু আপনারা এখন আমেরিকান,' বোঝানোর চেষ্টা করলো রবিন। 'অনেক আমেরিকানের চেয়ে আলভারেজরা আগে এসেছিলো এই আঞ্চলে।'

'নিশ্চয়ই,' রবিনের সঙ্গে সুর মেলালো কিশোর। কি যেন ভাবছে। 'প্রয়োজনীয় টাকা চেষ্টা করলে অন্যখানেও পেয়ে যেতে পারেন।'

বিষণ্ন হাসি হাসলো রিগো। 'আর কোনো উপায় নেই, কিশোর।'

'হয়তো আছে,' ধীরে ধীরে বললো গোয়েন্দাপ্রধান। অনেক দূরের ব্যাপার যদিও সেটা...যা-ই হোক, আপনাদের টাকাটা কি এখনই শোধ করতে হবে? না কিছু দিন সময় পাবেন? ঘর তো পুড়ে গেল, ক'দিন অন্য কারও বাড়িতে থাকতে পারবেন?'

'পারবো। সিনর হেরিয়ানোর বাড়িতে।' পিনটু জানালো।

'হ্যাঁ,' বললো তার ভাই। 'টাকাটাও কয়েক দিন পরে দিলে চলবে। কিন্তু কিশোর, পাবো কোথায়?'

'তলোয়ারটার কথা ভাবছি আমি,' জবাব দিলো কিশোর, 'করটেজ সোর্ড। মেকসিকোর যুদ্ধের সময় ওটা চুরি যায়। একশো বছরেরও বেশি হয়ে গেছে, ইতিমধ্যে কোথাও না কোথাও ওটা বেরোনোর কথা। সৈন্যরা চুরি করলে বিক্রি করে দিতো। আর যেহেতু বেরোয়নি, সেহেতু আমার সন্দেহ হচ্ছে, আদৌ চুরি হয়েছিলো কিনা ওটা। হয়তো এখনও কোথাও লুকানোই রয়েছে, ওই খোলসটার মতো!'

'ঠিক বলেছো!' তুড়ি বাজালো পিনটু। 'ভাইয়া, ও ঠিকই...'

'আরে দূর!' বাতাসে থাবা মারলো যেন রিগো। 'তা-ও কি হয় নাকি?

তলোয়ারটা না বেরোনোর একশো একটা কারণ থাকতে পারে। হয়তো সাগরে পড়ে গিয়েছিলো সত্যিই, কিংবা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো অন্য কোনোভাবে। কিংবা সৈন্যরা নিয়ে গিয়ে এমন কারো কাছে বিক্রি করেছে, যারা আজ পর্যন্ত বের করেনি ওটা, লুকিয়ে রেখেছে। অ্যানটিক জিনিস অনেকে ওভাবে লুকিয়ে রাখে। কিংবা হয়তো বহুদূরে চলে গেছে ওটা, একেবারে চীন দেশে, যেখান থেকে এখানে খোঁজ আসার সম্ভাবনা খুবই কম। খোলসটা দেখেই তুমি এতো আশা করছো। হতে পারে ওটা অন্য কোনো তলোয়ারের। তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করার কথা ভাবছো, কিশোর পাশা। স্রেফ ছেলেমানুষী। ফ্যানটাসি দিয়ে আমাদের র‍্যাঞ্চকে রক্ষা করা যাবে না।'

'আপনার কথায় যুক্তি আছে,' মোটেও দমলো না কিশোর। 'কিন্তু খোলসটা আপনাআপনি মূর্তির ভেতরে ঢুকে যায়নি, ঢোকানো হয়েছে। ভেবে দেখুন, শহরে তখন ছিলো শত্রুসেনা, ডন পিউটো আলভারেজ যদি তলোয়ারটা লুকিয়ে ফেলে থাকেন, অবাক হওয়ার কিছু আছে কি? ওরকম একটা দামী জিনিস! পান আর না পান, অন্তত খোঁজার চেষ্টা তো করে দেখতে পারেন। আমরা আপনাকে সাহায্য করতে রাজি আছি। আর মোটেই ছেলেমানুষী করছি না আমরা। এ-পর্যন্ত ওরকম অনেক জিনিস খুঁজে বের করেছি, যেগুলো কখনও পাওয়া যাবে না বলে হাল ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো।'

'ও ঠিকই বলছে, ভাইয়া,' উত্তেজনায় টগবগ করছে পিনটু। 'ওরা দুর্দান্ত গোয়েন্দা, আমি জানি! এই কিশোর, কার্ড দেখাও না তোমাদের। আর পুলিশের ক্যাপ্টেন ফ্লেচারের সার্টিফিকেটটা। আছে না সঙ্গে?'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

দেখলো রিগো। 'বেশ, বুঝলাম তোমরা গোয়েন্দা। অভিজ্ঞতাও আছে। পুলিশের একজন ক্যাপ্টেন ফালতু কথা বলবেন না। কিন্তু একশো বছর আগে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া একটা তলোয়ার কিভাবে খুঁজে বের করবে?'

'একটা সুযোগ তো অন্তত দিয়ে দেখো?' পিনটু বললো।

'হ্যাঁ,' ছেলেদের পক্ষ নিলেন রাশেদ পাশা, 'তাতে অসুবিধেটা কি? পেলে তো ভালোই।'

পুরানো হাসিয়েনডার ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো রিগো। 'বেশ, করো চেষ্টা। আমার সাধ্যমতো সাহায্য আমি করবো। কিন্তু তলোয়ার পাবে বলে আমার মনে হয় না। যাকগে, কোত্থেকে কাজ শুরু করতে চাও? কিভাবে? কি সূত্র নিয়ে?'

'সেটা ভেবে বের করে ফেলবো,' কিশোর বললো। তবে গলার জোর কমে গেছে তার।

ট্রাক নিয়ে ফিরে এলো বোরিস। রিগো জানালো, হুগো আর স্টেফানোকে নিয়ে হেরিয়ানোর বাড়ি চলে যাবে।

বাড়ি ফিরে চললো তিন গোয়েন্দা। ট্রাকের পেছনে উঠেছে।

'কিশোর,' মুসা জিজ্ঞেস করলো, 'কোনখান থেকে শুরু করবো?'

'কেন?' হেসে বললো গোয়েন্দাপ্রধান, গলার জোর আবার বেড়েছে। 'তোমার হাতেই তো রয়েছে জবাব।'

'আমার হাতে?' অবাক হয়ে পুরানো তলোয়ারের খোলসটার দিকে তাকালো মুসা। সাথে করে নিয়ে এসেছে ওটা।

'এখনও তেমন আশা করতে পারছি না,' কিশোর বললো, 'তবে একটা জিনিস চোখে লেগেছে আমার। খোলসটার ধাতব অংশে খুদে লেখার মতো কিছু দেখেছি। সাংকেতিক চিহ্নও হতে পারে। মিস্টার ক্রিস্টোফারের সাহায্য নিতে পারি আমরা। তিনি আমাদেরকে এমন কারো খোঁজ দিতে পারেন, যে ওগুলোর মানে বুঝিয়ে দিতে পারবে।'

চোখ চকচক করে উঠলো তার। 'মনে হয় পথ আমরা পেয়ে গেছি! করটেজ সোর্ড খুঁজে বের করার সূত্র বুঝি পায়ে হেঁটে এসে ধরা দিলো আমাদের হাতে!'

পাঁচ

'ফ্যানটাসটিক!' চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর ওয়ালটার সাইনাস, চকচক করছে চোখ। 'কোনো সন্দেহ নেই, ইয়াং ম্যান, কোনো সন্দেহ নেই! এগুলো ক্যাসটিলির রয়াল কোট অভ আরমসেরই চিহ্ন!'

শুক্রবার বিকেল। হলিউডে প্রফেসরের ষ্টাডিতে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। সেদিন সকালে ফোন করে বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারকে সব বলেছিলো কিশোর, তিনিই তাঁর বন্ধু সাইনাসের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন। স্প্যানিস আর মেকসিকান ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ওয়ালটার সাইনাস। সেদিন ইস্কুল ছুটি হলে স্যালভিজ ইয়ার্ডের ট্রাকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ওরা। চালক অবশ্যই বোরিস।

'তলোয়ারের এই খোলসটা ষোল শতকের গোড়ার দিকে তৈরি,' বললেন প্রফেসর। 'জিনিসটা ছিলো স্পেনের রাজার, আমি শিওর। তোমরা কোথায় পেলে?'

মূর্তিটার কথা জানালো কিশোর। 'জিনিসটা কি করটেজ সোর্ডের? অতো পুরানো?'

'করটেজ সোর্ড?' ভুরু উঠে গেল প্রফেসরের। 'হ্যাঁ, তা হতে পারে। তবে

তলোয়ারটা হারিয়ে গেছে। আঠারোশো ছেচল্লিশ সালে পিউটো আলভারেজের সঙ্গে সাগরে পড়ে হারিয়ে গেছে ওটা...কেন, একথা জিজ্ঞেস করছো কেন? ওটাও পেয়েছো নাকি?'

'না, স্যার,' জবাব দিলো রবিন।

'এখনও পাইনি,' এমনভাবে হাসলো মুসা, যেন অদূর ভবিষ্যতে পাবে।

'স্যার,' কিশোর জিজ্ঞেস করলো, 'পিউটো আলভারেজের সত্যি সত্যি কি হয়েছিলো, একথা কোথায় গেলে জানতে পারবো?'

'রকি বীচ হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে গেলে পেতে পারো,' প্রফেসর বললেন। 'আলভারেজদের তো বটেই, মেকসিকোর যুদ্ধের ইতিহাসও জানতে পারবে।'

প্রফেসরকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠতে গেল ছেলেরা। হাত তুললেন তিনি, 'এক মিনিট। আচ্ছা, তলোয়ারটার কথা জিজ্ঞেস করলে কেন? খোঁজটোজ পেয়েছো নাকি ওটার?'

'পাইনি এখনও,' কিশোর বললো। 'পাওয়ার আশা করছি আরকি।'

'তাই?' আবার চকচকে হলো প্রফেসরের চোখ। 'পেলে জানিও আমাকে।'

'নিশ্চয়ই জানাবো, স্যার,' বলে উঠে পড়লো কিশোর।

বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। ওদেরকে নামিয়ে দিয়ে ট্রাক নিয়ে একটা কাজে গেছে বোরিস, এখনও ফেরেনি। একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ছেলেরা।

'তলোয়ারটার কথা শুনে কেমন চমকে গেলেন প্রফেসর, দেখেছো?' মুসা বললো।

'হ্যাঁ,' ভ্রূকুটি করলো কিশোর, 'অনেকেই ওরকম চমকাবে। করটেজ সোর্ডের নাম পারতপক্ষে আর কারও কাছে বলা উচিত হবে না। লোভে পড়ে কে এসে বাগড়া দিতে শুরু করবে কে জানে! একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেছি, খোলসটা করটেজ সোর্ডেরই, আর ওটা খুঁজে পাওয়ারও চান্স আছে।'

'হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে যাবে?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'যাবো।'

'কি খুঁজবো ওখানে?' মুসার প্রশ্ন।

'জানি না এখনও,' জবাব দিলো কিশোর। 'ভাবছি, ইতিহাস থেকে কোনো সূত্র পেয়েও যেতে পারি।'

বোরিস আসতে আসতে বৃষ্টি বেড়ে গেল অনেক। ট্রাকের পেছনে ওঠার আর উপায় নেই, কেবিনেই গাদাগাদি করে বসতে হলো সবাইকে। রকি বীচে পৌঁছে ওদেরকে হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে নামিয়ে দিয়ে আরেকটা কাজে চলে গেল বোরিস।

ঘরটা নীরব, নির্জন, শুধু নির্দিষ্ট জায়গায় বসে রয়েছেন অ্যাসিসটেন্ট হিসটোরিয়ান। তিন গোয়েন্দাকে চেনেন। হেসে বললেন, 'আরে, তিন গোয়েন্দা যে। তা কি মনে করে? নতুন কোনো কেস-টেস?'

'এই কর···,' শুরু করেই 'আঁউউ' করে উঠে থেমে গেল মুসা। তার পা মাড়িয়ে দিয়েছে কিশোর। হিসটোরিয়ানের দিকে চেয়ে হেসে বললো তাড়াতাড়ি, 'না, স্যার, কোনো কেস-টেস না। ইস্কুলের ম্যাগাজিনের জন্যে একটা গবেষণামূলক লেখা লিখতে চায় রবিন। তাকে সাহায্য করছি। রকি বীচ আলভারেজ ফ্যামিলির ওপর গবেষণা করছে সে।'

'ও। আলভারেজদের ফাইল তো আছে আমাদের কাছে। জায়গামতোই এসেছো।'

'ডন পিউটো আলভারেজের কথাও নিশ্চয় লেখা আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে গেলেন হিসটোরিয়ান। দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি তাকে বই ঠাসা। কতগুলো আলমারি আর শেলফও আছে। শেলফ থেকে দুটো ফাইল বের করে আনলেন তিনি। হেসে বাড়িয়ে দিলেন ছেলেদের দিকে।

ফাইলের আকার দেখেই দমে গেল মুসা। তবে কিশোর আর রবিনের মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না।

ফাইল দুটো কোণের একটা টেবিলের কাছে বয়ে নিয়ে এলো কিশোর। 'এটা তোমরা দেখো।' যুদ্ধের ওপর লেখা ফাইলটা রবিন আর মুসার দিকে ঠেলে দিলো সে। নিজে নিলো আলভারেজদের ওপর লেখা ফাইল। 'এটা আমি দেখছি।'

পরের দুটো ঘণ্টা পাতার পর পাতা উল্টে গেল ওরা। ডন পিউটো আলভারেজ আর করটেজ সোর্ডটার কথা কিছু লেখা আছে কিনা খুঁজছে। হিসটোরিয়ান কাজে ব্যস্ত, ছেলেদেরকে বিরক্ত করলেন না। ইতিমধ্যে অন্য কেউ ঢুকলো না ওঘরে।

দুই ঘণ্টা পর দুটো ফাইলই ওল্টানো শেষ হলো। তার ফাইলে একটা জিনিসই শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করলো কিশোরের, একটা চিঠি পুরানো হতে হতে হলদে হয়ে এসেছে কাগজ। দুই সহকারীকে জানালো সে, 'ছেলের কাছে এই চিঠি লিখেছিলেন ডন পিউটো আলভারেজ। রকি বীচে একটা ঘরে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়েছে তখন। ওই সময় তাঁর ছেলে ছিলো মেকসিকো সিটিতে, মেকসিকান আর্মির একজন অফিসার।'

'কি লিখেছেন?' জানতে চাইলো মুসা।

'ভাষাটা স্প্যানিশ, তা-ও আবার পুরানো ঢঙে,' নাক কুঁচকালো কিশোর, 'খুব কঠিন। ভালো বুঝলাম না। তবে এটুকু বুঝেছি, সাগরের কাছে একটা বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছিলো ডন পিউটো আলভারেজকে। লোকজন বোধহয় দেখা করতে আসতো

তাঁর কাছে, ওরকম কিছু লিখেছে। বিজয়ের পরে ছেলের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি, এরকম কথাও আছে। বোধহয় পালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত এটা, তবে আমি শিওর না। চিঠিটার তারিখ তেরো সেপ্টেম্বর, উনিশশো ছেচল্লিশ। তলোয়ারটার কথা কিচ্ছু লেখা নেই।'

'বন্দি অবস্থায় লিখেছে, না?' চিন্তিত ভঙ্গিতে গাল চুলকালো মুসা। 'আচ্ছা, কিশোর, সাংকেতিক কিছু লেখা নেই তো?'

'তা থাকতে পারে,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'রিগোকে দিয়ে পড়াতে হবে। মানে ঠিকমতো না বুঝলে কিছু বলা যাচ্ছে না...'

'পড়িয়ে লাভ হবে বলে মনে হয় না,' রবিন বললো। 'এই যে আরেকটা চিঠি, আমেরিকান আর্মি লিখেছিলো ডন পিউটোর ছেলে স্যানটিনোকে। যুদ্ধের পর সে তখন বাড়ি ফিরেছে। চিঠিতে দুঃখপ্রকাশ করেছে আমেরিকান সরকার, ডন পিউটোর মৃত্যুর জন্যে। আঠারোশো ছেচল্লিশের পনেরোই সেপ্টেম্বর পালাতে গিয়ে মারা পড়েন ডন। তাঁকে গুলি করা ছাড়া নাকি আর কোনো উপায় ছিলো না সৈন্যদের, কারণ তিনি সশস্ত্র ছিলেন, এবং আগে হামলা করেছিলেন। গুলি খেয়ে সাগরে পড়ে যান তিনি...'

ওসব তো পুরানো খবর,' বাধা দিয়ে বললো মুসা, 'জানি আমরা। নতুন কি লিখেছে?'

'ডনের এভাবে সাগরে পড়ে যাওয়ার কথা রিপোর্ট করেছে জনৈক সার্জেন্ট রবার্ট ডগলাস। তার পক্ষে সাক্ষি দিয়েছে দু'জন করপোরাল, তিনজনেই তখন ওই বাড়িতে পাহারায় ছিলো। ডগলাসের লেখা রিপোর্টটাও আছে এই ফাইলে,' বলে ফাইলে টোকা দিলো রবিন। 'একথাও বলা হয়েছে, ডনের হাতে তখন একটা তলোয়ার ছিলো।'

ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। মুসার চোখে নিরাশা।

'সার্জেন্টের ধারণা,' বলে চললো রবিন, 'তলোয়ারটা লুকিয়ে ডনের কাছে নিয়ে এসেছিলো তাঁর কোনো সহচর, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো যারা, তাদেরই কেউ।' মুখ তুললো রবিন। 'তারমানে, তলোয়ার হাতে নিয়েই সাগরে পড়েছিলেন ডন পিউটো।'

বাইরে জোর বৃষ্টি হচ্ছে। জানালা দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো কিশোর। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলো, 'মুসা, তুমি কিছু পেয়েছো?'

'তেমন কিছু না,' জবাব দিলো মুসা হতাশ কণ্ঠে। 'আমিও একটা চিঠি পেয়েছি। ২৩ সেপ্টেম্বর লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যারিসনের ওপর মেকসিকান হামলার বিবরণ চেয়ে কমাণ্ডিং অফিসারের কাছে চিঠিটা লিখেছেন একজন উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা। কয়েকজন সৈন্যের নাম উল্লেখ করেছেন, যারা ছুটি না নিয়েই নিরুদ্দেশ হয়েছে। ষোল

সেপ্টেম্বরের পর থেকে তাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানানো হয়েছে। সামরিক নিয়মে পলাতক ঘোষণা করা হয়েছে ওদেরকে। ডন পিউটো কিংবা তলোয়ারটার কথা কিছু লেখা নেই...'

মুসার কথা শেষ হওয়ার আগেই কিশোর জানতে চাইলো, 'পলাতকদের নাম কি?'

'সার্জেন্ট রবার্ট ডগলাস, করপোরাল হ্যানসন, এবং করপোরাল...'

'ডি. ফাইবার!' মুসার কথা শেষ হওয়ার আগেই চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'এদের কথাই লেখা আছে আমার চিঠিটাতেও! ডন পিউটোকে পাহারা দিয়ে রেখেছিলো!'

চিৎকার শুনে অবাক হয়ে যে ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন হিসটোরিয়ান খেয়ালই করলো না ওরা।

'ডগলাস, হ্যানসন এবং ফাইবার,' খুশি খুশি মনে হলো কিশোরকে। 'আঠারোশো ছেচল্লিশের ষোল সেপ্টেম্বর থেকে নিখোঁজ!'

'হ্যাঁ, কিন্তু...' হঠাৎ চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। 'খাইছে! ওরাই ডনকে গুলি করেনি তো?'

'ওরা রিপোর্ট করেছে যে গুলি খেয়েছেন ডন,' কিশোর বললো। 'কে করেছে, তা বলেনি।'

'ওরাই গুলি করেছে, তাই না কিশোর?' জিজ্ঞাসু চোখে গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকালো রবিন।

'তাই তো মনে হয়,' গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। 'ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক। যারা ডনকে আগের দিন গুলি করে মারলো, পরদিন থেকেই নিখোঁজ হয়ে গেল তারা, পলাতক ঘোষিত হয়ে গেল। তারপর আর কোনো খবরই নেই তাদের।'

'তলোয়ারটা চুরি করে পালায়নি তো?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'পালাতেও পারে। কিন্তু তাহলে ওই খোলসটা মূর্তির ভেতরে লুকালো কে, এবং কেন? অবাক লাগছে আমার!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'রিগোর সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'এহ্‌হে, অনেক দেরি হয়ে গেছে,' ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে বলে উঠলো মুসা। 'তাই তো বলি, পেটের মধ্যে এমন মোচড় দেয় কেন? খুব খিদে পেয়েছে, বুঝলে, আমি বাড়ি যাবো।'

'আমিও,' রবিন বললো।

কিশোর বললো, 'তাহলে কাল সকালেই রিগোর সঙ্গে দেখা করতে যাবো।'

সোসাইটির ডুপ্লিকেটিং মেশিনে চিঠি আর দলিলের কপি করে নিলো ওরা। তারপর হিসটোরিয়ানকে তাঁর সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলো। তখনও

বৃষ্টি পড়ছে। বোরিস আসেনি। দাঁড়িয়ে থাকতে চাইলো না আর মুসা। তাছাড়া বাড়ি যাচ্ছে, ভিজে গেলেই বা কি। বাড়ি গিয়ে কাপড় পাল্টে নেবে।

ভিজে চুপচুপে হয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ডে পৌঁছলো তিনজনে। রবিন আর মুসা সাইকেল ফেলে গিয়েছিলো এখানে, নিয়ে রওনা হলো বাড়ির দিকে। গেট দিয়ে বেরোতেই দেখা শুঁটকি টেরির সঙ্গে। টিটকারি দিয়ে বললো, 'আহারে, ইস্, একেবারে গোসল করে ফেলেছে! এসো, গাড়িতে ওঠো, পৌঁছে দি।'

'শুঁটকির গন্ধে বমি করার চেয়ে ভিজে যাওয়া অনেক ভালো,' জবাব দিলো মুসা।

চকিতের জন্যে রাগ ঝিলিক দিয়ে উঠলো টেরিয়ারের চোখে। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'দেখো, আলভারেজ র‍্যাঞ্চের ধারেকাছে যাবে না আর। সাবধান!'

টেরিয়ারের গাড়ি দেখে এগিয়ে এসেছে কিশোর। তার কথা কানে গেছে। জিজ্ঞেস করলো, 'ধমক দিচ্ছো?'

'ওদের র‍্যাঞ্চটার লোভ, না?' কড়া গলায় বললো মুসা। 'ছুঁতেও দেয়া হবে না তোমার বাপকে, মনে রেখো!'

দাঁত বের করে হাসলো টেরি। 'কি করে ঠেকাবে?'

'আমরা তলো…,' প্রায় বলে দিয়েছিলো মুসা। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠলো কিশোর, 'দেখতেই পাবে, কি করে ঠেকাই।'

'যা করার তাড়াতাড়ি করো,' খিকখিক করে হাসলো টেরি, 'সময় বেশি পাবে না। হপ্তাখানেকের মধ্যেই দখল করে নেবো ওটা। আলভারেজদের কপালে শনি আছে। ওদের সঙ্গে খাতির লাগিয়ে কিছু করতে গেলে তোমাদেরও ভালো হবে না!'

তিন গোয়েন্দাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল টেরি। অঝোর বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। ভাবছে, বড় বেশি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো বলে গেল শুঁটকি!

ছয়

শনিবারে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠলো কিশোর। বৃষ্টি থামেনি, পড়েই চলেছে। তবে বৃষ্টি তাকে আলভারেজ র‍্যাঞ্চে যাওয়া ঠেকাতে পারতো না, যেতে পারলো না অন্য কারণে। ফোন করে রবিন আর মুসা জানালো, বাড়িতে জরুরী কাজ আছে, দুপুরের আগে আসতে পারবে না।

গেল মনটা খারাপ হয়ে। শেষে আর ঘরে বসে থাকতে না পেরে ভিজে ভিজেই গিয়ে ইয়ার্ডের কাজে সাহায্য করলো বোরিস আর রোভারকে।

দুপুরের খাবার পরে এলো রবিন আর মুসা। বৃষ্টি থামেনি, তবে হালকা হয়ে

এসেছে। রেনকোট পরে এসেছে দু'জনেই। কিশোরও পরে নিলো। সাইকেল নিয়ে আলভারেজ র‍্যাঞ্চে রওনা হলো তিনজনে। কাউন্টি রোড ধরে চললো। সাথে ম্যাপ নিয়ে নিয়েছে কিশোর, যাতে পাহাড়ের গলিঘুপচি দিয়ে যাওয়ার সময় পথ ভুল না হয়। আলভারেজ হাসিয়েনডার পোড়া ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে এসে সহজেই খুঁজে বার করলো প্রতিবেশী রডরিক হেরিয়ানোর বাড়িটা। অ্যাভোকাডোর ফার্ম করা হয়েছে ওখানে।

পুরানো ধাঁচের পুরানো বাড়ি। মস্ত গোলাঘর, তার পেছনে ছোট ছোট দুটো কটেজ। বৃষ্টির মধ্যেই কাঠ ফাড়ছে পিনটু. সেখানে হাজির হলো তিন গোয়েন্দা।

'তোমার ভাই আছে ঘরে?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

'আছে, এসো,' কুড়ালটা হাত থেকে ফেলে দিলো পিনটু।

একটা কটেজে ঢুকলো ওরা। মাত্র দুটো ঘর, আর ছোট্ট রান্নাঘর। 'ফায়ারপ্লেসে তখন আগুন জ্বালছে রিগো। তিন গোয়েন্দাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাসলো। 'এসো এসো।'

প্রফেসর সাইনাসের কথা বললো পিনটু আর রিগোকে কিশোর। বললো, 'তিনি বলেছেন করটেজ সোর্ডেরই খোলস ওটা।'

'পালাতে গিয়েও মারা পড়েননি পিউটো আলভারেজ,' যোগ করলো মুসা।

'পড়েননি এটা জোর দিয়ে বলা যায় না,' শুধরে দিয়ে বললো রবিন, 'তবে কথাটা ঠিক না-ও হতে পারে এই আরকি।'

কপি করে আনা দলিলগুলো দুই ভাইকে দেখালো কিশোর।

'এতে আর নতুন কি বোঝা গেল?' হাত ওল্টালো রিগো।

'কেন, কিছুই সন্দেহ হচ্ছে না আপনার? ডন পিউটো পালাতে গিয়ে মারা পড়েছে বলে যারা রিপোর্ট করেছে, তাদেরকেই পরদিন থেকে পলাতক ঘোষণা করেছে আর্মি, এটা সন্দেহজনক নয়? তিন তিনজন লোক একই সাথে পালালো!'

'হুঁ,' মাথা দোলালো রিগো, 'আমার সন্দেহই তাহলে ঠিক। এখন তোমাদের বলি, তলোয়ারটা সাগরে পড়ে হারিয়ে গেছে, কথাটা বিশ্বাস হয়নি আমার। বুঝতে পারছি, ওরা তলোয়ারটা কেড়ে নিয়ে ডনকে খুন করে সাগরে ফেলে দিয়েছে। রিপোর্ট করেছে, পালাতে গিয়ে মারা পড়েছেন ডন। তারপর তলোয়ার নিয়ে পালিয়েছে তিনজনে।'

'হয়তো,' কিশোর বললো। 'কিন্তু খোলসটার ব্যাপারে কি বলবেন? মূর্তির ভেতরে কে লুকিয়েছে ওটা? একমাত্র ডনের কথাই মনে আসে আমার। আমেরিকানদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে একাজ করেছেন হয়তো তিনি। কোনো কারণে খোলসটা ওখানে লুকিয়ে তলোয়ার আর খাপটা আলাদা জায়গায় নিয়ে গেছেন।'

'তলোয়ারটা ডনের কাছে নিয়ে গেছে যে, সে-ও তো লুকাতে পারে,' যুক্তি দেখালো রিগো।

'এই আরেকটা রহস্য! দামী একটা তলোয়ার জেনেশুনে ওভাবে শত্রুর গুহায় নিয়ে যাওয়া হলো কেন? ধরে নিলাম অস্ত্র দরকার ছিলো ডনের, একটা বন্দুক নিয়ে গিয়ে দিলেই তো আরও ভালো হতো। বন্দুকের বিরুদ্ধে তো বন্দুকই দরকার, তলোয়ার কেন? তা-ও আবার পাথর বসানো?'

শ্রাগ করলো রিগো। 'পাথর ছিলোই তা কিন্তু শিওর না।'

'আমি কি ভাবছি, শুনুন। ডন পিউটোকে অ্যারেস্টই করেছিলো আমেরিকানরা কর্টেজ সোর্ডের জন্যে। হ্যাঁ, রবিন, প্রফেসর সাইনাস কি বলেছেন আমি জানি,' রবিন মুখ খুলতে যাচ্ছিলো দেখে তাকে থামিয়ে দিলো কিশোর। 'ডন সেটা বুঝতে পেরে মূর্তির ভেতরে লুকিয়ে ফেলেন তলোয়ারটা, ধরা পড়ার আগেই। বন্দিশালা থেকে যখন পালালেন তিনি, তাঁর পিছু নিলো সার্জেন্ট ডগলাস আর তার দুই করপোরাল। রিপোর্ট করে দিলো যে পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে তলোয়ারসহ সাগরে পড়ে গেছেন ডন। ডন বুঝতে পারলেন ওদের উদ্দেশ্য, পিছু যে নিয়েছে হয়তো টের পেয়ে গিয়েছিলেন। তলোয়ারটাকে নতুন আরেক জায়গায় লুকালেন তিনি। খোলসটা মূর্তির মধ্যেই রেখে দিলেন ওদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যে।'

'তারপর ডনের কি হলো?' প্রশ্ন করলো রিগো।

'আমি জানি না।'

'কিছু না জেনেই একটা গল্প বানিয়ে বলে দিলে তুমি, কিশোর পাশা,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগলো রিগো। 'ধরলাম তোমার কথা সত্যি, মানে ডনের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা, আর তলোয়ারটাও তিনি লুকিয়েছেন। কোথায়? আর কিভাবে সেটা খুঁজে বের করবে?'

'ডনের চিঠিটা দেখাও তো কিশোর,' রবিন বললো।

চিঠির কপি বের করে রিগোর হাতে দিলো কিশোর। 'এটার অনুবাদ করুন। রবিন, লিখে নাও।'

চিঠিটা একবার দেখেই রিগো বললো, 'এই চিঠি আমি দেখেছি। আমার দাদা এটা বহুবার পড়েছে, হারানো তলোয়ারের সূত্র খুঁজেছে, কিছুই পায়নি। ঠিক আছে, আমি অনুবাদ করছি, লিখে নাও। কনডর ক্যাসল, তেরো সেপ্টেম্বর, আঠারোশো ছেচল্লিশ। মাই ডিয়ার স্যানটিনো, আশা করি কুশলেই আছো, আর তোমার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছো খাঁটি মেকসিকানের মতো। ইয়াংকিরা এসে ঢুকেছে আমাদের হতভাগ্য শহরে, আর আমি গ্রেপ্তার হয়েছি। কেন ধরা হয়েছে আমাকে, বলেনি ওরা তবে আন্দাজ করতে পারছি, বুঝলে? সাগরের কাছে ক্যাবরিলো হাউসে আমাকে বন্দী

করে রাখা হয়েছে, কাউকে দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না আমার সঙ্গে। আমাদের পরিবারের সবাই, এবং সবকিছু ভালো আছে, নিরাপদে আছে। জানি, শীঘ্রি, জয় আমাদের সুনিশ্চিত।'

নোটবুকে লিখে নিয়েছে রবিন। দ্রুত একবার পড়লো। বললো, 'কেন ধরা হয়েছে আন্দাজ করতে পেরেছেন তিনি। তলোয়ারটার জন্যেই কি?'

'এবং সব কিছু!' বলে উঠলো মুসা। 'তারমানে কি স্যানটিনোকে বোঝাতে চেয়েছেন তলোয়ারটা নিরাপদে আছে?'

'দেখি,' নোটবুকের জন্যে হাত বাড়ালো কিশোর। বললো, 'হয়তো। তবে একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেলাম এখন, মিথ্যে কথা বলেছে সার্জেন্ট ডগলাস।'

'কি করে শিওর হলে?' রিগো জানতে চাইলো।

'রিপোর্টে বলেছে ডগলাস, যে তলোয়ার সহ পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরেছেন ডন। তলোয়ারটা তাঁকে পৌছে দিয়েছিলো একজন বন্ধু বা ওরকম কেউ। কিন্তু ডনের সঙ্গে কাউকে দেখাই করতে দেয়া হতো না, তাহলে কি করে দিলো তলোয়ার? তারমানে হাতে তলোয়ার পৌছেনি। বানিয়ে বলেছে ডগলাস, যাতে সবাই ভাবে তলোয়ারটা হারিয়ে গেছে। কেউ আর ওটার খোঁজ না করে। তাহলে নিশ্চিন্তে খুঁজতে পারবে সে।'

চিঠির দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমার কথায় যুক্তি আছে, কিন্তু...'

থেমে গেল একটা শব্দে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। তার মাঝেই হলো আওয়াজটা, লাকড়ির ওপর লাকড়ি পড়ার। পরক্ষণেই শোনা গেল পায়ের শব্দ।

'এই, দাঁড়াও।' চেঁচিয়ে উঠলো একটা কণ্ঠ।

ঘর থেকে ছুটে বেরোলো তিন গোয়েন্দা, রিগো আর পিনটু। দেখলো গোলাঘরের ওপাশ দিয়ে একটা ঘোড়া দৌড়ে যাচ্ছে। সাদা চুল, ছোটখাটো একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন চত্বরে।

'জানালায় আড়ি পেতে শুনছিলো,' রিগোকে জানালেন তিনি। 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসছিলাম, এই সময় দেখি...আমার সাড়া পেয়েই লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে পড়লো লাকড়ির ওপর। ঘোড়াটা রেখে দিয়েছিলো গোলার পেছনে।'

'লোকটা কে, চিনেছেন?' পিনটু জিজ্ঞেস করলো।

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। 'চোখে তো ভালো দেখতে পাই না, চিনতে পারিনি।'

'ভিজে যাচ্ছেন, ডন,' বৃদ্ধকে খুব সম্মান দেখিয়ে বললো রিগো। 'ভেতরে চলে আসুন।'

কটেজের ভেতরে এনে ফায়ারপ্লেসের কাছে বসালো সে। পরিচয় করিয়ে দিলো তিন গোয়েন্দার সঙ্গে। তাদের দিকে তাকিয়ে হেসে মাথাটা সামান্য নোয়ালেন ডন

রডরিক হেরিয়ানো।

'লোকটা কতোক্ষণ ছিলো, স্যার, বলতে পারবেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

'কি জানি। আমি তো এইমাত্র এলাম।'

'কে হতে পারে?' কিশোরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো রবিন। 'আড়ি পেতে ছিলো কেন?'

'আমি কি করে বলি? কর্টেজ সোর্ডটার কথা শুনে ফেললো কিনা কে জানে!'

'শুনলে কি ক্ষতি হবে?' মুসার প্রশ্ন।

সরাসরি জবাব দিলো না কিশোর। বললো, 'আমার মনে হয়, মিস্টার ডয়েল চান না তলোয়ারটা আমরা খুঁজে বের করি। কাল শুঁটকি খুব আগ্রহ দেখাচ্ছিলো আমাদের সম্পর্কে। আমরা কি করছি বোঝার চেষ্টা করছে নিশ্চয়।'

'শুনলেও কিছু এসে যায় না,' বিশেষ গুরুত্ব দিলো না রিগো। 'এমন কিছু শোনেনি। তলোয়ারটা কোথায় আছে সেকথা তো আর বলিনি আমরা।'

'আমি শিওর,' আগের কথার খেই ধরে শুরু করলো আবার কিশোর, 'ডন পিউটো জানতেন তিন সৈন্য তাঁর পিছু নিয়েছে। তিনি সেটা লুকিয়ে ফেললেন। নিশ্চয়ই ছেলের জন্যে কোনো সূত্র রেখে গেছেন তিনি। চিঠিটাতে না থাকলে অন্য কোথাও। তবে চিঠিতেও কিছু না কিছু আছেই। বন্দি ছিলেন তিনি, বিপদের মধ্যে ছিলেন, সরাসরি কিছু লেখা সম্ভব ছিলো না। জানতেন, ওই চিঠিই ছেলেকে কিছু জানানোর শেষ সুযোগ।'

আরেকবার করে চিঠিটা পড়লো ওরা। তিন গোয়েন্দা পড়লো অনুবাদ করা লেখাটা, আর দুই ভাই পড়লো কপিটা।

'আমি কিছুই পেলাম না,' হাল ছেড়ে দিলো মুসা।

মাথা নাড়লো রিগো, 'আমিও না। এটা সাধারণ একটা চিঠি, কিশোর। সাংকেতিক কোনো কিছুই নেই।'

'এবং সব কিছু ভালো আছে, নিরাপদে আছে কথাটা ছাড়া,' বললো পিনটু।

'কিশোর?' রবিন বললো হঠাৎ, 'তারিখের ওপরে হেডিং লেখা হয়েছে কনডর ক্যাসল, খেয়াল করেছো?' রিগোকে জিজ্ঞেস করলো সে। 'আপনি জানেন এটা কি?'

'না,' ধীরে ধীর বললো রিগো, 'হবে কোনো দুর্গ-টুর্গ। অনেকেই ওরকম লিখে থাকে। যেখানে থেকে লিখছে সেটার নাম।'

'কিন্তু,' রবিন বললো, 'ডন চিঠিটা লিখেছিলেন ক্যাবরিলো হাউস থেকে।'

'আপনাদের হাসিয়েনডাটার নাম কখনও কি কনডর ক্যাসল ছিলো?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'না,' জবাব দিলো রিগো। 'এটার নাম সব সময়ই হাসিয়েনডা আলভারেজ।'

'তাহলে ওপরে কনডর ক্যাসল লিখলেন কেন?' ভুরু নাচালো মুসা। 'বিশেষ

কোনো জায়গা না তো যেটা স্যানটিনো চিনতো?'

সঙ্গে করে আনা ম্যাপটা খুললো কিশোর। সবাই দেখার জন্যে ঝুঁকে এলো তার কাঁধের ওপর দিয়ে। কিছুক্ষণ দেখে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার হেলান দিলো কিশোর। 'নো কনডর ক্যাসল!' তারপর হঠাৎ কি মনে পড়াতে আবার তাকালো ম্যাপের দিকে। 'দাঁড়ান দাঁড়ান, এটা আধুনিক ম্যাপ! পুরানো হলে, মানে আঠারোশো ছেচল্লিশ সালের…'

'আমার কাছে একটা পুরানো ম্যাপ আছে,' বললেন ডন হেরিয়ানো।

ওটা আনার জন্যে বেরিয়ে গেলেন তিনি। অস্থির হয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো সবাই। হলদে হয়ে আসা পুরানো একটা ম্যাপ নিয়ে এলেন হেরিয়ানো। ১৮৪৪ সালে তৈরি করা হয়েছিলো, অর্ধেকটা স্প্যানিশে লেখা, অর্ধেকটা ইংরেজিতে। ভালোমতো ম্যাপটা দেখলো রিগো আর কিশোর।

'কিছুই নেই,' নিরাশই মনে হলো রিগোকে।

'না,' একমত হলো কিশোর।

পরাজিত হয়েই যেন রেগে গেল রিগো। 'বোকামি হচ্ছে! বুঝলে, পাগলামি! আমি আগেই বলেছি ফ্যানটাসি দিয়ে আমাদের র‍্যাঞ্চ বাঁচানো যাবে না…'

আস্তে করে বললেন হেরিয়ানো, 'এছাড়া আর কি-ই বা করার আছে তোমার, রিগো? একটা খারাপ খবর জানাতে এসেছি তোমাকে, আমি টাকাটা ধার করে নিয়ে দিয়েছিলাম তোমাকে। আমার টাকা নয়। বললে তুমি নিতে না, তাই দেয়ার সময় বলিনি। এখন আর না বলে পারছি না। ওই লোক টাকা ফেরত দেয়ার জন্যে চাপ দিচ্ছে আমাকে। টাকা দিতে না পারলে মিস্টার ডয়েলের কাছে জায়গা তোমাকে বিক্রি করতেই হবে।'

হিসিয়ে উঠলো মুসা, 'শুঁটকিটার গলায় এ-জন্যেই এতো জোর ছিলো কাল!'

'অনেক করেছেন আমার জন্যে, ডন,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো রিগো। 'কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো আপনাকে…'

'কি আর করতে পারলাম! শোনো, তুমি যেও না এখান থেকে। আমার কটেজেই থেকে যাও। খুব খুশি হবো।'

'আপাতত তো আছিই। জায়গা বিক্রি করে দিলে পরে কি করবো সে তখন দেখা যাবে।

উলেন হেরিয়ানো। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। চত্বরে কাদা হয়ে গেছে। বৃষ্টি থামেনি। মাথা নিচু করে হাঁটছেন বৃদ্ধ। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রিগোও বেরিয়ে গেল। একটু পরেই লাকড়ি ফাড়ার শব্দ কানে এলো ছেলেদের।

'সব গেল!' দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো পিনটুর বুক চিরে।

'না, কিছুই যায়নি!' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলো কিশোর। 'করটেজ সোর্ড আমরা খুঁজে বের করবোই!'

'হ্যাঁ, করবো!' প্রতিধ্বনি করলো যেন রবিন।

'নিশ্চয় করবো!' সুর মেলালো মুসা। 'আমরা··· আমরা···খাইছে, কিশোর, কিভাবে কাজটা করবো আমরা?'

'কাল,' কিশোর জবাব দিলো, 'যতো পুরানো ম্যাপ পাওয়া যাবে সবগুলো দেখবো আমরা। কনডর ক্যাসল একটা সূত্রই। কি বোঝাতে চেয়েছেন ডন, জানার চেষ্টা করবো। রকি বীচে পুরানো ম্যাপের অভাব নেই।'

'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি!' উত্তেজিত হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো পিনটু। 'মেলাও হাত!'

হাসি ফুটলো চারজনের মুখেই।

সাত

রোববার সকালে ইলশে গুঁড়িতে পরিণত হলো বৃষ্টি। হেরিয়ানোর কাছ থেকে একটা সাইকেল আর একটা রেনকোট চেয়ে নিয়ে শহরে রওনা হলো পিনটু। হিসটোরিক্যাল সোসাইটির সামনে কিশোরের সাথে দেখা করলো দুপুরের দিকে।

'রবিন গেছে লাইব্রেরিতে খুঁজতে,' কিশোর জানালো। 'কাউন্টি ল্যাণ্ড অফিসে গেছে মুসা।'

'কনডর ক্যাসল খুঁজে বের করবোই আমরা!' দৃঢ় কণ্ঠে বললো পিনটু।

হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে ঢুকলো ওরা। অনেকে বসে পড়ছে। আজ বেশ ব্যস্ত অ্যাসিসট্যান্ট হিসটোরিয়ান। ম্যাপের কথা বললো কিশোর। ম্যাপ রাখার ঘর আলাদা। সেদিকে দু'জনকে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বললেন, 'আরেকজন এসে আলভারেজদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর করেছে। লম্বা, পাতলা।'

'শুঁটকি!' হিসটোরিয়ানের কাছ থেকে সরে এসে নিচু গলায় পিনটুকে বললো কিশোর। 'আমরা কি করছি জানার চেষ্টা করছে।'

'ওর নিশ্চয় ভয়, তলোয়ারটা খুঁজে বের করে ফেলবে তোমরা।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

ম্যাপ-ঘরে আর লোক নেই। ১৮৪৬ সালের পঞ্চাশটা ম্যাপ পাওয়া গেল। কোনো কোনোটা সমস্ত কাউন্টির, আর কোনোটা শুধু রকি বীচ এলাকার। কনডর ক্যাসল খুঁজে পেলো না ওরা।

'এই যে আরেকটা,' কিশোর বললো। 'এটা শুধু আলভারেজ র‍্যাঞ্চের।'

'আরিব্বাবা! কত্তোবড় ছিলো তখন দেখো!'

কিন্তু ওটাতেও কনডর ক্যাসল খুঁজে পাওয়া গেল না।

'ডন পিউটোর সময়কার আর কোনো ম্যাপ নেই!' হতাশ কণ্ঠে বললো পিনটু।

'নেই, তাতে কি?' হাল ছাড়লো না কিশোর। 'ওই সময়কার না হোক, রকি বীচের যতো ম্যাপ পাবো, সব দেখবো।'

১৮৪০-এর কয়েকটা পাওয়া গেল। ওগুলোতেও নেই কনডর ক্যাসল। আরও কিছু আধুনিক ম্যাপেও যখন পাওয়া গেল না, হাল না ছেড়ে আর উপায় থাকলো না ওদের। ফিরে চললো স্যালভিজ ইয়ার্ডের হেডকোয়ার্টারে।

'দেখি, রবিন আর মুসা কিছু পায় কিনা,' আশা করলো কিশোর।

দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেলারে ঢুকলো দু'জনে। ভেতরটা দেখে অবাক হয়ে গেল পিনটু। বললো, 'দারুণ সাজিয়েছো তো!'

জবাবে শুধু মৃদু হাসলো কিশোর।

রবিন আর মুসার অপেক্ষায় বসে রইলো ওরা। রবিন এলো প্রথমে।

'নাহ্, হলো না!' ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়লো সে। 'কোথাও আর বাদ রাখিনি!'

মুসা ঢুকলো কালো মুখটাকে আরও কালো করে। তার চেহারার দিকে একবার তাকিয়েই যা বোঝার বুঝে গেল সবাই। একটা টুলে বসতে বসতে বললো, 'কনডর ক্যাসলের যদি কোনো মানে সত্যিই থেকে থাকে, তাহলে সেটা জানে শুধু ডন পিউটো আর স্যানটিনো আলভারেজ!'

'তারমানে আর কিছুই করার নেই আমাদের,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললো রবিন। প্রায় কেঁদে ফেলবে যেন পিনটু। 'না না, ওরকম করে বলো না!'

হঠাৎ পিঠ সোজা করে ফেললো মুসা। ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে ইশারা করলো সবাইকে।

কান পাতলো সকলেই। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত সব কিছু চুপচাপ। তারপর সবার কানেই এলো ক্ষীণ শব্দটা, বাইরে ধাতব কিছু নড়ছে। তারপর শব্দ শোনা গেল আরেক জায়গা থেকে। পরক্ষণেই হলো টোকা দেয়ার শব্দ।

ফিসফিসিয়ে রবিন বললো, 'কেউ কিছু খোঁজাখুঁজি করছে।'

'আচ্ছা,' কিশোর বললো, 'তোমাদের পিছু নিয়ে আসেনি তো কেউ?'

'কি জানি, আমি অন্তত দেখিনি।'

মুসার দিকে তাকালো কিশোর।

'আমি···ঠিক বলতে পারবো না,' মুসা বললো চিন্তিত ভঙ্গিতে। 'তাড়াহুড়া করে এসেছি। পেছনে তাকানোর কথা মনেই হয়নি।'

বাইরে জঞ্জালের মধ্যে কয়েক মিনিট ধরে চললো টোকা দেয়া আর খোঁচাখুঁচির শব্দ। তারপর নীরব হয়ে গেল।

'দেখ তো, রবিন,' ফিসফিস করে বললো কিশোর।

আস্তে করে উঠে গিয়ে ট্রেলারের ছাতে লাগানো পেরিস্কোপ সর্ব-দর্শনে চোখ রাখলো রবিন। 'এই, ম্যানেজার, ডরি! বেরিয়ে যাচ্ছে!'

লোকটা চলে যাওয়ার পর সর্ব-দর্শন থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকালো রবিন। 'নিশ্চয় ফলো করেছিলো। কাকে করলো বুঝলাম না। ও-ই হয়তো কাল গিয়ে আড়ি পেতে ছিলো কটেজের জানালায়।'

'বোধহয়,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'আমাদের ওপর বড় বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে টেরি আর ডরি। র‍্যাঞ্চ দখলের জন্যেই, না কোনো মতলব আছে? আর এখানেই বা কেন এসেছিলো?'

'হয়তো কোনোভাবে জেনে ফেলেছে তলোয়ারটার কথা!' পিনটু বললো উত্তেজিত কণ্ঠে।

'তা হতে পারে।'

'আমাদের চেয়ে বেশি জানলেই মুশকিল,' বললো মুসা।

গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'হ্যাঁ। এখন যে-করেই হোক একটা ম্যাপ খুঁজে পেতে হবে আমাদের, যেটাতে কনডর ক্যাসল রয়েছে।'

'একটা ইনডিয়ান ম্যাপ দেখলে কেমন হয়?' কিছুটা রসিকতা করেই বললো মুসা। 'আমরা তো পড়তে পারবো না, কোনো ইনডিয়ানই পড়ে দেবে।'

'দূর!' বিরক্ত হয়ে হাত নাড়লো রবিন। 'এখন ওসব...'

'মুসাআ!' চিৎকার করে উঠলো কিশোর। 'ঠিক বলেছো!'

'ঠিক বলেছি!'

'নিশ্চয়! এটাই জবাব! আমি একটা গাধা!'

'জবাবটা কি?' দ্বিধায় পড়ে গেছে মুসা।

'একটা সত্যিকারের পুরানো ম্যাপ! ডন পিউটো জানতেন, সব ম্যাপেই পাওয়া যায় এমন নাম লিখলে আমেরিকানরা সেটা বের করে ফেলবে। তাই এমন কিছুর কথা বলেছেন, যেটা শুধু স্যানটিনোই বুঝতে পারে। ওঠো, জলদি চলো! হিসটোরিয়ান সোসাইটিতে!'

দুই সুড়ঙ্গের পাইপের ভেতর দিয়ে যতো দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে এলো ওরা। দৌড় দিলো সাইকেলের দিকে।

পেছন থেকে ডাক দিলেন মেরিচাচী, 'কিশোওর!'

থমকে দাঁড়ালো কিশোর। ফিরে তাকালো। অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন

মেরিচাচী। বললেন, 'যাচ্ছিস কোথায়? আমার চাচার জন্মদিন আজ ভুলে গেছিস নাকি? জলদি রেডি হ। পনেরো মিনিটের মধ্যেই বেরোবো।'

গুঙিয়ে উঠলো কিশোর। 'আ-আমি না গেলে হয় না, চাচী?'

'বলিস কি? তোকে এতো করে যেতে বললো, আর তুই যাবি না? না গেলে খুব দুঃখ পাবে তোর নানা। চল।'

রবিন, মুসা আর পিনটুকে চলে যেতে বললো কিশোর। তারপর এগোলো ঘরের দিকে।

'কি করবো এখন?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'আবার কি? হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে যাবো,' নেতৃত্ব নিয়ে ফেললো রবিন। 'কোন্ ধরনের ম্যাপে খুঁজতে হবে বুঝে গেছি আমি। চল।'

রবিন কি চায় শুনলেন অ্যাসিসট্যান্ট হিসটোরিয়ান। তারপর বললেন, 'ওরকম একটা ম্যাপ আছে, আমাদের রেয়ার কালেকশন। অনেক পুরানো, সতেরোশো নব্বই সালের। এতো নরম হয়ে গেছে বের করে আলোতে আনাই রিস্কি।'

'প্লীজ, স্যার,' অনুরোধ করলো রবিন। 'একবার অন্তত দেখান।'

দ্বিধা করলেন হিসটোরিয়ান। মাথা ঝাঁকালেন। পেছনের ঘরের একটা দরজার দিকে নিয়ে চললেন ওদেরকে। ঘরটায় কোনো জানালা নেই, আর এমনভাবে তৈরি যাতে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা সবসময় একরকম থাকে। কাঁচের বাক্সে কিংবা কাঁচের দরজা লাগানো শেলফের মধ্যে রয়েছে সমস্ত পুরানো দলিলপত্র। একটা ফাইল দেখলেন হিসটোরিয়ান, তারপর একটা ড্রয়ার খুলে বের করে আনলেন লম্বা একটা কাঁচের বাক্স। ভেতরে একটা ম্যাপ। মোটা, হলদে কাগজে বাদামী রঙে আঁকা।

'বের করা যাবে না,' হিসটোরিয়ান বললেন। 'কাঁচের ওপর দিয়েই দেখো।'

ম্যাপটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালো গোয়েন্দারা।

'ওই তো!' বিশ্বাস করতে পারছে না পিনটু। 'স্প্যানিশে লেখা, কনডর ক্যাসল!'

'এটা!' কাঁচের বাক্সের ওপর পিনটুর আঙুলের পাশে আঙুল রাখলো রবিন।

'হ্যাঁ! একেবারে আলভারেজ র‍্যাঞ্চের মধ্যেই! আঁকাবাঁকা রেখাগুলো দিয়ে বোধহয় সান্তা ইনেজ ক্রীককে বোঝানো হয়েছে।'

হঠাৎ করে চুটকি বাজালো মুসা। 'তাহলে দাঁড়িয়ে আছি কেন এখনও?'

বিস্মিত হিসটোরিয়ানকে ধন্যবাদ জানিয়েই দরজার দিকে দৌড় দিলো ছেলেরা।

আট

বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু পর্বতের ওপরে এখনও ইতিউতি ঘুরছে কালো মেঘের ভেলা যে-কোনো সময় ঝরঝর করে নামার পাঁয়তাড়া কষছে যেন। কাঁচা রাস্তা ধরে সাইকেল

চালিয়ে বাঁধের দিকে চলেছে দুই গোয়েন্দা আর পিনটু। শুকনো অ্যারোইওর কাছে একজায়গায় মোড় নিয়েছে পথটা, সেখানে এসে থামলো পিনটু।

'আমি যতদূর বুঝলাম,' সে বললো, 'এই পাহাড়ের শেষ মাথায় চূড়াটাকেই বলা হতো কনডর ক্যাসল। ওটার ওপাশেই সান্তা ইনেজ ক্রীক।'

রাস্তার ধারের ঝোপের মধ্যে সাইকেলগুলো লুকিয়ে ফেললো ওরা। তারপর চ্যাপারালের ঘন ঝোপ ঠেলে এগোলো গভীর অ্যারোইওর কিনারার দিকে। বাঁয়ে রয়েছে বাঁধটা, এখান থেকে চোখে পড়ে না—ঝোপঝাড়ে ঢাকা টিবিটার জন্যে, যেটা অ্যারোইওর মুখ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছে।

উঁচু চূড়াটার দিকে মুখ তুলে তাকালো ছেলেরা।

'ওটাই!' পিনটু বললো। 'ম্যাপ তা-ই বলে।'

'এখন কি নাম ওটার?' মুসা জানতে চাইলো। ভিজে মাটি নরম হয়ে গেছে, প্রায় কাদা। সেটা ধরে সাবধানে নেমে চলেছে।

'বলতে পারবো না।'

অ্যারোইও থেকে উঠে পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ করলো ছেলেরা। ঢাল কোথাও ঢালু, কোথাও খাড়া। ওপরে উঠতে উঠতে হাঁপ ধরে গেল ওদের।

'এই তাহলে কনডর ক্যাসল!' বিস্ময়ে গলা কেঁপে গেল রবিনের।

অতো ওপরে দাঁড়িয়ে আশপাশের পুরো এলাকাটা চোখে পড়ছে শুধু উত্তর দিক ছাড়া। সেদিকে অনেক ওপরে উঠে গেছে পর্বতের চূড়া যেন আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টায়। পর্বতের গোড়ায় বাঁধ আর ক্রীকের কাছে ছড়িয়ে রয়েছে পোড়া অঞ্চল।

পশ্চিমে দেখা যাচ্ছে রাস্তা আর গভীর অ্যারোইও, একেবারে হাসিয়েনডার ধ্বংসস্তূপের কাছে এগিয়ে গেছে। অনেক দূরে চোখে পড়ছে সাগর, ধূসর এই মেঘলা দিনে কালচে হয়ে আছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁকা হয়ে পড়ে আছে যেন সান্তা ইনেজ ক্রীক, কিছু পানি চকচক করছে এখন তাতে। তার পরে প্রায় মাইলখানেক দূরে দেখা যায় ডয়েল র‍্যাঞ্চের বাড়িঘর আর কোরাল। দক্ষিণ থেকে একটা রাস্তা ডয়েল র‍্যাঞ্চ হয়ে চলে গেছে উত্তরে পর্বতের দিকে।

'জায়গাটাকে কনডর ক্যাসল বলে কেন?' মুসার প্রশ্ন। 'না দেখছি কনডর, না দুর্গ।'

'কনডর মানে জানো তো?' রবিন বললো। 'এক ধরনের শকুন।'

'আমার মনে হয় নামটা দেয়া হয়েছে বার্ডস-আই ভিউ থেকে,' অনুমান করলো পিনটু। 'অর্থাৎ পাখির চোখ থেকে দেখা। অনেক ওপর থেকে দেখা আরকি।'

'জানি। হতে পারে। তবে নাম নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এসো তলোয়ার খুঁজি। কোথায় লুকানো হয়েছে বলো তো?'

'লুকানোর জায়গা আছে নিশ্চয়,' মুসা বললো। 'গর্ত, ফাটল। গুহাটুহাও থাকতে পারে। এসো, খুঁজি।'

ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে আরম্ভ করলো ওরা। কিন্তু কোনো ফাটল বা গর্ত চোখে পড়লো না, গুহা তো দূরের কথা। মার্বেলের মতো মসৃণ পিঠ এখানে পাহাড়ের। প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখলো ওরা। খাড়া ঢালের কিনারে যতোদূর যাওয়া সম্ভব গিয়ে উঁকি দিয়ে নিচে তাকালো। একেবারে নিরেট পাথর।

'নাহ্, এখানে কিছু লুকানো যাবে না,' মাথা নাড়লো মুসা। 'চলো চূড়ার নিচে ঢালে খুঁজে দেখি।'

'চলো,' রবিন বললো। 'তুমি খোঁজো ক্রীকের দিকটায়, আমি আর পিনটু অ্যারোইওর দিকটায়।'

দুই দিক মোটামুটি ঢালু, ততোটা খাড়া নয়। আবার খোঁজা শুরু হলো। মুসা যেদিকে নামলো সেদিকে কিছু বড় বড় পাথর দেখা গেল, কোনো খাঁজটাজ বা ফাটল নেই। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। রবিন আর পিনটু তখনও খুঁজছে। ওদের কাছে চলে এলো সে।

'না, লুকানোর জায়গা এখানেও নেই,' রবিন বললো।

গাল চুলকালো পিনটু। 'মাটিতে পুঁতে রাখেনি তো?'

'খাইছে! তাহলে সর্বনাশ!' আঁতকে উঠলো মুসা। 'সমস্ত পাহাড় খুঁড়তে হবে তাহলে! অসম্ভব!'

'আমার মনে হয় না মাটিতে পোঁতা হয়েছে,' ধীরে ধীরে বললো রবিন। 'তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিলেন তখন ডন। পুঁততে সময় লাগে। এতো সময় নিশ্চয় পাননি। তাছাড়া যেখানে পুঁতবেন সেখানে চিহ্ন দিয়ে রাখতে হবে, নইলে কিভাবে খুঁজে বের করবে স্যানটিনো? আর চিহ্ন তো ডগলাসের চোখেও পড়ে যাওয়ার কথা।'

মাথা নাড়লো রবিন। 'না, পুঁতে রাখেননি তলোয়ারটা। তবে কনডর ক্যাসলের কাছেই কোথাও লুকানো হয়েছে, যেখানে খুঁজে পাওয়ার কথা স্যানটিনোর। এমন কোনো জায়গা, যেটা তৈরি করতে হয়নি তখন, আর যেটাতে চিহ্ন দেয়ার দরকার পড়েনি।'

'কিন্তু,' চারপাশে চোখ বোলালো মুসা, 'কোথায়?'

'কনডর ক্যাসলে নেই, এটা বোঝা গেল,' বললো রবিন। 'তাহলে এটাকে একটা চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। কাছেই কোনো জায়গা আছে, মনে হয়, যেখানে ডন আর স্যানটিনো প্রায়ই যেতো। পিনটু, তেমন কোনো জায়গা...'

'বাঁধটা হতে পারে।'

'বাঁধ? হ্যাঁ, হতে পারে।'

পথ দেখিয়ে বাঁধের কাছে দুই গোয়েন্দাকে নামিয়ে নিয়ে এলো পিনটু। সেন্টার গেট দিয়ে পানি গিয়ে পড়ছে তিরিশ ফুট নিচের নালায়। বাঁধের যতোটা ওপরে ওঠা সম্ভব উঠে দেখলো ওরা। হাজার হাজার ছোট পাথর একসাথে চুণ-সুরকি দিয়ে গেঁথে তৈরি হয়েছে ওটা।

'একেবারে ইস্পাত হয়ে গেছে,' মুসা বললো। 'কুড়াল দিয়ে কুপিয়েও কাটা যাবে না।'

'দুশো বছর আগে স্থানীয় ইনডিয়ানদের সাহায্যে এটা তৈরি করেছিলো আলভারেজরা,' পিনটু জানালো।

'এখানেও তো কোনো ফাঁকফোকর দেখছি না,' রবিন বললো। 'ওইই নিচে দেখা যাচ্ছে অবশ্য কয়েকটা। কিন্তু ওখানে নামতে হলে দড়ির মই দরকার। ডন পিউটোর কাছে নিশ্চয় তখন ওরকম মই ছিলো না।'

মুসাও একমত হলো তার সঙ্গে।

'কোথায় যে রাখলো!' নিরাশা ঢাকতে পারলো না রবিন। 'আরও সূত্র যদি পেতাম!'

'সূত্রই বা আর কোথায় পাবো, বলো? ডন পিউটো চিঠি তো লিখেছিলেন মোটে একটা।'

'গণ্যমান্য লোক ছিলেন তিনি। নিশ্চয় অনেক বন্ধু ছিলো তাঁর। হয়তো কারও কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছেন। কেউ তাঁকে দেখে থাকতে পারে। এমন কিছু সূত্র খুঁজে বের করা দরকার, যাতে বোঝা যায় পালানোর দিনটিতে কি কি করেছিলেন তিনি।'

'কিভাবে?' বিশেষ আশা করতে পারলো না পিনটু। 'সে-অনেক বছর আগের কথা।'

'হ্যা, তা ঠিক। তবে ওই সময়ে টেলিফোন ছিলো না। লোকে চিঠির মাধ্যমেই যোগাযোগ করতো। লোকে ডায়রি রাখতো এখনকার চেয়ে অনেক বেশি। হয়তো এই এলাকায় খবরের কাগজও ছিলো একআধটা। কিছু না কিছু পেয়ে যাবোই...'

'আবার সেই হিসটোরিক্যাল সোসাইটি!' গুঙিয়ে উঠলো মুসা। 'পুরানো কাগজ ঘাঁটতে আর ভাল্লাগে না!'

হেসে উঠলো রবিন। 'তোমার অসুবিধে হবে না। ওসব দলিলের বেশির ভাগই স্প্যানিশে লেখা। পড়ার কষ্ট করতে হবে না তোমাকে। আজ যাচ্ছি না আর আমরা, কাল কিশোরকে নিয়ে যাবো। এ-হপ্তার হোমওয়ার্ক করেছো?'

আবার গুঙিয়ে উঠলো মুসা। 'সর্বনাশ! তাই তো! মনেই ছিলো না!'

'আমারও না। আজ সারতে হবে।'

সাইকেলগুলোর কাছে ফিরে চললো ওরা।

ডান দিকে চোখ পড়তে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মুসা। সরে বাঁধের ওপর থেকে নেমেছে ওরা। 'পিনটু,' বললো সে, 'তোমাদের র‍্যাঞ্চের কারো কুকুর আছে? চারটে, বড় বড় কালো কুত্তা?'

'কুকুর? না তো…'

'আমিও দেখেছি,' রবিনের কণ্ঠে অস্বস্তি।

দীঘির ওপারে আলভারেজদের সীমানার মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে চারটে বিরাট কুকুর। লাল টকটকে জিভ বের করা, জ্বলন্ত চোখ।

'বিকট চেহারা…' কথা শেষ করতে পারলো না রবিন। তার আগেই শোনা গেল তীক্ষ্ণ হুইসেল। পাঁই করে ঘুরলো মুসা। 'সংকেত! জলদি দৌড় দাও!'

দাঁত বের করে লাফিয়ে উঠে বাঁধের দিকে দৌড় দিলো কুকুরগুলো।

পড়িমড়ি করে আবার বাঁধের ওপর উঠে পড়লো ছেলেরা। প্রাণপণে ছুটলো সামনে পঞ্চাশ গজ দূরের কতগুলো ওক গাছের দিকে।

'অনেক…দূর…!' হাঁপাচ্ছে রবিন।

'পারবো না…!' পিনটুরও কথা আটকে গেল।

'জলদি করো! আরো জোরে!' তাগাদা দিলো মুসা।

'মুসাআ!' পেছনে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো পিনটু। 'দেখো, সাঁতরাচ্ছে!'

দীঘির পাশ দিয়ে ঘুরে না এসে তাড়াতাড়ি আসার জন্যে পানিতেই লাফিয়ে পড়েছে কুকুরগুলো। দ্রুত সাঁতরে আসছে। শিগগিরই উঠে আসবে এপাশে। ধরে ফেলবে ছেলেদের।

তবে ভুল করেছে কুকুরগুলো। পানিতে না নেমে যদি ঘুরে আসতো তাহলে আরও তাড়াতাড়ি করতে পারতো। কিছুটা সময় পেয়ে গেল ছেলেরা। এবং সেটা কাজে লাগালো।

পৌঁছে গেল গাছগুলোর কাছে। কোনোদিকে না তাকিয়ে গাছে উঠতে শুরু করলো। উঠে বসলো ওপরের ডালে, কুকুরের নাগালের বাইরে।

পৌঁছে গেল জানোয়ারগুলো। শিকার হাতছাড়া হয়েছে দেখে খেপে গেল ভীষণ। তুমুল ঘেউ ঘেউ করে লাফালাফি শুরু করলো। ধরতে পারলে ছিঁড়ে ফেলবে এমন ভাব।

গাছের ওপর আটকা পড়লো তিন কিশোর।

নয়

আবার বেজে উঠলো হুইসেল। শান্ত হয়ে গেল কুকুরগুলো, শুয়ে পড়লো গাছের গোড়ায়।

'দেখো!' হাত তুললো রবিন। 'শুঁটকি আর তার ম্যানেজার!'

লাফিয়ে লাফিয়ে বাঁধের ওপর দিয়ে দৌড়ে আসছে তালপাতার সেপাই ছেলেটা। পেছনে তার হোঁৎকা ম্যানেজার। গাছের ওপরে ছেলেদের দেখে দাঁত বের করে হাসলো টেরিয়ার। 'আমাদের এলাকায় ঢুকেছো কেন?' হাসতে হাসতে বললো সে। 'চুরি করতে?'

'তোমার কুত্তাগুলো তাড়িয়ে এনেছে আমাদের!' রাগ করে জবাব দিলো পিনটু।

'আলভারেজদের এলাকায় তোমরা কি করছিলে?' ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

হেসে উঠলো ডরি। 'ঢুকেছিলাম সেটা প্রমাণ করতে পারবে?'

'আমরাই বরং প্রমাণ করে দিতে পারি চুরি করে আমাদের সীমানায় ঢুকেছো তোমরা,' টেরি বললো।

'শেরিফকে জানিয়েছি, এখানে চোরের উৎপাত হচ্ছে,' হেসে ডরি বললো। 'ওই যে, এসে পড়েছে।'

ডয়েলদের এলাকার ভেতর দিয়ে আসা কাঁচা রাস্তা ধরে একটা গাড়ি আসতে দেখা গেল।

গাড়িটা থামলো। নামলেন শেরিফ আর তাঁর ডেপুটি। এগিয়ে এলেন গাছের কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার?'

'কয়েকটা চোরকে আটক করেছি, শেরিফ,' ডরি বললো। 'আলভারেজদের ছেলেটা, আর তার দুই দোস্ত। বলেছিলাম না, ছেলেগুলো প্রায়ই ঢোকে আমাদের এখানে। নিশ্চয়ই চুরি করার মতলব। আরও শয়তানী করে। ঘোড়া ঢুকিয়ে গাছপালা নষ্ট করে, বেড়া ভাঙে, বেআইনীভাবে ক্যাম্প করে আগুন জ্বালে। আমার তো মনে হয় সেদিন আগুনটা ওরাই লাগিয়েছিলো।'

মুখ তুলে ছেলেদের দিকে তাকালেন শেরিফ। 'নেমে এসো। ডরি, কুকুরগুলো সরাও।'

নেমে এলো তিন কিশোর। ওদের দিকে তাকিয়ে গরগর করে উঠলো কুকুরগুলো।

দুই গোয়েন্দার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন শেরিফ। 'মুসা আর রবিন না তোমাদের নাম? ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে দেখেছিলাম। তোমরা গোয়েন্দা। অনুমতি না নিয়ে অন্যের এলাকায় ঢোকা যে বেআইনী এটা তো তোমাদের জানা উচিত।'

'জানি,' শান্ত কণ্ঠে বললো রবিন। 'ইচ্ছে করে ঢুকিনি আমরা। ওরাই বরং না বলে আলভারেজদের এলাকায় ঢুকেছিলো। আমাদের দেখে কুত্তা লেলিয়ে দিয়েছে। উপায় না দেখে এসে এই গাছে উঠেছি।'

'মিথ্যে কথা বলছে ওরা, শেরিফ!' গর্জে উঠলো টেরিয়ার।

'মিথ্যে কথা তো তুমি বলছো!' পাল্টা জবাব দিলো মুসা।

'শেরিফ,' রবিন প্রমাণ করার চেষ্টা করলো, 'আমরা যদি আগে থেকেই ওদের সীমানায় থাকতাম, তাহলে কুত্তাগুলো কি করে ভিজলো? এখন তো বিষ্টি-টিষ্টি কিছু নেই?'

'ভিজেছে?' কুকুরগুলোর দিকে তাকালেন শেরিফ। 'তাই তো?'

'আমাদের তাড়া করতে দীঘি সাঁতরে এসেছে বলেই ভিজেছে। ওটা আলভারেজদের এলাকা।'

লাল হয়ে গেল ডরির গাল। বললো, 'ওদের কথা শুনবেন না, শেরিফ। কুকুরগুলোর গা আগেই ভেজা ছিলো।'

'তোমার কথা কিন্তু আর বিশ্বাস করতে পারছি না,' কড়া চোখে ডরির দিকে তাকালেন শেরিফ। 'কুকুরগুলো কি করে ভিজেছে?'

'সেটা পরে বলছি। আরেকটা জিনিস দেখবেন, আসুন।'

শেরিফকে নিয়ে চলে গেল ডরি।

'কি দেখাবে, শুঁটকি?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'সেটা এখন বলতে যাবো কেন?' দাঁত বের করে হাসলো টেরি। 'দেখতেই পাবে।'

মিনিট পনেরো পরে ফিরে এলেন শেরিফ। হাতে বাদামী রঙের একটা ব্যাগ। দুই গোয়েন্দা আর পিনটুর দিকে চেয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন, 'যাও, ছেড়ে দিলাম। কে মিথ্যে বলেছো, বুঝলাম না। যা-ই হোক, ডরিকে সাবধান করে দিয়ে এসেছি যাতে অন্যের এলাকায় কুত্তা না ছাড়ে। আর তোমাদেরও হুঁশিয়ার করছি অন্যের এলাকায় ঢুকবে না।'

প্রতিবাদ করার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিলো পিনটু আর মুসা। তাদের থামিয়ে দিয়ে রবিন বললো, 'ঠিক আছে, মনে থাকবে আপনার কথা।' তারপর যেন নিতান্ত কথার কথা বলছে, এমনভাবে জিজ্ঞেস করলো, 'ব্যাগে কি, স্যার?'

'সেটা তোমাদের জানার দরকার নেই!' গম্ভীর হয়ে বললেন শেরিফ। 'এখন ভাগো এখান থেকে।'

বাঁধের ওপর দিয়ে আবার সাইকেলের দিকে রওনা হলো ওরা। আলভারেজদের এলাকার কাঁচা রাস্তা দিয়ে যখন পোড়া হাসিয়েনডার দিকে চললো, জোর বৃষ্টি শুরু হলো আবার।

ধ্বংসস্তূপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রিগোর সঙ্গে দেখা। পোড়া ছাইয়ের মধ্যে কিছু খুঁজছে যেন। পুড়ে নষ্ট হয়নি এমন কিছু এখনও আছে কিনা দেখছে হয়তো। ওদেরকে দেখতে পেলো না।

'কিছু পেলেন?' ডেকে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

চমকে মুখ তুললো রিগো। কাঁচুমাচু হয়ে গেল, লজ্জা পেয়েছে। 'ইয়ে, করটেজ সোর্ডটাই খুঁজছি। আমার মনে হলো, ডন পিউটো যদি কোথাও লুকিয়ে থাকেন সেটা, হাসিয়েনডার ভেতরেই লুকিয়েছেন। বাড়ি পুড়ে ছাই হয়েছে। ভাবলাম এখন বেরোতে পারে।' পড়ে থাকা কয়েকটা টালিতে লাথি মারলো রাগ করে। 'পেলাম না! কোনো চিহ্নই নেই!'

'কনডর ক্যাসল খুঁজে পেয়েছি আমরা, ভাইয়া,' পিনটু জানালো।

সংক্ষেপে সব জানালো ওরা।

কনডর ক্যাসল খুঁজে পেয়েছে শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো রিগোর চোখ, ওখানেও কিছু পাওয়া যায়নি শুনে আবার নিষ্প্রভ হয়ে গেল ধীরে ধীরে। 'তাহলে আর পেয়েই কি লাভ হলো?'

'তলোয়ারটা পাইনি বটে, তবে একেবারেই লাভ হয়নি একথাও বলা যাবে না,' রবিন বললো।

'কি লাভ?'

'ছেলের জন্যে তলোয়ারটা লুকিয়ে রাখার পরিকল্পনা করেছিলেন ডন পিউটো। কনডর ক্যাসলের নির্দেশ রয়েছে অনেক পুরানো ম্যাপে। যেখানে বন্দি করা হয়েছিলো ডনকে, সেই জায়গা আর তাঁর বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই জায়গাটার। অথচ সেটার কথা লেখা হয়েছে চিঠিতে। এটা সূত্র না হলে কিছুতেই লিখতেন না।'

'যুক্তিতে তাই বলে,' রিগো বললো। 'কিন্তু লাভটা…'

এঞ্জিনের শব্দে থেমে গেল সে। দুটো গাড়ি এসে ঢুকলো হাসিয়েনডার চত্বরে। একটা ডয়েলদের ওয়াগন, আরেকটা শেরিফের গাড়ি। ওয়াগন থেকে লাফিয়ে নামলো টেরি আর ডরি।

'ওই তো!' চেঁচিয়ে উঠলো ডরি।

'ছাড়বেন না! ছাড়বেন না!' ম্যানেজারের চেয়ে জোরে চেঁচালো টেরি। গাড়ি থেকে নামলেন শেরিফ। 'চুপ করো। অতো চেঁচিও না! বলেছি না, যা করার আমি করবো।' তাঁর হাতে তখনও বাদামী ব্যাগটা রয়েছে। রিগোর সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। 'রিগো, যেদিন আগুন লেগেছিলো সেদিন কোথায় ছিলে?'

'কোথায় ছিলাম?' ভুরু কোঁচকালো রিগো। 'কেন, আর সবার সঙ্গে আগুন নেভাতে গিয়েছিলাম। আপনি জানেনই তো। তার আগে ছিলাম রকি বীচের সেন্ট্রাল ইস্কুলে, পিনটুর সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, ছিলে। তখন বিকেল তিনটে। তার আগে কোথায় ছিলে?'

'আগে? আমাদের র‍্যাঞ্চে। ব্যাপারটা কি, শেরিফ?'

'আগুন কিভাবে লেগেছে জানা গেছে। ডয়েলদের এলাকায় কেউ একজন ক্যাম্পফায়ার জ্বেলেছিলো। তিনটের বেশ কিছুক্ষণ আগে। বছরের এই সময়ে এভাবে আগুন জ্বালানো বেআইনী। যা-ই হোক, আগুনটা ঠিকমতো নেভানো হয়নি। ডয়েলদের বেড়া ভেঙে...'

'ঘোড়ার পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে!' শেরিফের কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠলো ডরি। 'তোমাদের ঘোড়া।'

'ওগুলো ধরে আনতে গিয়েই আগুনটা জ্বেলেছিলে,' টেরি বললো। 'তারমানে আগুনটা তুমিই লাগিয়েছো।'

শীতল গলায় বললো রিগো, 'পাশাপাশি র‍্যাঞ্চ থাকলে গরু-ঘোড়ায় ওরকম বেড়া ভাঙেই। ওগুলো ধরে আনার জন্যে একে অন্যের এলাকায়ও ঢোকে র‍্যাঞ্চাররা। সেটা এমন কোনো ব্যাপার না। পড়শীদের মধ্যে একটা আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং থাকেই। তবে ঢুকলেও আগুন আমরা লাগাইনি।'

ব্যাগ খুলে একটা কালো সমব্রেরো হ্যাট বের করলেন শেরিফ। 'এটা কার হ্যাট, রিগো?'

'আমার। আমি মনে করেছিলাম সেদিন আগুনে পুড়ে গেছে। পেয়েছেন ভালোই হয়েছে...'

'আগুনে পুড়ে গিয়েছিলো মনে করেছিলে?' কর্কশ গলায় বলে উঠলো ডরি।

'হ্যাঁ। তাতে কি?' কঠিন দৃষ্টিতে ম্যানেজারের দিকে তাকালো রিগো।

'রিগো,' ডরি আর কিছু বলার আগেই বললেন শেরিফ, 'হ্যাটটা কখন হারিয়েছিলে?'

'কখন?' মনে করার চেষ্টা করলো রিগো। 'বোধহয় আগুন নেভানোর সময়...'

'না। আগুন নেভানোর সময় তোমার মাথায় হ্যাট ছিলো না। আমার ঠিক মনে আছে। কয়েকজন লোকের সাক্ষিও নিয়ে এসেছি। তারাও আমার সঙ্গে একমত।'

'কি জানি,' মাথা চুলকালো রিগো। 'কখন হারিয়েছি সত্যিই মনে নেই আমার।'

'রিগো, এই হ্যাটটা পাওয়া গেছে একটা ক্যাম্পফায়ারের পাশে। যেটা থেকে আগুন ছড়িয়েছিলো।'

'তাহলে এটা পুড়লো না কেন?'

'কারণ, আগুনটা ক্যাম্পফায়ার থেকে শুধু একটা দিকে সরেছে। হ্যাটটা পড়ে ছিলো আরেক পাশে।'

চুপ হয়ে গেল রিগো।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন শেরিফ। 'রিগো, তোমাকে অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হচ্ছি আমি।'

চিৎকার করে কিছু বলতে যাচ্ছিলো পিনটু, তাকে থামালো রিগো। শেরিফের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'আপনার ডিউটি আপনি করুন, শেরিফ।' তারপর আবার ভাইয়ের দিকে ফিরে বললো, 'ডন হেরিয়ানোকে গিয়ে এখুনি খবর দাও।'

টেরি আর তার ম্যানেজারের দিকে ফিরে শেরিফ বললেন, 'তোমরাও এসো আমার সাথে। স্টেটমেন্ট দিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই,' ডরি বললো।

'খুশি হয়েই দেবো,' বলে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো টেরি। মুখে মুচকি হাসি।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দুটো গাড়িকে চলে যেতে দেখলো ছেলেরা। পিনটুর চোখে পানি টলমল করছে। দুই গোয়েন্দার দিকে ফিরলো সে। 'বিশ্বাস করো, আমার ভাই আগুন লাগায়নি!'

'জানি,' রবিন বললো। 'নিশ্চয়ই কোথাও একটা ঘাপলা আছে। ওই হ্যাটটা আগেও একবার দেখেছি, কিন্তু কোথায়, কখন, মনে করতে পারছি না। ইস্, এখন কিশোর এখানে থাকলে কাজ হতো!'

হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লো মুসা, যেন বাতাসে থাবা মারলো। 'সমস্যা ছিলো একটা, এখন হয়েছে দুটো। তলোয়ারটাও খুঁজে বের করতে হবে, রিগোকেও ছাড়িয়ে আনতে হবে।'

দশ

হেরিয়ানোকে খবর দিতে চললো পিনটু। রকি বীচে ফিরে চললো মুসা আর রবিন। তাড়াতাড়ি সাইকেল চালালো ওরা। বাড়ি ফিরে বার বার কিশোরকে ফোন করলো দু'জনে, কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে। বার্থডে পার্টি থেকে ফেরেনি বোধহয় কিশোররা। শুতে যাওয়ার আগে আরও একবার ফোন করলো দু'জনে, সাড়া মিললো না ইয়ার্ড থেকে।

পরদিন সকালে নাস্তার জন্যে নিচে নেমে দেখে রবিন তার বাবা কাগজ পড়ছেন। ছেলের সাড়া পেয়ে মুখ তুললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'এই, রবিন, রিগোকে দেখি অ্যারেস্ট করেছে। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। রিগোর মতো অভিজ্ঞ র‍্যাঞ্চার ওরকম একটা কাঁচা কাজ করতেই পারে না।'

'ও লাগায়নি, বাবা। হয় শেরিফ ভুল করেছে, নয়তো কেউ ইচ্ছে করে রিগোকে ফাঁসিয়েছে। শয়তানী। সেটা প্রমাণ করে ছাড়বো আমরা।'

'তাই করো।'

তাড়াহুড়ো করে নাস্তা সারলো রবিন। তারপর কিশোরকে ফোন করলো। সব শুনে কিশোর বললো, 'রিগো তো লাগায়নি। ওই হ্যাটটাকেই প্রমাণ হিসেবে ধরেছে, না? ইচ্ছে করলে তুমিই ঠেকাতে পারতে শেরিফকে। মনে নেই? ওই হ্যাট ওর মাথায় দেখেছি আমরা।'

'কখন? তোমার মতো তো ফটোগ্রাফিক মেমোরি না আমার। কোথায় দেখলাম?'

'ইস্কুলে এসো। বলবো।'

কিশোরের এইসব তথ্য চেপে রেখে টেনশনে রাখার ব্যাপারটা ভালো লাগে না রবিনের। এখন ফোনে বললে কি অসুবিধে হতো? বিরক্তি চাপতে না পেরে রিসিভারটা আছড়ে ক্রেডলে ফেললো সে। ইস্কুলে পড়াশোনা আর ক্লাস নিয়ে এতো ব্যস্ত রইলো কথা বলার সুযোগ পেলো ছুটির পর। তবে সেদিন ছুটি হলো সকাল সকাল।

'আজ পিনটুকে দেখেছো তোমরা?' জোর বৃষ্টির মধ্যে সাইকেল চালিয়ে ইয়ার্ডে ফেরার সময় জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'খুঁজেছি,' মুসা জবাব দিলো। 'দেখিনি। ইস্কুলে আসেনি মনে হয় আজ।'

আসলেই আসেনি পিনটু। হেরিয়ানোর সঙ্গে কাটিয়েছে। একজন উকিল ঠিক করার চেষ্টা করেছে, ভাইকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে। ইয়ার্ডে ঢুকে দেখলো তিন গোয়েন্দা, ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছে পিনটু। হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো চারজনে।

'প্রাইভেট উকিলের খরচ দেয়ার সামর্থ্য নেই আমাদের,' পিনটু জানালো, 'তাই পাবলিক ডিফেণ্ডারস অফিসের সাহায্য চেয়েছি। ওরাও আশা দিতে পারলো না। কেসটা নাকি খারাপ।'

'সে তো জানিই,' মুখ গোমড়া করে বললো রবিন। 'যদিও কাজটা করেনি সে।'

'কি করে প্রমাণ করবো, করেনি?' চোখের কোণে পানি দেখা দিলো পিনটুর। 'আমাদের র‍্যাঞ্চই বা বাঁচাবো কি করে? ভাইয়া জেলে, কোনো সাহায্য করতে পারবে না। ছাড়িয়ে আনতে যে জামিনের টাকা লাগবে, তা-ও দিতে পারবো না।' এক মুহূর্ত থেমে বললো। 'পাঁচ হাজার ডলার জমা দিতে হয়।'

'পাঁচ হাজার!' চোখ বড় বড় করে ফেললো মুসা 'তারমানে র‍্যাঞ্চটা তোমাদের বেচতেই হবে।'

'ওটা বেচেও তো লাভ হবে না। হেরিয়ানোর ধার শোধ করে আর খুব একটা থাকে না। প্রথমেই পাঁচ হাজার দেয়ার দরকার নেই অবশ্য। জজ বলেছে, দশ ভাগের একভাগ আপাতত দিলেই চলবে, বাকিটা কিস্তিতে। সেটাই বা পাবো কোথায়? ধারের চেষ্টা করছি।'

'আমার মনে হয়,' গম্ভীর হয়ে বললো কিশোর, 'বুঝেশুনেই শয়তানীটা করেছে কেউ। আগুন লাগাটা দুর্ঘটনা ছিলো না। হ্যাটটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে ক্যাম্পফায়ারের

কাছে ফেলে রেখেছে। সেটা প্রমাণ করতে পারলেই হতো।'

'কিন্তু কিভাবে?' করুণ হয়ে উঠেছে পিনটুর মুখ।

'হ্যাটটা শেষ কখন রিগোর মাথায় ছিলো, তাই তো জানি না আমরা,' বললো রবিন।

'জানি,' কিশোর বললো। 'গত বিষ্যুৎবারে বেলা তিনটায় তার মাথায় ছিলো ওটা। যেদিন আগুন লেগেছিলো। মনে নেই? ইস্কুলের বাইরে যখন আমাদের সাথে দেখা হলো, তখন ছিলো।'

'ঠিক বলেছো, ঠিক!' চেঁচিয়ে উঠে টেবিলে থাবা মারলো রবিন।

'তারমানে ক্যাম্পফায়ারের কাছে হ্যাট ফেলে আসেনি রিগো,' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর, 'তিনটের আগেও ছিলো মাথায়, পরেও। আমাদের সঙ্গে ছিলো তখন। তার পরে আগুন নেভাতে গিয়েছিলো। শেরিফ যদি তার মাথায় হ্যাট দেখে না থাকেন, তাহলে হ্যাটটা খোয়া গেছে ইস্কুল থেকে আমাদের রওনা হওয়া থেকে আগুন নেভাতে যাওয়ার সময়ের মাঝখানে, কোনো এক সময়।'

'কিশোর,' রবিন বললো, 'আগুন নেভাতে যাওয়ার সময় ট্রাকের পেছনে ছিলো রিগো, আমাদের সঙ্গে। তখন বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে ফেলেনি তো? ক্যাম্পফায়ারের কাছে গিয়ে পড়ে থাকতে পারে।'

'অসম্ভব,' পিনটু মাথা নাড়লো। 'ড্র-কর্ড দিয়ে চিবুকের নিচে আটকানো থাকে ওই হ্যাট। কোনো কিছুতে চড়ার সময় ওটা খুব শক্ত করে আটকে নেয় ভাইয়া।'

'তাছাড়া সেদিন তেমন বাতাসও ছিলো না,' যোগ করলো মুসা। 'সে-জন্যেই তো বেশি ছড়াতে পারেনি আগুন।'

'যাই হোক,' কিশোর বললো, 'আগুনটা শুরু হয়েছিলো আমরা র‍্যাঞ্চে পৌঁছার আগেই। কাজেই ট্রাক থেকে হ্যাটটা উড়ে গিয়ে থাকলেও বুঝতে হবে আগুন লাগার পরে ক্যাম্পফায়ারের কাছে গিয়ে পড়েছিলো ওটা।'

'প্রমাণ করতে পারছি না,' নাক কুঁচকালো রবিন, 'সেটাই হলো মুশকিল।'

'আমরা সাক্ষি দিতে পারি অবশ্য। তাতে কতোটা কাজ হবে জানি না। তবে সত্যিকারের কোনো প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। সুতরাং প্রমাণ জোগাড় করতে হবে। জানতে হবে হ্যাটটা কিভাবে ক্যাম্পফায়ারের কাছে গিয়ে পড়েছিলো।'

'কি করে, কিশোর?' মুসার প্রশ্ন।

'প্রথমে রিগোর সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করবো, হ্যাটটা শেষ কখন মাথায় ছিলো, কিংবা কখন খুলেছিলো মনে করতে পারে কিনা। একই সঙ্গে করটেজ সোর্ড খোঁজাও চালিয়ে যাবো। আমরা যে খুঁজছি এটা জানে টেরি আর ডরি। তলোয়ার খুঁজছি কিনা না জানলেও এটা বুঝতে পেরেছে, দামী কিছু খুঁজছি আমরা, যেটা বিক্রি

করে আলভারেজ র‍্যাঞ্চ বাঁচানো যাবে। সে-জন্যেই হয়তো রিগোকে অ্যারেস্ট করিয়েছে আমাদের ঠেকানোর জন্যে।'

'আবার তাহলে হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে যেতে হবে আমাদের,' রবিন বললো, 'নতুন সূত্র খুঁজতে।'

'পাবো না,' নিরাশ ভঙ্গিতে এপাশ ওপাশ মাথা দোলালো মুসা। 'সারা জিন্দেগী খুঁজেও বের করতে পারবো না।'

'কাজটা সহজ হলে তো অনেক আগেই বের করে ফেলতো কেউ,' কিশোর বললো। 'তবে ঠিকমতো চেষ্টা করলে বের করা যাবেই। দুটো দিনের ওপর জোর দিতে হবে আমাদের। পনেরো আর ষোল সেপ্টেম্বর, আঠারোশো ছেচল্লিশ সালের। পনেরো তারিখে পালিয়েছেন ডন পিউটো, তার আগে পর্যন্ত বন্দি ছিলেন, এবং তার পরে তাঁর কি হয়েছে কেউ জানে না। দেখেওনি কেউ। তারপর, ঠিক পরের দিনই, ষোল তারিখে আর্মি থেকে পালিয়েছে তিনজন সৈনিক। তাদেরকেও আর দেখা যায়নি।'

'আচ্ছা,' টেবিলে কনুই রেখে সামনে ঝুঁকলো রবিন, 'কনডর ক্যাসলকে নিজের ঠিকানা বোঝাতে চাননি তো ডন?'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'না, তাঁর ঠিকানা ছিলো ক্যাবরিলো হাউস।'

'একটা গল্প বলি। ডন পিউটোর মতোই বিপদে পড়েছিলো একজন লোক, স্কটসম্যান, নাম ক্লানি ম্যাকফারসন। সতেরোশো পঁয়তাল্লিশ সালে ইংরেজরা স্কটিশ হাইল্যাণ্ড দখল করে বসলো, কালোডেনের যুদ্ধে স্কটসদেরকে পরাজিত করে। ম্যাকফারসনকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো তারা, খুন করার জন্যে। কারণ ম্যাকফারসন ছিলো হাইল্যাণ্ডের একজন চীফ। বেশির ভাগ চীফই তখন দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু ম্যাকফারসন পালায়নি।'

'কি করলো?' কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো পিনটু।

'ঠিক তার বাড়ির কাছেই গুহায় গিয়ে ঢুকলো। পুরো এগারোটা বছর বাস করেছিলো ওখানে। তার অনেক বন্ধু ছিলো, তারা তাকে সাহায্য করেছে। খাবার দিয়েছে, পানি দিয়েছে, কাপড় দিয়েছে। ইংরেজরা বুঝতেই পারেনি কিছু। বিপদ কেটে গেল একদিন, আবার বেরিয়ে এলো ম্যাকফারসন।'

'তারমানে,' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মুসা, 'তুমি বলতে চাইছো, কনডর ক্যাসলের কাছাকাছি কোনো গুহায় লুকিয়েছিলেন ডন পিউটো?'

মাথা ঝাঁকালো রবিন। 'অসম্ভব কি? লুকিয়ে ছিলেন বলেই হয়তো কেউ তাঁকে আর দেখতে পায়নি।'

'কেউ দেখতে পায়নি, একথাটা তাহলে ঠিক না,' শুধরে দিলো কিশোর।

'ম্যাকফারসনের মতোই তাঁর বন্ধুরা তাঁর সাথে দেখা করেছে, খাবার-কাপড়-পানি দিয়েছে। এদিকটা তুমি ভালোই ভেবেছো, রবিন, আমার খেয়াল হয়নি। তাহলে আমাদের খোঁজার সময়টা আরও বাড়িয়ে দিতে হবে। আঠারোশো ছেচল্লিশের শুধু ষোল সেপ্টেম্বরে হবে না, পরের দিনগুলোরও খাবার নিতে হবে।'

'খাইছে!' আতঙ্ক ফুটলো মুসার চোখে। 'কয়েকটা কমপিউটর লাগবে! নইলে অসম্ভব!'

'গোয়েন্দাগিরি অতো সহজ না,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বললো কিশোর। রহস্য জটিলতর হচ্ছে বলে মজাই পাচ্ছে সে। 'খোঁজার দরকার হলে খুঁজবো। তবে তোমার তেমন ভয় নেই। তুমি স্প্যানিশ জানো না। কাজটা করতে হবে আমাকে আর পিনটুকেই।'

'আমি আর মুসা তাহলে কি করবো?' রবিন জানতে চাইলো।

'জেলে যাবে।'

'জেলে!' চমকে গেল মুসা।

'আরে না না,' মুচকি হাসলো কিশোর, 'আসামী হয়ে যাবার কথা বলছি না। যাবে রিগোর সঙ্গে কথা বলতে।'

এগারো

পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ওপরের একটা তলায় রকি বীচ জেলখানা। তালাবদ্ধ গরাদের সামনে ডেস্কে বসে আছে একজন ডিউটিরত পুলিশম্যান। দ্বিধাজড়িত পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। রিগো আলভারেজের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইলো।

'সরি, বয়েজ,' লোকটা বললো, 'লাঞ্চের পরে ভিজিটিং আওয়ার। তবে আসামীর উকিল যখন খুশি তার সঙ্গে দেখা করতে পারে।' একটা বিমল হাসি উপহার দিলো পুলিশম্যান।

কেউকেটা গোছের মানুষ ওরা, এমন ভাব দেখিয়ে রবিন বললো, 'সে আমাদের মক্কেল।'

'অনেকটা উকিলের মতোই ধরতে পারেন আমাদেরকে,' মুসা বললো।

'দেখো, আমি ব্যস্ত। অহেতুক বকবক করার সময়...'

'অহেতুক করছি না,' তাড়াতাড়ি বললো রবিন। 'আমরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ। রিগো আমাদের মক্কেল। এই কেসের ব্যাপারে তার সাথে কথা বলতে চাই। খুব জরুরী। আমরা...'

হাসি হাসি ভাব দূর হয়ে গেছে লোকটার। পুরোপুরি গম্ভীর এখন। ভ্রূকুটি করে

বললো, 'যাও, বেরোও এখন! বেরোও!'

ঢোক গিললো রবিন। মুসাকে নিয়ে বেরোতে যাবে, এই সময় পেছনে কথা বলে উঠলো একটা কণ্ঠ, 'ওকে তোমাদের কার্ডটা দেখাও না, তাহলেই তো হয়।'

চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরলো রবিন আর মুসা। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রকি বীচের পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার।

কার্ড বের করে কর্তব্যরত পুলিশম্যানকে দেখালো রবিন। ইয়ান ফ্লেচারের দেয়া সার্টিফিকেটের একটা ফটোকপিও দেখালো।

'কি জন্যে এসেছো, রবিন?' চীফ জিজ্ঞেস করলেন।

জানালো রবিন।

সব শুনে মাথা ঝাঁকালেন চীফ। পুলিশম্যানের দিকে ফিরে বললেন, 'দেখা করতে দিতে পারো।'

'দিচ্ছি, স্যার,' উঠে দাঁড়ালো লোকটা। 'আমি জানতাম না আপনি ওদেরকে সার্টিফাই করেছেন। আগে ওটা দেখালেই হতো।'

'ওরা যে কতোবার কতোভাবে পুলিশকে সাহায্য করেছে, জানো না তুমি। বয়েস কম হলে কি হবে, তুখোড় গোয়েন্দা,' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন চীফ। ছেলেদের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমি যাই, কাজ আছে।' একবার হেসে চলে গেলেন তিনি।

একটা কলিংবেলের বোতাম টিপলো পুলিশম্যান। একটা করিডর দিয়ে বেরিয়ে এলো আরেকজন পুলিশ। গোয়েন্দাদেরকে নিয়ে যাওয়ার কথা বললো তাকে প্রথম পুলিশম্যান।

আসামীর সঙ্গে দেখা করতে যাবারও নানা ঝক্কি। অনেক নিয়ম-কানুন। সেগুলো পালন করার পর গিয়ে আসামীর দেখা পেলো দুই গোয়েন্দা।

'এসেছো,' শান্তকণ্ঠে বললো রিগো। 'ভালো। তবে আমার কিছু দরকার নেই।'

'আমরা জানি আগুনটা আপনি লাগাননি,' মুসা বললো।

হাসলো রিগো। 'জানি আমিও। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে?'

'আমরা সেটা প্রমাণ করে ছাড়বো,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো রবিন।

'কিভাবে?'

বেলা তিনটায় যে রিগোর মাথায় হ্যাট দেখেছে, সেকথা তাকে বললো রবিন।

'তাহলে নিশ্চয়ই,' উজ্জ্বল হলো রিগোর চোখ, 'আগুন লাগার পর কোনোভাবে ডয়েলদের জমিতে গিয়ে পড়েছিলো হ্যাটটা!'

'এমনও হতে পারে, অন্য কোথাও পড়ে ছিলো ওটা, কেউ তুলে নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়েছে ডয়েলদের এলাকায়?'

'হ্যাঁ, পারে! আমাকে ফাঁসানোর জন্যে!'

'সেটাই জানার চেষ্টা করছি আমরা। কে, কিভাবে ক্যাম্পফায়ারের কাছে নিয়ে গিয়ে হ্যাট ফেললো।'

'কাজেই আমাদের জানা দরকার,' রবিনের কথার পিঠে বললো মুসা, 'কখন আপনার মাথা থেকে খুলেছেন ওটা। ট্রাকে করে যখন আগুন নেভাতে যাচ্ছিলাম, তখন কি ছিলো?'

গাল চুলকালো রিগো। চোয়ালে হাত বোলালো। তারপর মাথা নাড়লো, 'নাহ, মনে করতে পারছি না!'

'ভাবুন!' জোর দিয়ে বললো মুসা।

'হ্যাঁ, ভাবুন,' গলা মেলালো রবিন।

কিন্তু অসহায় চোখে শুধু তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো বেচারা রিগো।

পুরানো খবরের কাগজের সমস্ত সংস্করণ মাইক্রোফিল্ম করে রাখা হয়েছে। মাইক্রোফিল্ম রীডারে সেগুলো পুরে পড়ছে পিনটু। তাকে রকি বীচ লাইব্রেরিতে রেখে হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে চলে গেছে কিশোর। দু'জনে দুই জায়গায় খোঁজার জন্যে।

কাগজের প্রতিটি সংখ্যার প্রতিটি পাতা খুঁটিয়ে দেখছে পিনটু। সেপ্টেম্বরের ষোল থেকে অক্টোবরের শেষ হপ্তায় চলে এলো। কিছুই পায়নি এতোক্ষণেও, শুধু একটা সংখ্যায় ডন পিউটোর মৃত্যুর সংক্ষিপ্ত খবর ছাড়া। সার্জেন্ট ডগলাসের রিপোর্টেরই পুনরাবৃত্তি, আর কিছু না।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে হাত মাথার ওপরে তুলে শরীর টানটান করলো সে। ঘরটা নীরব। বাইরে বৃষ্টি পড়ার শব্দ হচ্ছে।

পত্রিকা দেখতে ইচ্ছে হলো না আর তার। বুঝলো, ওগুলোতে কিছু পাওয়া যাবে না। টেবিলে হাতের কাছেই একগাদা বই ফেলে রেখেছে। ওগুলো সব ছাপানো মেমোয়ার আর ডায়েরী, উনিশ শতকে লেখা স্থানীয় মানুষের। যতোগুলো জোগাড় করতে পেরেছে লাইব্রেরি, সব তুলে এনে একসাথে করে ছেপে নিয়েছে।

প্রথম মেমোয়ারটা টেনে নিলো পিনটু। লিস্ট দেখে পাতা খুললোঃ মিড-সেপ্টেম্বর, ১৮৪৬।

পঞ্চম জার্নালটা বন্ধ করে কান পাতলো কিশোর পাশা। বাইরে ঝমঝম ঝরছে অবিরাম বৃষ্টি। স্প্যানিশ সেটেলারদের হাতে লেখা পুরানো ইতিহাস পড়তে দারুণ লাগে তার, তবে সেগুলোর ওপর থেকে জোর করে চোখ সরিয়ে এনে শুধু খুঁজছে ডন পিউটোর খবর। কিন্তু এতোক্ষণেও কোনো সূত্র চোখে পড়েনি।

কিছুটা হতাশ হয়েও ছয় নম্বর জার্নালটা টেনে নিলো সে। এটা পড়তে ততো কষ্ট হবে না, বুঝলো, কারণ এটা ইংরেজিতে লেখা।

মিনিট দশেক পরে হঠাৎ সামনে ঝুঁকে গেল সে, ঢিলেমি ভাবটা দূর হয়ে গেছে মুহূর্তে। চকচক করছে চোখ। বার বার করে পড়লো লেখাটা। আমেরিকান সেনাবাহিনীর একজন সেকেণ্ড লেফটেন্যান্টের কথা।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। পৃষ্ঠাটার একটা ফটোকপি করে নিলো। জার্নালগুলো অ্যাসিসটেন্ট হিসটোরিয়ানকে বুঝিয়ে দিয়ে প্রায় ছুটে বেরোলো ঘর থেকে। বাইরের বৃষ্টির পরোয়াই করলো না।

আবার মাথা নাড়লো রিগো। 'নাহ্, কিচ্ছু মনে করতে পারছি না!'

'বেশ,' রবিন বললো, জোর করে শান্ত রাখছে নিজেকে, 'আমরা আপনাকে সাহায্য করছি। ধাপে ধাপে আসা যাক। ইস্কুলে আপনার মাথায় হ্যাটটা ছিলো। কিশোরের সেটা মনে আছে, আমারও। এখন...'

'টেরি আর ডরিরও নিশ্চয় মনে আছে,' বাধা দিয়ে তিক্ত কণ্ঠে বললো মুসা। 'হাজার চাপ দিলেও ব্যাটারা স্বীকার করবে না সেটা।'

'না করুক,' রবিন বললো। 'মুসা বলেছে, স্যালভিজ ইয়ার্ডে আপনার মাথায় ওটা দেখেছে, তাই না মুসা?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো মুসা।

'ট্রাকে আলভারেজদের ইতিহাস আমাদের শুনিয়েছেন আপনি। আমার পরিষ্কার মনে আছে, হাত তুলে তুলে জায়গা দেখাচ্ছিলেন আপনি, আপনার হাতে ছিলো না হ্যাট। ট্রাকে করে যাওয়ার সময় জোরালো বাতাস ছিলো, কনকনে ঠাণ্ডা, কাজেই মাথায় যাতে বাতাস না লাগে সে-জন্যে হ্যাটটা তখন মাথায় পরে থাকাই স্বাভাবিক।'

'তারপর আমরা হাসিয়েনডায় পৌঁছলাম,' রবিনের কথার খেই ধরলো মুসা। 'ট্রাক থেকে নামলাম। আপনি রাশেদ আংকেলের সঙ্গে করটেজের মূর্তিটা নিয়ে কথা বললেন। তারপর? হাসিয়েনডায় ঢুকেছিলেন? হ্যাটটা খুলেছিলেন?'

ভাবলো রিগো। 'না, আমি ঘরে ঢুকিনি।...আমি...দাঁড়াও দাঁড়াও...হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে!'

'কী?' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

'জলদি বলুন!' তাগাদা দিলো রবিন।

জ্বলজ্বল করছে এখন রিগোর চোখ। 'সরাসরি গোলাঘরে ঢুকেছিলাম, মিস্টার পাশাকে মাল দেখানোর জন্যে। ভেতরে আলো কম ছিলো। হ্যাটের কানা ছায়া ফেলছিলো চোখের ওপর, তাই খুলে হাতে নিয়েছিলাম। তারপর,' ছেলেদের দিকে

তাকালো সে, 'ওটা দরজার কাছে একটা হুকে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। ওটা ওখানেই থাকলো। হুগো আর ষ্টেফানো যখন আগুন আগুন বলে চিৎকার করে উঠলো হ্যাট না নিয়েই ছুটে বেরোলাম।'

'হুঁ। তাহলে ওটা ওখানেই থাকার কথা,' রবিন বললো। 'ক্যাম্পফায়ারের কাছে নয়।'

'তারমানে কেউ একজন,' বললো মুসা, 'ওটা বের করে নিয়ে গেছে ঘরে আগুন লাগার আগেই। নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়েছে ক্যাম্পফায়ারের কাছে।'

'কিন্তু,' রিগো বললো, 'সেটা প্রমাণ করা যাচ্ছে না।'

'দেখি গোলাঘরে গিয়ে কিছু মেলে কিনা,' আশা করলো রবিন। 'সব নিশ্চয় পুড়ে মাটিতে মিশে যায়নি। সূত্র পেলে পেতেও পারি। মুসা, চলো, কিশোরকে গিয়ে বলি।'

রিগোকে গুডবাই জানিয়ে বেরিয়ে এলো দু'জনে।

বাইরে বৃষ্টি। তারমধ্যেই সাইকেল চালিয়ে হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে চললো ওরা। কিন্তু ওখানে পাওয়া গেল না কিশোরকে।

'গেল কোথায়?' রবিনের দিকে তাকালো মুসা।

'কি জানি,' ঠোঁট কামড়ালো রবিন। 'অন্ধকার হতে দেরি আছে, আরও ঘণ্টা দুয়েক। চলো, আমরাই গিয়ে খুঁজি।'

'চলো। কিশোররাও হয়তো ওখানেই গেছে।'

আবার বাইরে বৃষ্টিতে বেরিয়ে এলো ওরা। রওনা হলো আলভারেজ র‍্যাঞ্চে।

বারো

হাসিয়েনডার চত্বরে ঢুকলো রবিন আর মুসা। বৃষ্টি থেমেছে। পোড়া কালো ধ্বংসস্তূপটা নীরব, নির্জন। কিছু পোড়া খুঁটি আর দেয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও, যেন ঘরগুলোর কঙ্কাল। হাসিয়েনডার পেছনে পাহাড়ের মাথায় আগের মতোই দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাঙা ঘোড়ার মূর্তি, নিচ দিয়ে ভেসে যাওয়া মেঘের মধ্যে কেমন যেন ভূতুড়ে লাগছে ওটাকে। কিশোর আর পিনটুকে দেখা গেল না।

'অপেক্ষা করবো?' মুসার প্রশ্ন।

'এসেছি যখন চুপ করে থেকে লাভ কি? এসো খুঁজি।'

ভাঙা দেয়াল, আর পড়ে থাকা কড়িবর্গাগুলোর দিকে বিতৃষ্ণ নয়নে তাকালো মুসা। 'যা অবস্থা! কি করে খুঁজবো?'

'বাইরেই খুঁজি আগে। কোনো কিছু পড়ে থাকতে পারে। পায়ের ছাপ পাওয়া যেতে পারে।'

কোরালাটা যেখানে ছিলো তার দু'পাশে ছড়িয়ে পড়লো দু'জনে। মাথা নিচু করে দেখতে দেখতে এগোলো গেটের দিকে। পুরো চত্বরে কাদা হয়ে গেছে বৃষ্টিতে। আঠালো কাদা জুতো কামড়ে ধরে, টান দিয়ে তুলতে গেলে বিচিত্র শব্দ হয়ে যায় ফচাৎ করে।

গোলার দরজার কাছে চলে এলো ওরা। পোড়া কাঠামোটা কিস্তৃত ভঙ্গিতে বেঁকেচুরে রয়েছে।

'একটা কাঠিও দেখছি না মাটিতে,' মুসা বললো। 'এমন কাদার কাদা, সব ঢেকে ফেলেছে।'

'পায়ের ছাপও পাওয়া যাবে না। চলো, ভেতরে দেখি।'

ভেতরের অবস্থা আরও খারাপ। কড়িবর্গা, ধসে পড়া দেয়াল, ছাত, ঘোড়ার স্টল, আর হাজারটা পোড়া জিনিস যেন জট পাকিয়ে রয়েছে। বৃষ্টিতে ভিজে সেসব জঞ্জাল থেকে পচা গন্ধ বেরোচ্ছে, নাকে জ্বালা ধরায়। কোনো জিনিসই চেনার উপায় নেই। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লো দু'জনে।

'এখানে পাবো?' মাথা নাড়লো মুসা। 'মনে হয় না। কি খুঁজতে এসেছি সেটাই জানি না!'

'সূত্র। দেখলেই বুঝে যাবো যে ওটা খুঁজছি।'

'কোনখান থেকে শুরু করবো?'

'দরজার কাছ থেকে। যেখানে ঝোলানো ছিলো হ্যাটটা। ওই দেখো, বাঁ দিকের দেয়ালে হুকটা এখনও আছে।'

'আছে। হুকের কঙ্কাল,' বিড়বিড় করলো মুসা। পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে কাঠের হুক।

কালো হয়ে থাকা দেয়ালে এখনও গাঁথা রয়েছে তিনটে হুক, একসারিতে। ওগুলোর নিচের মাটিতে খোঁজা আরম্ভ করলো ওরা।

জঞ্জালের অভাব নেই। অনেক জিনিসই পাওয়া গেল, কিংবা বলা ভালো জিনিসের ধ্বংসাবশেষ, তবে সবই ওগুলো আলভারেজদের জিনিস, কোনো সূত্র-টুত্র না।

অবশেষে কিছু না পেয়ে ধপ করে একটা পোড়া বর্গার ওপর বসে পড়লো মুসা। 'হবে না। সূত্রটার গায়ে যদি "সূত্র" সীল মারা থাকে, তাহলেই শুধু চিনবো।'

'ঠিকই বলেছো,' হাল ছেড়ে দিয়েছে রবিনও। 'এতো বেশি জঞ্জাল···'

'এই, কে যেন আসছে,' লাফ দিয়ে উঠে দরজার দিকে এগোলো মুসা। 'বোধহয় কিশোর···।' কথা শেষ না করেই চকিতে সরে চলে এলো ভাঙা দেয়ালের আড়ালে। ফিসফিস করে বললো, 'তিনজন! চিনি না!'

জঞ্জালের স্তূপের আড়ালে বসে পড়ে সাবধানে মাথা তুলে উঁকি দিলো রবিন।

'এদিকেই আসছে! জলদি ওখানে ঢোকো।' কড়িবর্গার ওপর পড়ে থাকা কতগুলো টালি দেখালো সে। ভেতরে ঢোকার জায়গা আছে।

শরীর মুচড়ে মুচড়ে নিঃশব্দে সেই ফাঁকে ঢুকে পড়লো দু'জনে। উপুড় হয়ে পড়ে রইলো মাটিতে। নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছে, পাছে শুনে ফেলে লোকগুলো।

গোলাঘরে এসে ঢুকলো তিন আগন্তুক।

'জঘন্য চেহারা,' ফিসফিসিয়ে না বলে পারলো না মুসা। তাকে চুপ করতে বললো রবিন।

ঠিক দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চোখ বোলাতে লাগলো লোকগুলো। একজন বিশালদেহী, কালো চুল, পুরু গোঁফ, মুখে তিন-চার দিনের না-কামানো দাড়ি। দ্বিতীয়জন ছোটখাটো, মুখটা লম্বাটে—মুসার মনে হলো, ইঁদুরের মুখের সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে, কুতকুতে চোখে যেন রাজ্যের শয়তানী ভরা। তৃতীয়জন মোটা, টাকমাথা, টকটকে লাল মোটা নাক, সামনের কয়েকটা দাঁত ভাঙা। তিনজনেই নোংরা, পরনে মলিন জিনস, কাদামাখা কাউবয় বুট পায়ে, গায়ে ওঅর্ক শার্ট, মাথায় তেল চটচটে, ময়লা, দোমড়ানো হ্যাট। হাত-মুখের খসখসে চামড়া দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, শেষ গোসলটা মাসখানেক আগে হয়তো করেছে।

পোড়া ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে একজনও খুশি হতে পারলো না।

'এখানে কিচ্ছু পাবো না,' বললো হাড্ডিসর্বস্ব ইঁদুরমুখো। 'কি করে বের করবো এখান থেকে, গুডু?'

'বের করতেই হবে,' জবাব দিলো বিশালদেহী লোকটা।

'সম্ভব না, গুডু,' ইঁদুরের মতো কিঁচকিঁচ করে কথা বলে মোটা, টাকমাথা লোকটা। 'কোনো উপায় দেখছি না।'

'না খুঁজেই ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করে দিলে?' ধমকের সুরে বললো গুডু। 'এখানেই আছে।'

'বেশ, দেখছি, ইঁদুরের কণ্ঠ শোনালো আবার মোটো। লাথি মারতে আরম্ভ করলো জঞ্জালে। এমন একটা ভাব করছে, যেন যা খুঁজছে যে কোনো মুহূর্তে লাফ দিয়ে বেরিয়ে চলে আসবে চোখের সামনে।

এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি শুরু করলো ইঁদুরমুখো। খুঁজছে, তবে তেমন মন আছে বলে মনে হলো না। গুডু বলেছে, তাই খুঁজছে, এই আরকি।

রেগে গেল গুডু। 'এটা কিরকম কাজ হচ্ছে, নিকি! ভালোমতো খোঁজো!'

গুডুর দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে রইলো ইঁদুর, তারপর খোঁজায় আরেকটু মন লাগালো।

'এই, হারনি, তুমিও ফাঁকি মারছো!' টাকমাথাকে ধমক লাগালো বিশালদেহী।

সাথে সাথে মেঝেতে বসে পড়লো হারনি। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে জঞ্জালের তলায়, ফাঁকফোকরে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো। তার দিকে তাকালো একবার নিকি আর গুড়ু, দুজনেই বিরক্ত, দরজার ফ্রেমের দুই পাশে খুঁজতে শুরু করলো ওরা।

'এখানেই হারিয়েছে?' নিকি জিজ্ঞেস করলো গুড়ুকে। 'তুমি শিওর?'

'না হলে কি এসেছি নাকি? তাড়াতাড়ি পালানোর জন্যে ইগনিশনের কি করেছিলাম মনে নেই? পরে আরেক সেট লাগাতে হয়েছে।'

খুঁজতে খুঁজতে অন্তত বার দুই মুসা আর রবিনের কাছাকাছি চলে এলো ওরা। একবার তো গুড়ু এতো কাছে চলে এলো, হাত বাড়ালেই তার জুতো ছুঁতে পারতো মুসা। লোকটার বুটের বিশেষ খাপে ঢোকানো ধারালো কাউবয় ছুরিটার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিললো সে।

'বুঝতে পারছি না কিছু,' কিছুক্ষণ পর আরও বিরক্ত হয়ে বললো নিকি। 'আর কোথাও হারায়নি তো?'

'গাধা নাকি!' গর্জে উঠলো গুড়ু। 'এখানেই তো...'

'এতো ধমক মারছো কেন?' সমান তেজে জবাব দিলো এবার নিকি। তারপর বললো, 'দেখি, বাইরে পড়লো কিনা।'

আরেকবার খোঁজায় মন দিলো ইঁদুরমুখো। তার ছুরিটাও দেখতে পেলো মুসা।

'হুঁ,' অবশেষে বললো গুড়ু, 'বুঝতে পারছি, এভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আলো দরকার। চলো, আরেকবার গিয়ে খুঁজে দেখি, যেখানে সেদিন পার্ক করেছিলাম। কিছু না পেলে আলো নিয়ে এসে আবার খুঁজবো।'

বেরিয়ে গেল তিনজন। চত্বরে ওদের কথা কাটাকাটি শোনা গেল কিছুক্ষণ। তারপর চুপ হয়ে গেল। বোধহয় চলে গেছে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো রবিন আর মুসা। নির্জন চত্বর।

'ওরা কে জানি না,' রবিন বললো। 'তবে একটা কথা বোঝা গেল, আগুন লাগার দিন ওরা এসেছিলো এখানে। রিগোর হ্যাট চুরির সঙ্গে ওদের কোনো সম্পর্ক আছে। আমার মনে হয় গাড়ির চাবিটাবি হারিয়েছে ওরা।'

'আমারও তাই মনে হলো। মিষ্টার ডয়েলের ওখানে কাজ করে বোধহয়।'

'চাবি হারিয়ে থাকলে ব্যাপারটা সত্যি ওদের জন্যে বিপজ্জনক। কিংবা আর কারও জন্যে। এসো, খুঁজি।'

'খুঁজলাম তো। ওরাও খুঁজলো। নেই।'

'ওরা ঠিকমতো খোঁজেনি। এখন আমরা জানি কি খুঁজতে হবে। দরজার আশপাশে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জঞ্জাল তুলে দেখবো। একটা পোড়া কাঠ-টাঠ তুলে আনো না।

একটা বেলচাই পাওয়া গেল। ছাই আর জঞ্জাল খুঁচিয়ে তুলতে আরম্ভ করলো মুসা। যেই ধাতব কিছুতেই লাগে বেলচা, শব্দ হয়, অমনি দু'জনে মিলে বসে পড়ে বেলচায় উঠে আসা জঞ্জালে হাত দিয়ে দেখে। প্রতিটি জিনিস পরীক্ষা করে। ওদেরকে সাহায্য করার জন্যেই যেন মেঘ অনেকখানি পাতলা হয়ে এসেছে, আলো বেড়েছে, দেখতে সুবিধে হচ্ছে তাতে। মেঘের ফাঁকে এখন নীল আকাশও বেরিয়ে এসেছে কোথাও কোথাও।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো রবিন, 'মুসাআ!' আঙুল নির্দেশ করলো একটা চকচকে জিনিসের দিকে।

তুলে নিলো মুসা। দেখার জন্যে এমনভাবে ঝুঁকে এলো রবিন, মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল দু'জনের। থাবা মেরে প্রায় কেড়ে নিলো জিনিসটা মুসার হাত থেকে।

দুটো চাবি। রিঙে লাগানো। রিঙটায় একটা খাটো চেন, চেনের আরেক মাথায় রূপার একটা নকল ডলার।

'কোনো চিহ্ন-টিহ্ন আছে?' মুসা জিজ্ঞেস করলো। 'নাম-টাম?'

'না। তবে গাড়ির চাবি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটাই খুঁজতে এসেছিলো লোকগুলো!'

'না-ও হতে পারে,' অতোটা আশা করতে পারলো না মুসা। 'রিগোর চাবিও হতে পারে এটা। কিংবা তার কোনো বন্ধুর।'

'এই, তোমরা এখানে কি করছো?'

ঝট্ করে ফিরে তাকালো মুসা আর রবিন। হারনি দাঁড়িয়ে আছে পোড়া দরজার কাছে।

'পেছনে!' রবিনের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো মুসা। 'কুইক!'

পেছনে ঘুরে দৌড় মারলো দু'জনে। লাফিয়ে পেরিয়ে এলো জঞ্জালের কয়েকটা স্তূপ। গোলাঘরের পেছনে ওক গাছগুলো পোড়েনি, এখনও জীবন্ত। ঢুকে পড়লো ওগুলোর ভেতরে। গাছের আড়ালে থেকে ফিরে তাকালো চত্বরের দিকে।

'এই! কে ছেলেগুলো!' গুডুর গর্জন শোনা গেল। পোড়া হাসিয়েনডার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

ঠিক এই সময় কোরালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো নিকি, ডেকে বললো, 'গুডু, ছেলেগুলো নাকি কিছু পেয়েছে! হারনি বলেছে!'

পাগলের মতো আশেপাশে লুকানোর জায়গা খুঁজলো রবিন আর মুসা। হাসিয়েনডার চত্বরে রয়েছে ওদের সাইকেল। ওগুলোর কাছে যেতে হলে লোকগুলোকে পেরিয়ে যেতে হবে। এখানেও লুকানোর জায়গা নেই।

'পাহাড়!' ফিসফিসিয়ে বললো মুসা। 'আর কোথাও জায়গা নেই!'

তর্ক করলো না রবিন। করার সময়ও নেই। মুসার পেছন পেছন দিলো দৌড় সেই শৈলশিরাটার দিকে, যেটাতে পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুণ্ডুহীন ঘোড়ার মূর্তিটা।

তেরো

লাইব্রেরিতে এসে পিনটুকে খুঁজে বের করলো কিশোর। মুখ কালো করে বসে আছে আলভারেজদের শেষ বংশধর। বললো, 'গিরিখাতে গোলাগুলির অনেক খবর আছে। কিন্তু ডনের কি হয়েছিলো, সে-সম্পর্কে কিছুই নেই।'

'দরকারও নেই। জিনিস পেয়ে গেছি আমি। রবিন আর মুসাও নিশ্চয় কাজ শেষ করে ফেলেছে। চলো, যাই।'

'কোথায়?'

'হেডকোয়ার্টারে। ওখানেই আসবে ওরা।'

স্যালভিজ ইয়ার্ডে এসে দুটো সাইকেল পার্ক করে রেখে ট্রেলারে ঢুকলো দু'জন। রবিন আর মুসা আসেনি।

'এখনও হয়তো কথা বলছে রিগোর সাথে,' কিশোর বললো। 'আসুক। আমরা বসি।'

'তুমি কি জিনিস পেলে?' বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলো পিনটু।

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলো কিশোর। উত্তেজনায় আবার চকচক করে উঠলো চোখ। 'আমেরিকান সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার ছিলো ফ্রিমন্টস, যার দলে ছিলো সার্জেন্ট ডগলাস আর দুই করপোরাল। আরও একজন অফিসার ছিলো, সে সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট, জার্নাল রাখতো। আঠারোশো ছেচল্লিশের পনেরো সেপ্টেম্বর লিখেছে এই লেখাটা,' বলে পড়তে লাগলো সে। 'মাথা ঘুরছে আমার! মেজাজও ভীষণ খারাপ। হবেই। যা অত্যাচার যাচ্ছে শরীরের ওপর দিয়ে। তারপরেও স্বস্তি নেই, রেহাই পেলাম না কাজ থেকে। আজ রাতে আমার ডিউটি পড়লো ডন পিউটো আলভারেজের হাসিয়েনডায়, লুকানো জিনিসের খোঁজ করার জন্যে। শোনা গেছে, চোরাই মাল নাকি আছে ওখানে। সন্ধ্যা হয় হয় এই সময় এমন একটা জিনিস চোখে পড়লো, বিশ্বাস করতে পারলাম না। হয়তো আমার চোখের ভুল, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে অমন হয়েছে। দেখলাম, সান্তা ইনেজ ক্রীকের পাশের একটা শৈলশিরা ধরে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে ডন পিউটো আলভারেজ, হাতে একটা বিরাট তলোয়ার। পিছু নেয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কাছাকাছি যাওয়ার আগেই অন্ধকার নেমে এলো। আর এগোতে সাহস করলাম না, কারণ আমার শরীরের অবস্থাও ভালো নয়। যদি সত্যিই ডন হয়ে থাকে, তার সাথে

একলা লাগতে যাওয়া বোকামি হয়ে যাবে। ক্যাম্পে ফিরে রিপোর্ট করলাম। আমাকে জানানো হলো, সেইদিন সকালেই পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে মারা পড়েছে ডন, কাজেই আমি যাকে দেখেছি সে ডন হতেই পারে না। তাহলে কাকে দেখলাম? চোখের ভুল? ভূত? বার বার জিজ্ঞেস করছি ক্লান্ত মনকে, কোনো জবাব পাচ্ছি না।'

'তারমানে গুলি খেয়ে মরেননি ডন!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো পিনটু। 'লেফটেন্যান্ট সত্যিই দেখেছে! কিশোর, তাঁর হাতে তলোয়ারটাও ছিলো!'

'ছিলো,' হাসলো কিশোর। এখন জোর দিয়ে বলা যায়, পনেরো সেপ্টেম্বর রাতে জীবিত ছিলেন ডন, সাথে ছিলো করটেজ সোর্ড। ভুল দেখেনি লেফটেন্যান্ট। মুসা আর রবিন এলেই দেখতে যাবো।

কিন্তু আরও আধঘন্টা পরও যখন ওরা ফিরলো না, আশঙ্কা জাগলো পিনটুর মনে। 'কিছু হয়নি তো ওদের?'

'গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে হওয়াটা স্বাভাবিক,' গম্ভীর হয়ে বললো কিশোর। 'আমার মনে হয়, রিগোর কাছ থেকে কোনো তথ্য জানতে পেরে খোঁজ নিয়ে দেখতে গেছে সেটা।'

'কোথায় গেল?.'

'নিশ্চয় হাসিয়েনডায়। আর কোথায় যাবে? চলো, আমরাও যাই।'

ট্রেলার থেকে বেরিয়ে আবার সাইকেলে চাপলো দু'জনে। বৃষ্টি কমছে। ওরা হাসিয়েনডায় পৌঁছতে পৌঁছতে একেবারে কমে গেল। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে আকাশ। কাউন্টি রোড ধরে সান্তা ইনেজ ক্রীকের ব্রিজ পেরোনোর সময় দেখলো পানিতে কানায় কানায় ভরে গেছে নালাটা। অ্যারোইওর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মুখ তুলে করটেজের মূর্তিটার দিকে তাকালো পিনটু। চিৎকার করে উঠলো, 'কিশোর, দেখো দেখো, নড়ছে!'

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো দু'জনেই।

'না, মূর্তি নড়ছে না,' কিশোর বললো। 'ওটার কাছে কেউ উঠেছে।'

'মূর্তির পেছনে লুকিয়েছে?'

'মনে হয়...দু'জন...আরে দৌড়াচ্ছে!'

'আসছে তো এদিকেই!'

'মুসা আর রবিন!'

'চলো, চলো!'

পথের পাশের ঝোপে ঠেলা দিয়ে সাইকেল দুটো ঢুকিয়ে রেখেই দৌড় দিলো দু'জনে। তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে, পিছলে পড়ছে রবিন আর মুসা, কিন্তু পরোয়াই করছে না যেন ওসবের। কি করে রাস্তায় নেমে আসবে দ্রুত, কেবল

সেই চেষ্টা। শৈলশিরাটা যেখানে শেষ হয়েছে, তার গোড়ায় একটা খাদ রয়েছে। ওখানে মিলিত হলো চার কিশোর।

'কিশোর, প্রমাণ পেয়েছি!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো মুসা।

'লোক তিনটে দেখে ফেলেছে আমাদের!' এতো জোরে দম ফেলছে রবিন, জড়িয়ে যাচ্ছে কথা।

'তিনজন? কারা?' পিনটু হাঁপাচ্ছে।

'চিনি না। তাড়া করলো আমাদের।'

'জলদি চলো ব্রিজের দিকে,' কিশোর বললো। 'ওটার নিচে লুকানোর জায়গা আছে।'

'কিন্তু ওখানেও খুঁজবে,' রবিন বললো, 'জানা কথা।'

'রাস্তার ধারে একখানে একটা বড় ড্রেন-পাইপ আছে,' পিনটু জানালো। 'ওটা দিয়ে একটা খাদে নেমে যাওয়া যায়। খাদের মধ্যে এতো জংলা, ঢুকলে আর দেখতে পাবে না। চলো চলো।'

পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা বিশাল ড্রেনটার মুখের কাছে এসে দাঁড়ালো চারজনে। ভেতরে পানি বইছে, তবে খুব কম, সামান্যতম দ্বিধা না করে তাতে ঢুকে পড়লো পিনটু। অন্য তিনজনও ঢুকলো। গিয়ে নামলো খাদের মধ্যে। কাদা থিকথিক করছে ওটাতে, একেবারে তলায় পানিও জমেছে যেখানটায় সবচেয়ে বেশি গভীর। চারপাশে চ্যাপারালের ঘন ঝোপ। তার মধ্যে লুকিয়ে বসে রইলো ওরা।

'কি প্রমাণ পেয়েছো?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

চাবিটার কথা জানালো রবিন আর মুসা। ওটা হাতে নিয়ে ম্লান আলোয় দেখলো পিনটু। 'আমাদের না।'

'তাহলে ওই লোকগুলোরই কারো,' কিশোর বললো। 'মনে হচ্ছে গোলাঘরে আগুন লাগার আগে ঢুকেছিলো ওখানে। চাবিটা হারিয়েছে। এবং কাউকে জানতে দিতে চায় না যে ওরা ঢুকেছিলো। হয়তো হ্যাটটা ওরাই চুরি করে নিয়ে গিয়ে ক্যাম্পফায়ারের কাছে রেখে দিয়েছিলো।'

'কিন্তু ওরা কারা?' খসখসে হয়ে গেছে মুসার গলা।

'কি করে বলি? তবে ওই আগুন লাগা আর রিগোর অ্যারেস্টের পেছনে ওদের হাত আছে...শ্শ্শ্!'

রাস্তায় ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আস্তে ঝোপ ফাঁক করে তাকালো ছেলেরা। দুপদাপ করে দৌড়ে ওদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল তিন কাউবয়।

'কখনও দেখিনি,' ফিসফিসিয়ে জানালো পিনটু। 'মিস্টার ডয়েলের লোক হতে পারে। নতুন চাকরি নিয়েছে হয়তো।'

'এখানে কি করছে?' মুসার প্রশ্ন।

'সেটাই জানতে হবে,' জবাব দিলো কিশোর।

'আবার ফিরে না এলেই বাঁচি!' রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো রবিন।

বসেই রইলো ছেলেরা। কান পেতে রয়েছে। আরও পনেরো মিনিট পর জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে কিশোর বললো, 'গিয়ে দেখা উচিত।'

'আমি যাচ্ছি,' পিনটু উঠে দাঁড়ালো। 'মুসা আর রবিনের পিছে লেগেছে ওরা, আমার নয়। আমাকে সন্দেহ করবে না।'

রাস্তায় উঠে বাঁয়ে মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পিনটু। খাদের মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগলো তিন গোয়েন্দা। শব্দটা প্রথম শুনতে পেলো রবিন। কে এসেছে দেখার জন্যে উঠতে গেল সে।

'রাখো!' বাধা দিলো মুসা। 'পিনটু না-ও হতে পারে।'

খাদের কাছে এসে থামলো কেউ। ডেকে বললো, 'বেরিয়ে এসো।'

পিনটু। খাদ থেকে উঠে এলো তিন গোয়েন্দা। ফিরে এলো সান্তা ইনেজ ক্রীকের ব্রিজের কাছে। হাত তুলে দেখালো পিনটু। সবাই দেখলো, উত্তরের কাঁচা রাস্তা ধরে ডয়েল র‍্যাঞ্চের দিকে চলে যাচ্ছে তিন কাউবয়।

'গেছে,' হেসে বললো পিনটু। 'এখান থেকেই আমাদের তদন্ত শুরু হবে, তাই না কিশোর?'

'কিসের তদন্ত?' বুঝতে পারলো না মুসা।

লেফটেন্যান্টের জার্নালের কথা মুসা আর রবিনকে জানালো কিশোর। ফটোকপি করে আনা লেখাটাও দেখালো।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'ডন পিউটো তাহলে সত্যি সত্যি পালিয়েছিলেন! সঙ্গে ছিলো করটেজ সোর্ড!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'তবে লেফটেন্যান্ট যেভাবে লিখেছে, তাতে জায়গা খুঁজে পাওয়ার ভরসা কম। জায়গাটার কোনো বর্ণনা দেয়নি।'

'কিন্তু কিশোর, বলেছে...' প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে গেল পিনটু।

'ও তো বিশ্বাসই করেনি, বলবে কি? তবে যতদূর মনে হয় ওদিকটার কথা বলেছে।' হাত তুললো কিশোর। 'বলেছে সান্তা ইনেজ ক্রীকের পাশের একটা শৈলশিরা ধরে গিয়েছেন। নিশ্চয় বেরিয়েছিলেন হাসিয়েনডা থেকে। তার মানে পশ্চিমে গেছেন।'

সেদিকে তাকালো সবাই।

কিছুই বোঝা গেল না, ওদিক দিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন ডন।

'মাথা গরম ছিলো তখন লেফটেন্যান্টের,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর।

'কি দেখতে কি দেখেছে। কিছু একটা ভুল করেছে, লিখতে গিয়ে। হয়তো যা দেখেছিলো ঠিকমতো লিখতে পারেনি।'

আবার নিরাশা এসে ভর করলো ওদের মনে।

'চলো ফিরে যাই,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো গোয়েন্দাপ্রধান।

ধীরে ধীরে আবার ফিরে চললো ওরা। বাড়ি যাবে।

চোদ্দ

রাতে আবার জোর বৃষ্টি শুরু হলো। ঝরলো পরদিন সারাটা বেলা। ইস্কুলে যেতে হলো তিন গোয়েন্দাকে। ক্লাসে বসে তলোয়ারটার কথা আলোচনার সুযোগ পেলো না।

বিকেলে ভাইকে চাবিটা দেখাতে নিয়ে গেল রিগো। তিন কাউবয়ের কথা বললো। রিগোও চিনতে পারলো না ওদের। চাবিটাও না। পোড়া গোলাবাড়িতে কেন এসেছিলো ওরা, তা-ও বুঝতে না পেরে অনুমানে বললো, 'মিস্টার ডয়েল জোর করে আমাদের তাড়াতে চান আরকি। সে-জন্যেই গুণ্ডাপাণ্ডা ভাড়া করেছেন।'

ডিনারের পর আবার বেরোলো সেদিন তিন গোয়েন্দা। হিসটোরিক্যাল সোসাইটি আর লাইব্রেরিতে তথ্য খুঁজতে। আবার ঘাঁটতে লাগলো গাদা গাদা পুরানো খবরের কাগজ, জার্নাল, ডায়রি, মেমোয়ার, আর্মি রিপোর্ট। নতুন কিছুই পেলো না।

কোনোদিনই আর থামবে না বলে যেন জেদ ধরেছে বৃষ্টি। পড়েই চলেছে, পড়েই চলেছে, একটানা। সেদিন রাতে পড়লো, পরদিন বুধবারেও কমতি নেই। বন্যা হতে পারেঃ জনগণকে হুঁশিয়ার করে দিলো কাউন্টি। ইস্কুল ছুটির পর বাড়িতে কাজ সারতে গেল রবিন আর মুসা। ভাইকে দেখতে গেল পিনটু। হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে গেল আবার কিশোর।

কাজ শেষ করে হেডকোয়ার্টারে চলে এলো রবিন আর মুসা। কিশোর ফেরেনি। পিনটুও আসেনি। ভেজা রেনকোট ছড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ওদের জন্যে

'রবিন, তলোয়ারটা পাবো তো?' আর তেমন আশা করতে পারছে না মুসা।

'জানি না,' মুসার মতোই নিরাশায় ভুগছে রবিন।

আগে এলো পিনটু। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে এসে ট্র্যাপডোর দিয়ে ঢুকলো ট্রেলারে। গত দুই দিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি গোয়েন্দাদের। বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ছেলেটাকে।

'কি ব্যাপার?' শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো রবিন। 'তোমার ভাইয়ের কিছু হয়েছে?'

'ভাইয়ার কিছু হয়নি, তবে আমরা শেষ!' ভেজা জ্যাকেটটা খুলে ওদের পাশে বসে পড়লো পিনটু। 'আমাদের মর্টগেজের কাগজ ছিলো সিনর হেরিয়ানোর কাছে।

তিনি সেটা বিক্রি করে দিয়েছেন মিস্টার ডয়েলকে।'

'বলো কি!' কপাল কুঁচকে ফেললো মুসা।

'কিন্তু তিনি তো বলেছিলেন…'

'বলেছিলেন আরও সময় দেবেন,' রবিনের কথাটা শেষ করে দিলো পিনটু। 'কিন্তু আমাদের জন্যেই সেটা করতে পারলেন না। ভাইয়ার জামিনের টাকা দরকার। আর নিজের ইচ্ছেয় বিক্রি করেননি হেরিয়ানো, ভাইয়ার সঙ্গে আলোচনা করেই করেছেন। ভাইয়াই চাপাচাপি করেছে করতে।'

'হুঁহ! গেল তাহলে,' বলে চুপ হয়ে গেল রবিন।

'তলোয়ারটাও পাওয়ার আশা নেই, এদিকে জমিও…,' কিশোরকে দেখে থেমে গেল মুসা।

ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে গোয়েন্দাপ্রধান। হাঁপাচ্ছে। জানালো, 'শুঁটকি ব্যাটা পিছু নিয়েছিলো। অনেক কষ্টে খসিয়ে এসে লাল-কুকুর-চার দিয়ে ঢুকলাম।'

'পিছু নিয়েছিলো কেন?' পিনটু জিজ্ঞেস করলো।

'জিজ্ঞেস তো আর করিনি,' ভোঁতা গলায় জবাব দিলো কিশোর। 'আমার রয়েছে তাড়া, ওকে জিজ্ঞেস করার সময় কোথায়? যতো তাড়াতাড়ি পারলাম চলে এলাম। কি পেয়েছি, শোনো…'

ধুড়ুম করে কি যেন পড়লো, ট্রেলারের বাইরের জঞ্জালের মাঝে। আরেকবার হলো শব্দ। বাইরের বৃষ্টির মধ্যে থেকে ভেসে এলো টেরিয়ারের কণ্ঠ, 'শার্লকের বাচ্চা! এখানেই কোথাও লুকিয়েছো, আমি জানি!'

দড়াম করে আবার কিছু একটা বাড়ি লাগলো এসে ট্রেলারের গায়ে। গোয়েন্দারা কোথায় লুকিয়েছে জানে না, তবে আন্দাজ করতে পারছে জঞ্জালের ভেতরেই কোথাও রয়েছে। চেঁচিয়ে বললো, 'নিজেদের খুব চালাক ভাবো, না? বারোটা বাজিয়ে ছাড়বো এবার মেকসিকান ছাগলগুলোর। শনিবারে ওদের র‍্যাঞ্চ দখল করবো, দেখি কিভাবে ঠেকাও।'

পরস্পরের দিকে তাকালো ছেলেরা। শুধু কিশোরকে অবাক মনে হলো। মর্টগেজটা যে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে এটা এখনও জানানো হয়নি তাকে।

'শনিবার, বুঝলে শার্লকের বাচ্চারা?' আবার চেঁচালো টেরিয়ার। 'এইবার হেরে গেলে আমার কাছে।' পরক্ষণেই শোনা গেল গা জ্বালানো হাসি।

হাসতে হাসতে চলে গেল টেরিয়ার। তার হাসি মুছে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো চার কিশোর। ইয়ার্ডে কোনো শব্দ নেই। শুধু মাথার ওপরে ট্রেলারের ছাতে বৃষ্টির ঝমঝমানি ছাড়া।

অবশেষে কিশোর বললো, 'আমাদের ধোঁকা দিতে চেয়েছে…'

'না,' পিনটু বললো। 'ঠিকই বলেছে ও।'

মিস্টার ডয়েলের কাছে মর্টগেজ বিক্রি করা হয়েছে, একথা কিশোরকে জানালো সে

'শনিবারে আমাদের পয়লা পেমেন্ট দেয়া হবে,' একমুহূর্ত চুপ থেকে আবার বললো পিনটু।

'জিতেই গেলেন মিস্টার ডয়েল,' আনমনে বিড়বিড় করলো কিশোর।

'হার মানবো!' রবিন অবাক।

কিশোর পাশা হেরে যাবে, মুসাও বিশ্বাস করতে পারছে না। 'কিশোর, তুমি···তুমি একথা বলছো!'

ক্ষণিকের জন্যে হাসি ঝিলিক দিলো কিশোরের চোখের তারায়। 'দুটো শব্দ বাদ দিয়েছি। বলতে চেয়েছি "মনে হয়" জিতে গেলেন। একটা সুবিধে হয়েছে এতে। আমাদের থামাতে আসবে না এখন আর কেউ। সময় যেটুকু পেলাম, তার পুরো সদ্ব্যবহার করতে হবে। তবে খুব বেশি সময় নেই আমাদের হাতে।'

'সময়ও নেই, সূত্রও নেই,' নাক কুঁচকে বললো মুসা।

'অনেক আছে,' কিশোর বললো। 'ঠিকমতো এতোদিন কাজে লাগাতে পারিনি ওগুলো। আরও একটা জিনিস পেয়েছি।' পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলো সে। রবিনের আন্দাজ ঠিক। গুহায়ই লুকিয়েছিলেন ডন পিউটো।'

'লুকিয়েছিলেন? তাহলে পরে কি হলো তাঁর? বন্ধুরা দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলো?'

'হতে পারে। তবে আমার তা মনে হয় না। ওরকম হলে কোনো না কোনো দলিলে প্রমাণ পাওয়া যেতোই। পালাতে পারেননি তিনি। পর্বতের মধ্যেই কিছু একটা ঘটেছিলো তাঁর। কেউই হয়তো জানে না, কি হয়েছিলো। এবং আমার বিশ্বাস, ওটা জানতে পারলেই রহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারবো।'

'কেউই যদি না জানে, আমরা জানবো কি করে?'

'জেনে নেবো নিজেরাই। কারণ আমি জানি কোথায় লুকানোর পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। চিঠিতেই সেকথা স্পষ্ট বলে দিয়েছেনঃ কনডর ক্যাসল। ওই পাহাড়ের কাছেই রয়েছে রহস্যের জবাব। তোমরা খুঁজতে গিয়েছিলে বটে, তবে নিশ্চয় কিছু একটা মিস করেছিলে, বুঝতে পারোনি। কাল ইস্কুল ছুটির পর আবার যাবো আমরা কনডর ক্যাসলে।'

পনেরো

বৃহস্পতিবার ইস্কুল ছুটি হলো। বৃষ্টি কিছুটা কমে এসেছে। সূত্র খুঁজতে রওনা হলো গোয়েন্দারা।

বৃষ্টিতে ভিজে কাহিল হয়ে আছে রাস্তার অবস্থা। সাইকেল চালানোই মুশকিল। কাঁচা রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে ছাউনি রয়েছে, হঠাৎ বৃষ্টি এলে বা অন্য কোনো অসুবিধেয় পড়লে পথচারীদের মাথা গোঁজার জন্যে। ওরকম একটা ছাউনিতে সাইকেল রেখে পায়ে হেঁটে এগোলো ওরা। সাথে করে ব্যাগ নিয়ে এসেছে রবিন। তাতে কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আর টর্চ আছে। ব্যাগটা সাইকেলের ক্যারিয়ার থেকে খুলে বেল্টে ঝুলিয়ে নিলো। বাঁধের দিকে পথ ধরলো ওরা, ওদিক দিয়েই যাবে কনডর ক্যাসলে।

'আরিব্বাবা, কতো পানি!' চলতে চলতে বললো মুসা। 'আরও বৃষ্টি হলে আর হাঁটার দরকার নেই, সাঁতরেই ফিরতে পারবো।'

কনডর ক্যাসলের কাছাকাছি পৌঁছে দেখলো পানিতে টইটম্বুর হয়ে আছে অ্যারোইও। ওটা ঘুরে এসে ঢিবিটার ওপর দিয়ে চড়তে হবে শৈলশিরায়।

ঢিবির নরম গা থেকে অনেক ঝোপঝাড় খসে পড়েছে বৃষ্টিতে ভিজে। পিচ্ছিল। বেশি খাড়া হলে চড়াই যেতো না, ঢালু বলে রক্ষা।

তারপরেও চড়তে অনেক অসুবিধে হলো। যাই হোক, কোনোমতে এসে উঠলো কনডর ক্যাসলের চূড়ায়। ওপর থেকে আজ অন্য দৃশ্য দেখতে পেলো রবিন আর মুসা, সেদিনকার সঙ্গে অনেক পার্থক্য। শুধু সেন্টার গেট দিয়েই বাঁধের পানি উপচে পড়ছে না আজ, পুরো বাঁধটাই যেন ভাসিয়ে নেয়ার মতলব করেছে, ওপর থেকে মনে হচ্ছে একটা বড়সড় জলপ্রপাত। বাঁধের নিচে পাক খেয়ে খেয়ে বয়ে যাচ্ছে পানি, প্রচুর ফেনা, কাউন্টি রোডের পাশের নালা আর খানাখন্দ ভরে দিয়ে বয়ে চলেছে সাগরের দিকে।

কিশোর এই দৃশ্য দেখতে আসেনি। সেদিকে তাকালো বটে, তবে তার মন অন্য চিন্তায় ব্যস্ত। বিড়বিড় করে বললো, 'কোথায় একজন মানুষ দীর্ঘদিন লুকিয়ে থাকতে পারে?'

'এখানে তো নিশ্চয়ই নয়,' বললো মুসা। 'গুহা তো দূরের কথা, একটা ফাটলও নেই।'

'আশেপাশে কোথায় গুহা আছে, পিনটু?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'কি জানি,' মাথা চুলকালো পিনটু। 'আমি বলতে পারবো না। পর্বতের ওদিকে অবশ্য আছে...'

'না, অতোদূরে নয়,' মাথা নেড়ে বললো কিশোর। 'কাছাকাছি।'

'বাঁধের ভেতরটা হয়তো ফাঁপা,' মুসা বললো।

'আরে নাহ্,' মানতে পারলো না রবিন।

'গোপন কোনো খাদ-টাদ থাকতে পারে,' বললো কিশোর। 'যেখানে তাঁবু বা ঝুপড়ি তুলে থাকা যায়। বাইরে থেকে কারো চোখে পড়বে না।'

'ওরকম কিছুই নেই এখানে, কিশোর,' পিনটু বললো। 'এদিকের সমস্ত পাহাড় আমি চিনি।'

'শ্রমিকদের বাড়িঘরের কি অবস্থা?' রবিন জিজ্ঞেস করলো। 'নিশ্চয় অনেক কাজের মানুষ ছিলো ডন পিউটোর?'

'ছিলো। কিন্তু সব কাউন্টি রোডের ধারে, ভালো জায়গায়। একটাও এখন নেই।'

'পিনটু,' জিজ্ঞাসু চোখে পিনটুর দিকে তাকালো মুসা, 'কাঁচা রাস্তাটা এক জায়গায় দু'ভাগ হয়ে গেছে দেখেছি। একটা তো এসেছে বাঁধের দিকে, আরেকটা কোথায় গেছে?'

'পর্বতের ভেতর দিয়ে ঢুকে আবার বেরিয়ে গিয়ে উঠেছে কাউন্টি রোডে, সিনর হেরিয়ানোর এলাকায়।'

অ্যারোইওর ওপাশে দূরে একটা পথ দেখিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো মুসা, 'ওই পথটার সাথে কোনো যোগাযোগ আছে ওটার?'

'পথ?' ভুরু কুঁচকে চোখ ছোট ছোট করে তাকালো কিশোর, মুসা যা দেখেছে দেখার জন্যে।

'হ্যাঁ,' হাত তুললো পিনটু, 'ওই ওটার কথা বলছো তো? আছে। কাঁচা রাস্তা থেকে বেরিয়ে পাহাড় ঘুরে গেছে।'

সবাই দেখেছে পথটা এখন। খুব সরু একটা পায়েচলা পথ, চ্যাপারালের ঝোপের ভেতর দিয়ে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে হারিয়ে গেছে পাহাড়ের গোড়ায় ওকের জঙ্গলে।

'ছাউনি!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো পিনটু। 'ভুলেই গিয়েছিলাম! পুরানো একটা ঝুপড়ি আছে। অনেক আগে এক বুড়ো বানিয়েছিলো, থাকতো ওখানে। তক্তা আর টিন দিয়ে। অনেক দিন যাই না।'

'ডন পিউটোর আমলে ছিলো ওটা?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

'ছিলো। ভাইয়ার মুখে শুনেছি, আগে নাকি ওখানটায় একটা অ্যাডাব রুম ছিলো।'

'লুকানো, অব্যবহৃত, আর যাওয়ার পথটা শুধু কনডর ক্যাসল থেকেই দেখা যায়!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে গোয়েন্দাপ্রধান। বোধহয় ওটাই জায়গা!'

তাড়াহুড়ো করে আবার নামতে শুরু করলো ওরা। ঢিবির ঢালে পিছলে পড়া

ঠেকাতে পারলো না একজনও, কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল জুতো, প্যান্টে লেগে গেল কাদা। বাঁধ পার হয়ে যেতে হবে। উপচে পড়া পানির দিকে শঙ্কিত চোখে তাকালো কিশোর। 'ভেঙে-টেঙে পড়বে না তো পানির চাপে?'

'সব সময়ই ওরকম পানি হয়,' পিনটু জানালো। 'পড়ে তো না। টিকে আছে শত শত বছর ধরে।'

'তাহলে চলো,' মুসাও ভয় পাচ্ছে এতো পানি দেখে।

নিরাপদেই এসে পায়েচলা সরু পথটায় উঠলো ওরা। পথের দুই পাশে চ্যাপারাল জন্মেছে ঘন হয়ে, মাঝে মাঝে খাটো ওক। এদিকটায় মানুষজন আসে না, কোনো কাজও হয় না, ফলে ইচ্ছেমতো বাড়তে পেরেছে ঝোপঝাড়। একটা পাথুরে পাহাড়ের কাঁধ পেরিয়ে পথটা গিয়ে ঢুকেছে দুটো মাঝারি আকারের পাহাড়ের মধ্যে, গিরিপথ হয়ে গেছে। মেঘলা এই ধূসর দিনে পথটা ছায়াঢাকা, প্রায় অন্ধকারই বলা চলে।

'ওই যে,' হাত তুলে দেখালো পিনটু।

অনেক গাছপালা আর উঁচু উঁচু ঝোপের মধ্যে, পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে থাকা একটা বড় পাথরের নিচে আড়াল হয়ে আছে ঝুপড়িটা। ওটা যে আছে একথা জানা না থাকলে সহজে কারো চোখে পড়বে না। একচালা টিনের ছাউনি। মরচে পড়ে লাল হয়ে গেছে চালা। কাঠের বেড়া, তক্তার মাঝে বড় বড় ফাঁক। দরজায় ঠেলা দিলো পিনটু। খুলে মাটিতে পড়ে ধুলো ওড়ালো কপাটটা। ওপরের চ্যাপ্টা পাথরটার জন্যে বৃষ্টি পড়ে চালার ওপর। ভেতরটা খটখটে শুকনো।

একটা মাত্র ঘর, কাঁচা মেঝে। গাছের খুঁটি ভর রেখেছে চালার। বিদ্যুৎ নেই, জানালা নেই, কোনো আসবাব নেই, শুধু এককোণে পড়ে রয়েছে মরচে পড়া একটা স্টোভ, একসময় ঘর গরম করার কাজে ব্যবহার হতো।

'দু'তিনটে বছর লুকিয়ে থাকা যাবে এখানে সহজেই,' মুসা মন্তব্য করলো। 'তবে আমি দুই দিন থাকতেও রাজি না।'

'খুন করার জন্যে যদি সৈন্যরা তেড়ে আসতো, সেকেণ্ড,' কিশোর বললো, 'আর তোমার সাথে থাকতো একটা দামী তলোয়ার, তাহলে তুমিও থাকতে পারতে। তবে জায়গাটা বাজে।'

'একেবারেই বাজে,' বললো রবিন। 'আর কোনো জায়গাই তো নেই তলোয়ার লুকানোর।'

'হ্যাঁ,' একমত হয়ে মাথা দোলালো পিনটু।

'মেঝেতে?' মাটির দিকে আঙুল তুললো মুসা। 'পুঁতে রাখেননি তো ডন?'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'না। পুঁতলে মাটি খোঁড়ার আলামত বোঝা যেতোই তখন. সৈন্যদের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। ওই ঝুঁকি নিশ্চয় নেননি ডন...'

পুরানো স্টোভটার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলো সে। একটা চ্যাপ্টা পাথরের ওপর রয়েছে ওটার পায়াগুলো, পাইপটা চালা ভেদ করে উঠে গেছে। 'স্টোভটা সরানো যায় না?'

'চেষ্টা করে দেখা যাক,' মুসা বললো।

জোরে ঠেলা দিয়ে দেখলো সে। ভারি জিনিস, তবে নড়লো। নিচের পাথরের সাথে লাগানো নয় পায়াগুলো।

'পাইপটা খুলতে পারো নাকি দেখো তো,' কিশোর বললো।

চেষ্টা করে দেখলো মুসা। 'খাইছে! মরচে। নড়েও না।'

'নড়বে কি করে? আঠারোশো ছেচল্লিশ থেকেই আছে হয়তো ওই অবস্থায়। পারলে ভেঙে ফেলো।'

রবিনের ব্যাগে যন্ত্রপাতি রয়েছে। ওগুলোর সাহায্যে গোড়া থেকে পাইপটা ভেঙে ফেললো মুসা। তারপর চারজনে মিলে পাথরের ওপর থেকে ভারি স্টোভটা সরিয়ে আনলো ওরা। হাঁটু গেড়ে বসে পাথরটা সরানোর চেষ্টা করলো মুসা।

কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলি করে জোরে 'হাউফ' করে উঠে বললো, 'বেজায় ভারি। একলা পারছি না।'

দেয়াল থেকে একটা তক্তা খুলে নেয়া হলো। বেশ শক্ত কাঠ। পাথরের নিচে ছোট একটা গর্ত করলো মুসা। সেটাতে ঢুকিয়ে দিলো কাঠের এক মাথা। ওটাকে লিভার হিসেবে ব্যবহার করে, আর অন্য তিনজনের সহায়তায় অবশেষে নড়াতে পারলো জগদ্দল পাথরটাকে। বেরিয়ে পড়লো একটা গর্ত। গর্তের ভেতরে উঁকি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো পিনটু, 'কি যেন দেখা যাচ্ছে!'

ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে টেনে বের করে আনলো একটুকরো দড়ি, একটা কাগজ—বয়েসের ভারে হলুদ, আর গোল করে পাকানো একটুকরো ক্যানভাস—বাইরের দিকটায় আলকাতরা মাখানো।

কাগজটার দিকে তাকিয়ে পিনটু বললো, 'স্প্যানিশে লেখা। এই, আমেরিকান আর্মির একটা ঘোষণাপত্র এটা, তারিখ আঠারোশো ছেচল্লিশের নয় সেপ্টেম্বর। কিছু একটা আইন জারি করা হয়েছিলো।'

'ক্যানভাসটার ভেতর কি?' হাত বাড়িয়ে ওটা নিলো কিশোর। 'সাইজ তো তলোয়ারের সমানই। ভেতরে আছে নাকি?' মোড়কটা খুলে ফেললো সে।

'দূর, কিছু তো নেই।' বড়ই নিরাশ হলো মুসা।

'পিনটু, গর্তে আর কিছু আছে?'

রবিন এগিয়ে গেল টর্চ হাতে। গর্তের ভেতর ফেললো। পিনটু হাত ঢুকিয়ে হাতড়ে হাতড়ে দেখতে লাগলো। 'না, নেই...না না, আছে! ছোট পাথরের মতো...'

পাথরটা বের করে আনলো সে। সাধারণ পাথরের মতোই দেখতে। তবে মাটি লেগেও ওরকম হয়ে থাকতে পারে ভেবে প্যান্টের কাপড়ে ঘষে পরিষ্কার করতে লাগলো। ঠিকই ভেবেছে। বেরিয়ে পড়লো ঘন সবুজ উজ্জ্বল রং।

'এটা...,' রবিন শুরু করলো, শেষ করলো কিশোর, 'পান্না! নিশ্চয়ই তলোয়ারটা লুকানো ছিলো এখানে! প্রথমে এখানেই লুকিয়েছিলেন ডন। পালিয়ে আসার পর সরিয়ে ফেলেছিলেন অন্য জায়গায়। নিশ্চয় তাঁর তখন মনে হয়েছিলো এটা নিরাপদ জায়গা নয়।'

'ঠিকই ভেবেছেন,' রবিন বললো। 'সহজেই তো বের করে ফেললাম আমরা।'

'তাহলে নিজেও এখানে লুকাননি,' পিনটু বললো, 'এটাও ঠিক।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো কিশোর। 'পেছনে তাড়া করে আসছিলো ডগলাসেরা। সময় বিশেষ পাননি। তলোয়ারটা বের করে নিয়ে গিয়েই তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলেছিলেন কোথাও, নিজেও লুকিয়ে পড়েছিলেন।'

'এই কিশোর,' হঠাৎ বলে উঠলো মুসা, 'কিসের আওয়াজ?'

কান পাতলো সবাই। বাইরে থেকে আসছে, বেশ জোরালো, ভূমিধস নামার সময় যেমন হয়, অনেকটা ওরকম।

'বৃষ্টি,' রবিন বললো। 'সব জায়গায় পড়ছে, শুধু ঝুপড়িটার ওপর ছাড়া। বেশ মজা তো।'

'না, বৃষ্টি না, অন্য শব্দ,' মুসা বললো আবার। 'শুনছো?'

মাথা নাড়লো কিশোর। রবিনও শুনতে পায়নি। তবে পিনটু শুনলো। 'কথা!' ফিসফিস করে বললো সে।

ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ঘন ঝোপে লুকিয়ে পড়লো ওরা। একটু পরেই দেখলো গিরিপথ ধরে আসছে সেই তিনজন কাউবয়। ভারি বৃষ্টির মধ্যেও হালকা ভাবে ভেসে আসছে ওদের কথা।

'এদিকেই আসতে দেখেছি, গুডু। চারজনকেই।'

'এগোও।'

ঝুপড়িটার পাশ দিয়ে চলে গেল লোকগুলো, দেখতে পেলো না ওটা। অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়ের আড়ালে।

উঠে দাঁড়ালো কিশোর। 'চলো ভাগি। এসে পড়ার আগেই। আবার কনডর ক্যাসলে যাবো।'

লোকগুলো যে ঘাপটি মেরেছিলো, বুঝতে পারেনি ছেলেরা। ওরা বেরোতেই পেছনে চিৎকার করে উঠলো গুডু, 'ধরো! ধরো!'

খিচে দৌড় মারার কথা বলে দিতে হলো না চারজনের একজনকেও।

ষোলো

কাদায় ভরা কাঁচা রাস্তায় পৌঁছার আগে থামলো না ছেলেরা। হাঁপাতে হাঁপাতে তাকালো ডানে-বাঁয়ে। বুঝতে পারছে না এখন কোনদিকে যাওয়া দরকার।

'এটা দিয়ে গেলে,' মুসা বললো, 'কাউন্টি রোডে যাওয়ার আগেই ধরে ফেলবে।'

'পাহাড়ে উঠতে গেলেও দেখে ফেলবে,' বললো রবিন।

'বাঁধের ওপর দিয়েও আর যাওয়া যাবে না এখন,' পিনটু বললো। 'পানির যা তোড়। ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।'

প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজছে ওরা। কি করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

বেরিয়ে এলো তিন কাউবয়। ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে এলো ছেলেদের ধরার জন্যে। সঙ্গীদেরকে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে গুডু।

'রাস্তার দিকে যাই!' মুসা বললো।

জোরে মাথা নাড়লো কিশোর, না না, অ্যারোইও! শেষ মাথায় চলে যাবো, বাঁধের কাছাকাছি। আমরা ওদিকে গেছি এটা ভাববে না ওরা।'

একটা মুহূর্ত সময় নষ্ট করলো না ছেলেরা, হুড়মুড় করে এসে নামলো অ্যারোইওতে। নিচে নামতে পারলো না, ওখানে পানি, কিনার ধরে চললো। পিচ্ছিল হয়ে আছে ঢালের মাটি, তার ওপর ঝোপঝাড়, দৌড়াতে পারলো না। তবে ঝোপ থাকায় গাছ ধরে ধরে মোটামুটি দ্রুতই এগোতে পারলো।

ওপরে রাস্তার কাদায় ভারি বুটের ছপাৎ ছপাৎ শব্দ হচ্ছে। মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়লো ছেলেরা, পিছলে যাতে পানিতে না গিয়ে পড়ে সে-জন্যে গাছ আঁকড়ে ধরে রেখেছে। দুরুদুরু করছে বুক। ঠিক মাথার ওপরেই শোনা গেল কর্কশ কণ্ঠ, 'গেল কোথায় বদমাশগুলো!'

'এক্কেবারে ইবলিসের বাচ্চা!'

'চাবিটা সত্যিই পেয়েছে?'

'পেয়েছে। নইলে আমাদের দেখলেই পালায় কেন?'

'বাঁধের দিকে যায়নি তো?'

'গাধা নাকি? মরতে যাবে?'

'পাহাড়েও চড়েনি। তারমানে রাস্তা দিয়েই গেছে। এসো।'

কাউন্টি রোডের দিকে ছুটলো তিন কাউবয়। চুপ করে পড়ে রইলো ছেলেরা। চ্যাপারালের ঝোপ আড়াল করে রেখেছে তাদের শরীর।

ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। উঠে বসে মাথা ঝাড়া দিলো রবিন। 'গেছে। বাঁচা গেল।'

'এখানে লুকিয়ে থাকা যাবে না,' পিনটু বললো। 'ওঠো।'

'যাবোটা কোথায়?' মুসার প্রশ্ন। 'আপাতত বাঁচলাম। রাস্তায় না পেয়ে আবার ফিরে আসবে ওরা। তখন?'

'বাঁধের কাছে লুকানোর একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে,' কিশোর বললো। 'আর তেমন জায়গা না পেলে ঢিবি পেরিয়ে চলে যাবো। কনডর ক্যাসলের ওধারে লুকানোর জায়গা পাওয়া যাবেই।'

মাথা নিচু করে, রাস্তা থেকে যাতে দেখা না যায় এমনভাবে আবার ঢিবির দিকে এগোলো ওরা। বাঁধের ওপর থেকে পানি পড়ার শব্দ কানে আসছে বৃষ্টির আওয়াজকে ছাপিয়ে।

'দেখ,' কিশোর বললো, 'ঝোলা পাথর-টাথর আছে কিনা। কিংবা কোনো গর্ত।'

ঢালের গায়ে গাছ আঁকড়ে দাঁড়িয়ে চোখ বোলালো চারজনেই।

মুসা মাথা নাড়লো, 'নাহ্, একটা ইঁদুরের গর্তও নেই।'

'রাস্তার ওপারে পাথর আছে, ওগুলোর আড়ালে লুকানো যেতে পারে,' বলে মাথা তুলে দেখতে গেল পিনটু। পরক্ষণেই ঝট করে নামিয়ে ফেললো। 'ওরা আসছে!'

আবার মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো ওরা।

'দেখেনি তো তোমাকে?' রবিনের কণ্ঠে শঙ্কা।

'মনে হয় না।'

'কোনখানে আছে?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

'আমরা যেখানে অ্যারোইওতে নেমেছি।'

'ঝুপড়িতে ফিরে যাচ্ছে বোধহয় আবার,' আশা করলো মুসা।

'না,' অতোটা আশা করতে পারলো না কিশোর, 'ওরা এদিকেই আসবে। বাঁধের কাছে খুঁজতে। এখানেই থাকতে হবে আমাদের। দেখে ফেললে ফেলবে, আর কিছু করার নেই।'

ঝোপ আর মাটির সঙ্গে যতোটা সম্ভব গা মিশিয়ে পড়ে রইলো ওরা। বুটের শব্দ কানে আসছে। অবশেষে শোনা গেল কথা, '...বাঁধের কাছে না পেলে এখানে এসে ঝোপের মধ্যে খুঁজবো।'

'থাকা যাবে না এখানেও!' ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। 'ওরা সরলেই ঢিবি বেয়ে উঠতে শুরু করবো, যতোটা ওপরে ওঠা যায়। যেই ওরা এদিকে সরে আসবে ওদিকে চলে যাবো আমরা।'

'কিন্তু চূড়ায় উঠলেই তো দেখে ফেলবে আমাদের,' মুসা বললো।

'ঝুঁকি নিতেই হবে। বেশিক্ষণ থাকছি না আমরা খোলা জায়গায়, মাত্র কয়েক সেকেণ্ড।'

কিশোরের পরামর্শটা পছন্দ হলো না মুসার, কিন্তু এর চেয়ে ভালো কিছু আর বের করতে পারলো না। ভাবনারও সময় নেই। ওদের মাথার ওপর দিয়ে কাউবয়দের চলে যাওয়ার শব্দ হলো। আস্তে করে মাথা তুলে দেখলো কিশোর। টিবির আড়ালে চলে যাচ্ছে তিনজন লোক। 'চলো,' বললো সে।

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে অ্যারোইওর বাকি পথটুকু পেরিয়ে এলো ওরা, টিবির ঢাল বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলো। ঝোপের কমতি নেই, সেগুলোর গোড়া কিংবা শেকড় ধরে ধরে বেয়ে উঠছে, খাড়া ঢালে পর্বতারোহীরা যেমন করে ওঠে। দাঁড়ানো তো দূরের কথা, ঠিকমতো মাথা তোলারই সাহস করতে পারছে না। যদি চোখে পড়ে যায়! প্রতি মুহূর্তে আশা করছে এই বুঝি চেঁচিয়ে উঠলো কেউ। কিন্তু না, শোনা গেল না।

'যাক তাহলে উঠলাম!' অবশেষে বললো মুসা।

'সোজা শিরাটার দিকে!' তাগাদা দিলো কিশোর। 'যতো তাড়াতাড়ি পারো!'

তাড়াতাড়ি কি আর হয়? সব পিচ্ছিল হয়ে আছে। মাথা নামিয়ে শরীরটাকে যথাসম্ভব কুঁজো করে চলতে লাগলো ওরা। দুইবার কিশোর আর রবিন পা পিছলালো। আরেকবার পিনটু। পড়েই যাচ্ছিলো নিচে, অনেক কষ্টে সামলালো গাছের বেরিয়ে থাকা শেকড় চেপে ধরে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে এলো আবার আগের জায়গায়। কেবল মুসা পড়লো না। অন্য তিনজনকে সাহায্য করলো বরং। সারা শরীর কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে ওদের। তবে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারলো শৈলশিরার প্রায় খাড়া পাথুরে ঢালের কাছে।

থামলো না। উঠতে শুরু করলো কনডর ক্যাসলের চূড়ায়। নাড়া লেগে ঝুরঝুর করে ঝড়ে পড়তে লাগলো আলগা ছোট পাথর।

জলপ্রপাতের গর্জনকে ছাপিয়ে হঠাৎ শোনা গেল উত্তেজিত চিৎকার, 'ওই যে! ওখানে!'

'চূড়ার ওপরে!'

'ওরাই! ধরো, ধরো!'

ঢালের ওপরে স্থির হয়ে গেল ছেলেরা। ফিরে তাকালো। রাস্তা থেকে সরে বাঁধের ধারে চলে এসেছে তিন কাউবয়।

'দেখেই ফেললো!' কান্নার মতো স্বর বেরোলো পিনটুর।

'এত্তো তাড়াতাড়ি!' কোলাব্যাঙ ঢুকেছে যেন মুসার গলায়।

টিবির পাশ ঘুরে ততোক্ষণে শৈলশিরার দিকে ছুটতে শুরু করেছে তিন কাউবয়।

'কিশোর, এখন কি করা?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলো রবিন।

তোতলাতে লাগলো কিশোর, 'কি—ক্কি...'

অঝোর বৃষ্টি আর প্রপাতের শব্দকে ছাপিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ যেন ভরে দিতে লাগলো বাতাসকে। ক্রমেই বাড়ছে, জোরালো হচ্ছে। বাঁধের ওপরে কোনোখান থেকে আসছে। টিবির ওপরে অর্ধেকটা উঠে পড়ছিলো কাউবয়রা, শব্দটা শুনে থমকে গেছে ওরাও। কান পেতে শুনছে।

'আরি, দেখো!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

বাঁধের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়া পানির উচ্চতা যেন হঠাৎ করে বেড়ে গেল দশ ফুট। তাতে ভাসছে কাঠ, ওপড়ানো ঝোপঝাড়। এমনকি আস্ত গাছও রয়েছে। প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঁধের নিচে। জলপ্রপাতের গর্জন একলাফে যেন বেড়ে গেল একশো গুণ। ছেলেদের পায়ের নিচে থরথর করে কেঁপে উঠলো পাহাড়টা।

থেমে গিয়েছিলো, আবার টিবি বেয়ে ছেলেদের দিকে উঠে আসতে লাগলো তিন কাউবয়। ছেলেরাও থেমে রইলো না আর, চূড়ায় উঠতে শুরু করলো আবার। কি মনে করে একবার পেছনে ফিরে তাকিয়েই অস্ফুট শব্দ করে উঠলো পিনটু। অন্য তিনজনেও ফিরে তাকালো। দু'ভাগ হয়ে গেছে টিবিটা। একটা অংশ দাঁড়িয়ে আছে, খসে পড়ছে আরেকটা অংশ। চেঁচামেচি, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করে দিলো তিন কাউবয়। কিন্তু কিছুই করতে পারলো না। ওদেরকে নিয়েই পানিতে ভেঙে পড়লো মাটির বিশাল চাঙড়। জলপ্রপাতের মধ্যে পড়ে খাবি খেতে লাগলো কাউবয়েরা, সাঁতরে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। একজন একটা ভেসে যাওয়া গাছের গুঁড়ি চেপে ধরলো। পানি ওদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

'গেল ব্যাটারা!' হঠাৎ বড় বেশি ক্লান্তি লাগলো রবিনের। অবশ হয়ে গেছে যেন হাত-পা।

'বেশিক্ষণের জন্যে না,' রবিনের মানসিক শান্তি আবার নষ্ট করলো কিশোর। 'বাঁধের নিচে পড়েনি ওরা, পড়েছে অ্যারোইওর ভেতরে। ভেসে চলে যাবে শেষ মাথায়। স্রোতের জোর কম ওখানে। সাঁতরে পাড়ে উঠে আবার ধরতে আসবে আমাদের।'

আগে আগে উঠছে এখন মুসা। কনডর ক্যাসলের চূড়ায় উঠে নিচে তাকালো সবাই। ঢাল থেকে খসে পড়ছে মাটি আর পাথর। বেরিয়ে পড়ছে নতুন নতুন পাথর, শেকড়। মাটি খসে গিয়ে যেন ক্ষত সৃষ্টি করছে পাহাড়ের গায়ে।

'যেভাবে মাটি ভাঙছে, পাহাড়টাই না ধসে পড়ে!' উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে নামার সময় বললো মুসা। এবারেও আগে আগে চলেছে সে।

বেরিয়ে থাকা কয়েকটা পাথরের ওপাশে চলে গেল মুসা।

অন্য তিনজনও এলো পেছনে পেছনে।

কিন্তু মুসা নেই। গেল কোথায়?

সতেরো

বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন মুসা।

'কোথায় গেল?' এদিক ওদিক তাকাচ্ছে পিনটু, চোখে অবিশ্বাস।

'মুসাআ!' চিৎকার করে ডাকলো রবিন।

'মুসা, কোথায় তুমি?' ডেকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

ঢালে যতদূর চোখ যায়, চোখ বোলালো ওরা। মুসার চিহ্নও নেই। সাড়াও দিলো না। কান পেতে রয়েছে তিনজনে। তারপরে শোনা গেল আওয়াজটা। কোথা থেকে আসছে বোঝা গেল না।

'আমি এখানে! নিচে!' আবার শোনা গেল কথা। পাহাড়ের গভীর থেকে যেন ভেসে এলো মুসার চাপা কণ্ঠ।

'কোথায় তুমি?' জিজ্ঞেস করলো পিনটু। 'বুঝতে পারছি না!'

'এই যে এখানে। কয়েকটা বড় বড় পাথর আছে না, যেগুলো পেরিয়ে এসেছি, ওগুলোর গোড়ায়!'

আরেকটু পাশে সরলো তিনজনে। চোখে পড়লো গর্তটা। আগের বার যখন এখানে এসেছিলো, তখন ছিলো না।

'মাটি খসে যাওয়ায় বেরিয়েছে!' রবিন বললো।

গর্তের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'মুসা, বেরোতে পারছো না? সাহায্য লাগবে?'

'বেরোতে চাই না,' জবাব এলো। 'এটা একটা গুহা। ভেতরে অনেক পাথর আছে। ইচ্ছে করলে গর্তের মুখ ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়া যাবে। কাউবয়েরা দেখতে পাবে না। জলদি নেমে এসো।'

পরস্পরের দিকে তাকালো তিন কিশোর।

'বেশ, আসছি,' জবাব দিলো কিশোর।

'তাড়াতাড়ি করো, নইলে ওরা চলে আসবে। অসুবিধে নেই, ভালো জায়গা। শুকনো, খোলামেলা।'

একে একে ঢুকে পড়লো তিনজনে। টর্চ বের করলো রবিন।

'জানতামই না এখানে গুহা আছে!' পিনটুর কণ্ঠে বিস্ময়।

টর্চের আলোয় দেখা গেল, বেশি বড় না গুহাটা। গাড়ি রাখার গ্যারেজের সমান।

নিচু ছাত। মেঝেতে ছড়িয়ে আছে অনেক পাথর। এখনও শুকনো রয়েছে ভেতরটা। তার মানে মুখটা যে খুলেছে বেশিক্ষণ হয়নি। নইলে যে হারে বৃষ্টি হচ্ছে এতোটা শুকনো থাকার কথা নয়।

'আলোটা আরও ঘোরাও তো,' কিশোর বললো।

দশ বাই পনেরো ফুট হবে গুহাটা। একপাশে পাথর জমে উঁচু হয়ে গিয়ে ছাতে ঠেকেছে। গুহামুখের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো কিশোর, 'বহুদিন বন্ধ হয়ে ছিলো মুখটা। হয়তো ভূমিকম্পে পাথর গড়িয়ে পড়ে…'

'যেভাবেই হয়েছে, হয়েছে,' বাধা দিয়ে বললো মুসা, 'সেকথা পরেও ভাবা যাবে। এখন মুখটা বন্ধ করে দেয়া দরকার। নইলে কাউবয় ব্যাটারা এসে দেখে ফেলবে।'

পাথরের অভাব নেই। চারজনে মিলে গড়িয়ে গড়িয়ে পাথর নিয়ে গিয়ে রাখতে লাগলো মুখের কাছে। দ্রুত বন্ধ করে দিলো গুহামুখ দিয়ে আসা বিকেলের ধূসর আলো। মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টিও আর ভেতরে আসতে পারছে না। দেয়ালে আরাম করে হেলান দিয়ে বসলো ওরা, হাসি ফুটেছে মুখে।

'কয়েক ঘণ্টা থাকতে হবে আমাদের।' অনুমান করলো কিশোর, 'আমাদের খুঁজে পাবে না লোকগুলো। চলে যাবে। তার পর বেরোবো।'

'কারা ওরা?' রবিনের প্রশ্ন।

'ডয়েলের লোক, আর কে হবে?' বললো পিনটু। 'নইলে ভাইয়ার হ্যাটই বা চুরি করবে কেন, আর ক্যাম্পফায়ারের পাশেই বা ফেলে রাখবে কেন?'

'গাড়ির চাবি খুঁজছে ওরা,' কিশোর বললো। 'ভাবছি, গাড়িটা কোথায়? ওদেরকে তো একবারও গাড়িতে দেখা যায়নি।'

'গাড়ি যেখানেই থাকুক,' মুসা বললো, 'চাবিটা ওদের ভীষণ দরকার। হয়তো ওদেরকে ফাঁসিয়ে দিতে ওই চাবিই যথেষ্ট, সে-জন্যেই ওরকম হন্যে হয়ে খুঁজছে।'

'হতে পারে…'

'কি-কি-কিশোর…!'

রবিনের তোতলামিতে থেমে গেল কিশোর। তাকালো টর্চের আলোর দিকে। গুহার পেছন দিকে ধরে রেখেছে রবিন।

'ওই… ওই পাথরটার…'

'চোখ!' ঢোক গিললো পিনটু। 'দাঁতও আছে!'

'খাইছে!' কেঁপে উঠলো মুসার কণ্ঠ। 'খুলি!'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হলো মুখ। উঠে এগিয়ে গেল সেদিকে।

'খুলিই!' ওখান থেকে বললো সে। 'এই এসো, মাটি খুঁড়তে হবে।'

'হাড়গোড় আছে!' অস্বস্তিতে ভরা মুসার কণ্ঠ। 'ভূমিকম্পে মাটি চাপা পড়ে মরেছিলো হয়তো!'

'এই, কাপড় আছে,' রবিন বললো।

'একটা বোতাম!' তুলে নিলো পিনটু। তামার তৈরি বোতামটায় ময়লা জমে কালো হয়ে গেছে। ঘষে পরিষ্কার করলো সে। 'আরি, আমেরিকান আর্মির!'

'ভূমিকম্পে মরেনি, বুঝলে,' খুলিটা দেখতে দেখতে বললো কিশোর। 'খুন করা হয়েছে একে। এই দেখো, গুলির ফুটো।'

উত্তেজিত গলায় বলতে লাগলো গোয়েন্দাপ্রধান, 'মনে হচ্ছে ঈগলের বাসাটা খুঁজে পেলাম! এখানেই লুকানোর মতলব করেছিলেন ডন পিউটো, তলোয়ারটাও হয়তো এখানেই লুকিয়েছেন। কনডর ক্যাসলের ঠিক নিচে এই গুহা, সূত্রের সঙ্গে মিলে যায়। তাঁর ছেলে স্যানটিনো নিশ্চয় জানতো এই গুহার কথা।'

'কিশোর,' পিনটু বললো, 'এই লোকটা কি সার্জেন্ট ডগলাসের দলের কেউ?'

'বোধহয়। আমার বিশ্বাস, আরও কঙ্কাল আছে এখানে।'

'কয়েকটা পাথর দেখিয়ে মুসা বললো, 'আলগা। ধসে পড়েছে। ওপাশে কিছু আছে নাকি?'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'থাকতে পারে।'

দ্রুত পাথরগুলো সরাতে লাগলো ছেলেরা। কিন্তু যতোই সরায়, কমে না আর। একটা সরালে তিনটে এসে পড়ে। তবে ধৈর্য হারালো না ওরা। সরিয়ে চললো এক এক করে। ফাঁক বাড়তে লাগলো আস্তে আস্তে।

বেরিয়ে পড়লো একটা সরু সুড়ঙ্গ। আলো হাতে আগে আগে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলো রবিন। সোজা এগিয়েছে সুড়ঙ্গটা। কয়েক মিনিট পরে আরেকটা গুহা আবিষ্কার করলো সে, প্রথমটার চেয়ে তিন গুণ বড়।

রবিনের পেছনে ঢুকলো পিনটু। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'অনেক বড়!'

প্রথমটার চেয়ে এটা উঁচুও বেশি, প্রায় দ্বিগুণ।

'একেবারে ক্যাসলের নিচে,' রবিন বললো।

'লুকানোর চমৎকার জায়গা,' বললো মুসা। 'সহজেই ভেতর থেকে পাথর দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেয়া যায়। জানা না থাকলে বাইরে থেকে কেউ কিছু বুঝতেই পারবে না।'

'যতোদিন খুশি থাকা যাবে এখানে,' মন্তব্য করলো পিনটু, 'যদি বাইরে থেকে নিয়মিত খবার দিয়ে যাওয়া হয়।'

'তবে,' কিশোর বললো, 'আমার মনে হয় না সময়মতো মুখটা বন্ধ করতে

পেরেছিলেন ডন।' হাত তুলে বাঁয়ে দেখালো সে।

আলোটা সামান্য সরালো রবিন, ভালোমতো দেখার জন্যে। আরেকটা কঙ্কাল পড়ে আছে। কালচে হয়ে আসা তামার বোতাম পড়ে রয়েছে কয়েকটা, আর পাশেই পড়ে আছে একটা পুরানো মরচে ধরা রাইফেল।

'পাথরের আড়ালে কভার নিয়েছিলো বোঝা যাচ্ছে,' মুসা বললো। 'আরেকজন সৈন্য।'

'ওই, আরও একজন,' কিশোর দেখালো।

উপুড় হয়ে গুহার প্রায় মাঝখানে পড়ে রয়েছে তৃতীয় কঙ্কালটা। ওটার পাশেও তামার বোতাম আছে। আর আছে চামড়ার বুট, বেল্ট আর হোলস্টার। নষ্ট হয়ে এসেছে। কঙ্কালের এক হাতের আঙুলের কাছে পড়ে রয়েছে একটা মেকসিকান ওয়র-স্টাইল রিভলভার।

'নিশ্চয় সার্জেন্ট ডগলাস।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো কিশোর, 'পালানোর পর ওদেরকে যে আর পাওয়া যায়নি, এটাই কারণ।'

'কিন্তু,' চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে পিনটু, 'ডন কোথায়?'

গুহার চারপাশে টর্চের আলো বোলালো রবিন। লুকানোর কোনো জায়গা চোখে পড়লো না, শুধু খাড়া, শূন্য দেয়াল।

'এই তিনজনকে গুলি করে মেরেছে কেউ,' মুসা বললো। 'কে মারলো? ডন পিউটো?'

'বোধহয়,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার কিশোর। 'কিন্তু তাই যদি করবেন, তাহলে তো সহজেই ওদেরকে কবর দিয়ে এখানে থাকতে পারতেন। কেন থাকলেন না?'

'হয়তো তিনি মারেননি,' মুসা বললো। 'মারাটা কঠিনও ছিলো অবশ্য। তিনজন ট্রেইনড সৈন্যের বিরুদ্ধে একা…'

'ডনই মেরেছেন!' বলে উঠলো রবিন। 'ওই দেখো!'

কোণের দিকে অন্ধকার মতো একটা জায়গায় আলো ফেলেছে রবিন। ছোট একটা গর্ত রয়েছে ওখানে দেয়ালের গোড়ায়। ভালো করে না তাকালে চোখে পড়ে না ওটা। লুকিয়ে থাকার চমৎকার জায়গা। ওখানেই দেখা গেল চতুর্থ কঙ্কালটা। এগিয়ে গেল ছেলেরা। কঙ্কালের পোশাক সৈন্যদের চেয়ে আলাদা। পাশে পড়ে আছে একটা মেকসিকান হ্যাট, ইনডিয়ান ডিজাইন। আর আছে দুটো মরচে পড়া রাইফেল।

হ্যাটটা তুলে নিলো পিনটু। 'স্থানীয় ইনডিয়ানদের তৈরি। একে বলে কনচো। এজন্যেই…বুঝলে, এজন্যেই ডন পিউটোকে কোনোদিন কেউ দেখেনি…' ধরে এলো তার গলা।

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'পালিয়ে এসে কনডর ক্যাসলের এই গুহায় লুকানোর মতলব করেছিলেন ডন। পিছু নিয়েছিলো ডগলাস আর তার দুই করপোরাল। এখানে এসে ঢুকেছিলো। ওদেরকে গুলি করে মেরেছেন ডন। তবে তিনিও রেহাই পাননি ওদের গুলি থেকে। তার পর ভূমিকম্প হয়েছিলো, বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো গুহামুখ, ওদেরকে আর কেউ খুঁজে পায়নি। একেবারে গায়েব হয়ে গিয়েছিলো চার চারজন মানুষ।'

'কিন্তু কিশোর,' রবিন প্রশ্ন তুললো, 'তাঁর বন্ধুরা এখানে খুঁজতে এলো না কেন? ওরা নিশ্চয় জানতো ঈগল তার বাসা খুঁজে পেয়েছে।'

'এই প্রশ্নের জবাব আমরা কোনোদিনই জানতে পারবো না। হয়তো তাঁর বন্ধুরা জানতোই না যে তিনি এসেছেন, জানানোর সময়ই হয়তো পাননি। কিংবা ওরা আসার আগেই ভূমিকম্পে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো গুহামুখ। স্যানটিনো যুদ্ধ শেষে বাড়ি ফিরে হয়তো এমন কাউকে পায়নি, যে তাকে জানাতে পারে ডগলাসের রিপোর্ট ঠিক নয়। তলোয়ারটা সাগরে পড়ে গেছে একথা নিশ্চয় বিশ্বাস করেনি সে, ভেবেছিলো, চুরি হয়ে গেছে।'

'কিশোওর!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'করটেজ সোর্ডটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম আমরা! এখানেই হয়তো আছে!'

গুহাটায় তন্ন তন্ন করে খুঁজলো ওরা।

কিন্তু পাওয়া গেল না তলোয়ার।

আঠারো

'পেছনে লোক লেগে ছিলো,' কিশোর বললো, 'এটা জানতেন ডন। এখানে আনেননি হয়তো সে-জন্যেই।'

'তাহলে কোথায় লুকালেন?' রবিনের প্রশ্ন।

পিনটু বললো, 'ডন চিঠিতে কনডর ক্যাসলের কথা লিখেছিলেন। যাতে তাঁর ছেলে এসে তলোয়ারটা খোঁজে এখানে। ঠিক?'

'ঠিক,' বললো কিশোর। 'তিনি হয়তো আশা করেছিলেন, ছেলে ফিরে আসা পর্যন্ত এখানেই লুকিয়ে থাকতে পারবেন।'

'কিন্তু পারলেন না। গুলি খেয়ে মরলেন। এমনও হতে পারে, গুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মারা যাননি। তাহলে তলোয়ারটা এমন কোথাও রেখে যাবেন, যাতে স্যানটিনো খুঁজে পায়...'

'এবং তাহলে একটা মেসেজ রেখে যাবেন ছেলের জন্যে!' বাক্যটা শেষ করে

দিলো কিশোর। 'ঠিক বলেছো! এতোদিন পর এখন মেসেজটা নষ্ট না হয়ে গেলেই হয়!'

'কিন্তু আছে কোথায় মেসেজটা?' ইতিমধ্যেই খুঁজতে আরম্ভ করে দিয়েছে মুসা।

'জখমী মানুষ,' কিশোর বললো, 'বেশি দূর যেতে পারার কথা নয়। গর্তটাতেই আগে দেখা যাক।'

গর্তের দেয়ালে কোনো লেখা দেখা গেল না।

কঙ্কালটার কাছে, পাথরের পেছন থেকে ছোট একটা জিনিস কুড়িয়ে নিলো পিনটু। ইনডিয়ানদের তৈরি মাটির একটা জগ। উল্টেপাল্টে দেখে বললো, 'কি যেন আছে।'

জগটা হাতে নিলো কিশোর। 'শুকনো রঙের মতো লাগছে।'

'কালো রঙ?' দেখার জন্যে ঝুঁকে এলো রবিন।

'হুঁ,' করলো শুধু মুসা।

'গুহার দেয়ালে আরেকবার খোঁজা দরকার,' কিশোর বললো। 'ধুলো লেগে আছে পুরু হয়ে। ঢেকে থাকতে পারে লেখাটা।' পকেট থেকে রুমাল বের করে সাবধানে বাড়ি দিয়ে ধুলো ঝাড়তে শুরু করলো সে।

অন্যেরাও রুমাল বের করলো।

বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মুসা বলে উঠলো, 'রবিন, আলোটা ধরো তো এদিকে!'

কঙ্কালের পাশে পাথরের দেয়ালে সত্যিই লেখা রয়েছে চারটে শব্দঃ ছাই···ধুলো···বৃষ্টি···সাগর। কালচে রঙে লেখা।

চেয়ে রয়েছে চারজনেই। কিছু বুঝতে পারছে না।

'পরের দুটো শব্দ বেশ কাছাকাছি,' পিনটু বললো। 'লিখলেন কি দিয়ে? রক্ত?'

'ছাই আর ধুলোর কথা লিখেছেন কেন?' মুসার প্রশ্ন। 'কোনো ফায়ারপ্লেসে লুকিয়েছেন?'

'নাকি সাগরের ধারে কোথাও?' রবিন যোগ করলো।

'কিন্তু এর সাথে বৃষ্টির সম্পর্ক কোথায়?' ভুরু নাচালো পিনটু।

'নাহ্, অর্থহীন! মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না,' মাথা নাড়লো মুসা।

'কিন্তু অর্থহীন কথা কেন লিখবেন একজন মানুষ, যিনি মরতে চলেছেন?'

'লেখেনওনি,' পিনটুর সঙ্গে একমত হলো কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। 'অর্থ একটা নিশ্চয়ই আছে।'

'অন্য কেউ লিখে থাকতে পারে,' রবিন বললো। 'ডন পিউটোর আগেই।'

'আমার মনে হয় না,' কিশোর বললো। 'ডনই লিখেছেন, ছেলের জন্যে মেসেজ। তিনি মারা যাওয়ার পর অন্য কেউ এসে লিখেছে, তা-ও হতে পারে না। তাহলে,

বেরিয়ে গিয়ে চারটে লাশের কথা বলতোই সেই লোক।'

'এমনও হতে পারে, তখন মাথার ঠিক ছিলো না তাঁর, কি লিখতে কি লিখেছেন,' রবিন বললো।

'এটাও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না...'

'কিশোর!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো পিনটু। 'ও কিসের শব্দ?'

গুহার ছাতের ওপরে হচ্ছে শব্দটা।

'পায়ের শব্দ!' রবিন বললো। 'বুট পরা। কনডর ক্যাসলের ওপরে উঠেছে কেউ।'

'কাউবয়গুলো হবে,' পিনটু বললো।

'কাদায় জুতোর ছাপ পড়েছে আমাদের!' শঙ্কিত হয়ে উঠলো মুসা। 'গুহামুখের কাছেই যদি পড়ে থাকে তাহলে দেখে ফেলবে ওরা। তাহলে আর বাঁচতে পারবো না!'

'এসো!' আদেশ দিলো গোয়েন্দাপ্রধান।

কোথায় যেতে বলছে, প্রশ্ন করলো না কেউ। কিশোরের সাথে চললো। সরু সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এলো ছোট গুহাটায়। গুহামুখের দু'পাশে ঘাপটি মেরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো। বাইরে থেকে আসছে কথা বলার মৃদু আওয়াজ।

'আসবেই!' মুসা বললো ফিসফিসিয়ে।

জোরালো হচ্ছে কণ্ঠস্বর। তারপর শোনা গেল গুহামুখের কাছে পায়ের আওয়াজ।

'দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সেঁটে থাকো,' নির্দেশ দিলো কিশোর। 'পাথরগুলো ঠেলে সরিয়ে নামতে হবে ওদেরকে। ঢুকেই প্রথমে আমাদের দেখতে পাবে না, অন্ধকারে পাথর-টাথরই ভাববে দেখলেও। আর না দেখলে সরে যাবে পেছন দিকে, এই সুযোগে বেরিয়ে দেবো দৌড়।'

পাথরের গায়ে বুট দিয়ে লাথি মারার আওয়াজ হলো কয়েকবার। তর্ক শুরু করে দিলো তিনটে কণ্ঠ। তার পর পাথরের গায়ে পাথর বাড়ি লাগার শব্দ হলো।

'কি বলছে?' জিজ্ঞেস করলো রবিন। 'কিছুই তো বোঝা যায় না।'

'আমিও বুঝতে পারছি না,' মুসা বললো।

কান খাড়া করে আছে চারজনেই।

পাথর দিয়ে গুহামুখ বন্ধ করে রাখার ফলে বাইরে থেকে আওয়াজ আসছে ঠিকই, তবে ছাঁকুনিতে ছাঁকা হয়ে যেন, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না কথা।

'আসে না কেন এখনও?' ফিসফিস করে বললো পিনটু।

গুহার অন্ধকারে বসে আছে চার কিশোর, টানটান উত্তেজনা।

সময় যেন স্থির হয়ে গেছে ওদের জন্যে।

প্রায় মিনিট পনেরো পর গুহার বাইরে বুটের শব্দ জোরালো হলো আবার। তারপর সরে যেতে লাগলো। মিলিয়ে গেল কণ্ঠস্বর। চলে যাচ্ছে বোধহয় লোকগুলো।

আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করলো ছেলেরা। 'গুহামুখটা দেখেনি,' পিনটু বললো।

'না, দেখেনি,' প্রতিধ্বনি করলো যেন রবিন।

'কিন্তু,' মুসার প্রশ্ন, 'আমাদের পায়ের ছাপ তো না দেখার কথা নয়। গুহামুখটা কেন চোখে পড়লো না ওদের?'

গুহামুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছে কিশোর। বিড়বিড় করে বললো, 'আমাদের কাছ থেকে বেশি দূরে ছিলো না ওরা। কথা বুঝলাম না কেন? কেন পরিষ্কার হলো না?'

'চলো, বেরোই,' মুসা বললো। 'পাথর সরাতে হবে।' টর্চ জ্বেলে ধরে রাখলো রবিন। পাথর সরাতে লাগলো অন্য তিনজন। একটা সরালো···দুটো···তিনটে···কিন্তু বাইরে থেকে আলো কিংবা তাজা বাতাস আসার কোনো লক্ষণ নেই।

যে ক'টা পাথর দিয়ে মুখ বন্ধ করেছিলো, সব সরিয়ে ফেললো ওরা। তার পরেও না এলো আলো, না বাতাস, না বৃষ্টির ছাঁট।

'ব্যাপারটা কি?' বুঝতে পারছে না পিনটু।

হামাগুড়ি দিয়ে গুহামুখের কাছে এগোলো মুসা। 'খাইছে!' চিৎকার শোনা গেল তার। 'পাথর!'

'কি বলছো!' পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললো রবিন, শঙ্কিত হয়ে উঠেছে, 'বন্ধ করে দেয়নি তো!'

ধীরে ধীরে ফিরে এলো মুসা। চোখে আতঙ্ক। 'না, ওরা বন্ধ করেনি। কাদার আরেকটা ধস নেমেছিলো মনে হচ্ছে। বিরাট এক পাথর এসে পড়েছে গুহামুখে। সে-জন্যেই ওর মুখটা দেখেনি, ওদের কথা স্পষ্ট কানে আসেনি আমাদের।'

উনিশ

'ঠিক দেখেছো তো মুসা?' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর, 'হয়তো তেমন বড় নয়। চলো, দেখে আসি।'

সুড়ঙ্গটা সরু, কিন্তু ঠাসাঠাসি করে জায়গা হয়ে গেল চারজনের। সবাই মিলে ঠেলা লাগালো পাথরটায়।

'হাউফ!' করে নিঃশ্বাস ছাড়লো মুসা।

'বাপরে বাপ!' পা ফসকে গেল পিনটুর।

গায়ের জোরে ঠেলছে কিশোর আর রবিন।

কিন্তু এক চুল নড়লো না পাথর।

'হবে না,' হাল ছেড়ে দিলো রবিন। 'এভাবে কিছুই করতে পারবো না।'

মুসাও একমত হলো তার সঙ্গে।

আবার গুহায় ফিরে এলো ওরা।

'আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখলো কিশোর। 'আজ আমরা না ফিরলে কাল খোঁজাখুঁজি শুরু হবে। রিগো বলে দেবে তখন কনডর ক্যাসলের কথা। কথা বোঝা যায়নি বটে, তবে গলার স্বর তো শুনেছি। বাইরে কেউ এলে আমরা শুনতে পাবো, আমরা চেঁচামেচি করলে বাইরে থেকে শোনা যাবে।'

গুঙিয়ে উঠলো মুসা। 'তার মানে আজ সারাটা রাত এখানে থাকতে হবে?'

'আর কি করার আছে?' হাসলো কিশোর। 'গুহাটা খারাপ না। শুকনো। বাতাস আছে। গুহার মুখে এতো বড় পাথর থাকা সত্ত্বেও বাতাস যখন আসছে, আমার মনে হয় আরও কোনো পথ আছে। ফাটল তো থাকতেই পারে।'

'ঠিকই বলেছো,' সায় জানালো পিনটু।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলতে লাগলো রবিন। অন্য তিনজন খুঁজে দেখলো কিন্তু একটা ফাটলও কোথাও চোখে পড়লো না যেটা দিয়ে বাতাস আসতে পারে।

'বাঁয়ের দেয়ালটা দেখো,' কিশোর বললো, 'পাথরের চেয়ে মাটি বেশি। আর ভেজা ভেজা। বেশি পুরু মনে হচ্ছে না। খুঁড়ে বেরোনো হয়তো যায়।'

'খুঁড়বো কি দিয়ে?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'তাহলে চলো,' আবার বললো কিশোর, 'বড় গুহাটায় ফিরে যাই। দেখি আর কোন পথ আছে কিনা।'

'ওটাতে তো অনেক খুঁজলাম,' রবিন মনে করিয়ে দিলো। 'পথ থাকলে কি চোখে পড়তো না?'

'আরেকবার চেষ্টা করতে দোষ কি? তাছাড়া সাংকেতিক লেখাটাও আবার দেখতে চাই।'

সুড়ঙ্গ পেরিয়ে আবার বড় গুহাটায় এসে ঢুকলো ওরা। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে যেন ব্যঙ্গ করছে খুলিগুলোর শূন্য কোটর। বিকট হাসিতে বেরিয়ে পড়েছে দাঁত। টর্চের আলোয় আরেকবার দেয়ালগুলো পরীক্ষা করলো ওরা। তাজা বাতাস রয়েছে ভেতরে, ঢোকার পথ নিশ্চয় আছে, অথচ সেটা বের করা গেল না।

'সাহায্যের অপেক্ষায় বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই,' হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লো রবিন। 'কিংবা খালি হাতেই দেয়াল খোঁড়ার চেষ্টা করতে পারি।'

'কোনোটাই করার ইচ্ছে নেই আমার,' সাফ মানা করে দিলো মুসা।

'খোঁড়াটা কঠিনই,' অসম্ভব শব্দটা বলতে চাইলো না কিশোর। 'বেরোতে না পারলে সারারাত বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। শুধু শুধু বসে থাকবো কেন? মেসেজটা নিয়েই মাথা ঘামাই।'

'তুমি ঘামাওগে,' মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো মুসা। 'আমার মাথাও নেই, ঘামও নেই।'

তার কথায় কান দিলো না কিশোর। 'আরেকবার দেখা যাক লেখাগুলো।'

ছোট গর্তের কিনারে এসে বসে পড়লো চারজনে। স্প্যানিশ ভাষায় লেখা চারটে শব্দের দিকে তাকালো নীরবে।

বার কয়েক নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'পিনটু, ঠিকই বলেছো, চারটে শব্দের মাঝে ফাঁক একরকম নয়। ছাই আর ধুলোর মাঝে ফাঁক বেশি, কিন্তু বৃষ্টি আর সাগরের মাঝে কম। প্রায় গায়ে গায়েই লেগে আছে। মাঝখানে একটা ড্যাশমতোও দেখা যাচ্ছে, হাইফেনও বলা যায়। দুটো শব্দকে এক করে বোঝাতে চেয়েছেন বোহয় ডন। তাহলে মেসেজটা পড়তে হবে এভাবেঃ ছাই…ধুলো…বৃষ্টি-সাগর। মানেটা কি?'

'কিছু না,' বলে দিলো মুসা।

'সাগর আর বৃষ্টির মাঝে একটা মিল আছে,' পিনটু বললো। 'পানি।'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

'সম্পর্ক আরও আছে,' রবিন বললো, 'যদি গোড়া থেকে ভৌগোলিক কারণ খুঁজতে যাও। সাগর থেকে বাষ্প উঠেই মেঘের সৃষ্টি হয়, সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে আবার সাগরে নেমে আসে পানি, আবার বাষ্প হয়, চলতে থাকে এভাবেই।'

'বেশ,' কিশোর বললো, 'সাগর থেকে বৃষ্টির উৎপত্তি, তারপর আবার সাগরেই ফিরে যায়। এর সাথে ধুলোবালি আর ছাইয়ের কি সম্পর্ক?'

'ছাইয়ের মধ্যে ধুলোবালি থাকতে পারে,' পিনটু বললো। 'কিংবা ধুলো থেকে ছাই আসে…'

'উঁহুঁ,' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলো মুসা, 'ধুলো থেকে ছাই আসতেই পারে না।'

'না, পারে না,' ধীরে ধীরে বললো কিশোর। 'ভাবো, ভাবতে থাকো। কোথাও কোনো যোগাযোগ আছেই। চারটে শব্দের মধ্যেই রয়েছে সূত্র। স্যানটিনোকে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন ডন?'

কেউ জবাব দিতে পারলো না।

আবার বললো কিশোর, 'মাথা খাটাও। চলো যাই ছোট গুহাটায়। দেখি খোঁড়া-টোঁড়া যায় কিনা?' আশা ছাড়তে রাজি নয় গোয়েন্দাপ্রধান।

'এক কাজ করতে পারি!' তুড়ি বাজালো মুসা। 'রাইফেলগুলোকে খোঁড়ার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারি!'

বেল্টে ঝোলানো যন্ত্রপাতির ব্যাগে চাপড় দিলো রবিন। 'মাটি খোঁড়ার কিছু নেই এটাতে। তবে স্ক্রু-ড্রাইভারটা কাজে লাগানো যায়।'

ছোট গুহায় ফিরে এসে বাঁয়ের দেয়ালটা পরীক্ষা করে দেখলো ওরা। ভেজা, নরম মাটি।

'পুরো এক হপ্তা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে,' মুসা বললো, 'কাদা হয়ে গেছে মাটি। কতোটা পুরু আল্লাহ্ই জানে।' হাসলো সে। 'দেখা যাক।'

পুরানো রাইফেল, স্ক্রু-ড্রাইভার আর চ্যাপ্টা পাথর নিয়ে কাজে লেগে গেল ওরা। শুরুতে মাটি বেশ আঠালো, সাবানের মতো আটকে থাকতে চায়। সেই স্তরটা সরানোর পর আঠা কমে গেল, ভেজা বাড়লো। মাটিতে খোঁচা দিলেই এখন পুচপুচ করে কাদা বেরোয়। আরও ফুটখানেক খোঁড়ার পর পড়লো পাথর। বড় না, খুঁড়ে বের করে আনলো সেটা।

দরদর করে ঘামছে চারজনেই। মাটি-কাদায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছে শরীর আগেই, তার সঙ্গে যুক্ত হলো আরও মাটি। ক্লান্ত হয়ে আসছে ওরা, পেট মোচড় দিচ্ছে খিদেয়। শেষে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না, সটান শুয়ে পড়লো মাটিতে। তার পরেই ঘুম। ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলো ভোর পর্যন্ত। ঘড়ি দেখে বুঝলো যে ভোর হয়েছে। ব্যাটারি ফুরিয়ে আসছে রবিনের টর্চের। আবার কাজে লাগলো ওরা। টর্চের আলো থাকতে থাকতেই যা করার করতে হবে।

সাড়ে সাতটার দিকে চেঁচিয়ে উঠলো মুসা, 'আলো! এই, আলো দেখা যায়!'

নতুন উদ্যমে সুড়ঙ্গ খোঁড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়লো সকলে। আলো বাড়ছে…বাড়ছে, ব্যস,হয়ে গেল কাজ। সরু সুড়ঙ্গ পথে হামাগুড়ি দিয়ে একের পর এক বেরিয়ে এলো ওরা, ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে।

'খাইছে!' মুসা বললো। 'আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো?'

পানির গর্জন কাঁপিয়ে দিচ্ছে যেন পুরো এলাকাটাকে। নেমে এসেছে পাহাড়ী ঢল। হাত তুলে চিৎকার করে বললো পিনটু, 'দেখো দেখো, অর্ধেকটা বাঁধ শেষ…'

'টিবিটাও গায়েব!' রবিন বললো।

'দেখো!' অ্যারোইওর দিকে হাত তুললো কিশোর।

ওদের নিচে যে অ্যারোইওটা চলে গিয়েছিলো হাসিয়েনডা পর্যন্ত, ঢিবি ধসে পড়ায় ওটা আর অ্যারোইও নেই, এমনকি নালা বা খালও বলা যাবে না এখন, নদীই হয়ে গেছে প্রায়। প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলেছে ঘোলাটে পানির স্রোত। একটা ক্রীক নয়, দুটো ক্রীক দিয়ে এখন সাগরের দিকে চলেছে পানি।

সেদিকে তাকিয়ে চক চক করে উঠলো কিশোরের চোখ। জোরে তুড়ি বাজিয়ে বললো, 'পেয়েছি! জবাব পেয়েছি!'

বিশ

'কী, কিশোর?' একসাথে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা আর রবিন।

কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল গোয়েন্দাপ্রধান। কাউন্টি রোডের দিকের শৈলশিরাটার দিকে হাত তুললো। 'মানুষ! কাউবয়গুলো না তো?'

কপালের ওপর হাত তুলে এনে বৃষ্টি বাঁচিয়ে ভালোমতো তাকালো মুসা। চারজন লোক আসছে।

'না না, কাউবয় না!' খুশি হয়ে বললো মুসা। 'আমার আর রবিনের বাবা আসছে! সাথে শেরিফ আর ক্যাপ্টেন ফ্লেচার!'

পিচ্ছিল ঢাল বেয়ে যতো দ্রুত সম্ভব দৌড়ে নামতে আরম্ভ করলো চার কিশোর।

'মুসাআ!' দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার আমান, 'তোরা ভালো আছিস?'

'আছি,' হাসিমুখে জবাব দিলো মুসা।

রাগ করে বললেন মিস্টার মিলফোর্ড, 'এখানে সারা রাত কি করলে তোমরা?'

'আটকে গিয়েছিলাম,' কি করে গুহায় আটকা পড়েছিলো জানালো রবিন। ডন পিউটো আর তিন সৈনিকের কঙ্কাল আবিষ্কার করেছে যে সেকথাও জানালো।

'আরেকটা রহস্যের সমাধান তহলে করে ফেললে,' হাসতে হাসতে বললেন পুলিশ-চীফ।

'মা-বাবাকে যা দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে না,' শেরিফ বললেন। 'রিগো বললো তলোয়ার খুঁজতে বেরিয়েছো তোমরা। অর্ধেকটা রাত এই পাহাড়ে খোঁজাখুঁজি করছি আমরা। কিশোর, বোরিস আর রোভারকে নিয়ে খুঁজছেন তোমার চাচা। মিস্টার ডয়েলও খুঁজছেন দলবল নিয়ে, নালার ওদিকটায়। গুহায় কি করে ঢুকলে এখন খুলে বলো তো শুনি?'

শুরু করতে যাচ্ছিলো মুসা, তাকে থামিয়ে দিয়ে কিশোর বললো, 'চলুন, হাসিয়েনডার দিকে যেতে বলছি। চাচাকে আর দুশ্চিন্তায় রেখে লাভ নেই। রেডিওতে খবর দেয়া যাবে?'

ওয়াকি-টকিতে কথা বললেন শেরিফ। সার্চ পার্টিকে এসে জমায়েত হতে বললেন হাসিয়েনডার কাছে।

হাঁটতে হাঁটতে জানালো ছেলেরা, কিভাবে কাউবয়েরা তাড়া করেছিলো ওদের। কাউন্টি রোডে উঠে ব্রিজ পেরোলো, এসে পৌঁছলো হাসিয়েনডার কাছে।

ইতিমধ্যেই ওখানে বোরিস আর রোভারকে নিয়ে পৌঁছে গেছেন রাশেদ পাশা।

তাঁদের পেছনে ডয়েলদের র‍্যাঞ্চ ওয়াগনটা, ওটার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার ডয়েল, টেরিয়ার, ম্যানেজার ডরি, আর দু'জন লোক।

শেরিফের গাড়িটাও আছে। তাতে বসে আছেন ডেপুটি শেরিফ।

দৌড়ে এলেন রাশেদ পাশা। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিশোর, ভালো আছিস তোরা?'

'আছি, চাচা।'

এগিয়ে এলেন মিস্টার ডয়েল, তাঁর সাথে এগোলো টেরি আর ডরি।

দাঁত বের করে হেসে বললো টেরি, 'ইহ্হি, চেহারার কি ছিরি হয়েছে! একেবারে ভূত...'

'এই, থাম্ তো!' ধমক দিলেন তার বাবা। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভালোয় ভালোয় যে ফিরে এসেছো এটাই বেশি।'

কাজের কথা শুরু করলেন শেরিফ, 'ওই তিনজন লোক কেন তাড়া করেছিলো তোমাদের?'

'কারণ, ওরা রিগোকে ফাঁসানোর জন্যে ফাঁদ পেতেছিলো,' জবাব দিলো মুসা। 'আর সম্ভবত হাসিয়েনডাটাও ওরাই পুড়িয়েছে।'

গজগজ করতে লাগলো ডরি, 'আগুন রিগো লাগিয়েছে। ওরকম একটা কাণ্ডজ্ঞান ছাড়া লোক র‍্যাঞ্চ চালাবে এখানে? অসম্ভব!'

'র‍্যাঞ্চ থাকলে তো চালাবে,' হেসে উঠলো টেরি।

'এই, তোকে চুপ থাকতে বলেছি না!' কড়া ধমক লাগালেন মিস্টার ডয়েল। 'ডরি, তুমিও কথা বলবে না।' কিশোরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'রিগো যে লাগায়নি প্রমাণ করতে পারবে?'

'নিশ্চয় পারবো। আগুন যেদিন লেগেছিলো সেদিন বিকেল তিনটেয় তার মাথায় হ্যাট ছিলো। আমাদের সঙ্গে ছিলো তখন রকি বীচ সেন্ট্রাল ইস্কুলে। শেরিফ বলেছেন, আগুনটা লেগেছে তিনটের আগে। তাহলে ক্যাম্পফায়ারের কাছে তখন রিগোর হ্যাট পড়ে থাকে কি করে?'

কিশোর থামতে রবিন যোগ করলো, 'উঁট...ইয়ে, টেরিয়ার আর মিস্টার ডরিও ইস্কুলে রিগোর মাথায় হ্যাটটা দেখেছে। কারণ ওরাও তখন ওখানে ছিলো।'

'আমি মনে করতে পারছি না,' গোমড়া মুখে বললো টেরি।

'ছিলোই না মাথায়,' ডরি বললো, 'মনে থাকবে কি?'

'ছিলো,' জোর দিয়ে বললো কিশোর। 'বিকেলে যখন তার সাথে হাসিয়েনডায় ফিরলাম, তখনও ছিলো মাথায়। গোলাঘরে ঢুকে একটা হুকে ঝুলিয়ে রেখেছিলো। এই সময় আগুন লাগার কথা শুনে দৌড়ে বেরোয় ঘর থেকে। গোলাঘর পুড়লো, তখন

হ্যাটটা ভেতরে থাকলে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার কথা, অথচ পোড়েনি। এর কারণ, দাবানল নেভাতে যখন ব্যস্ত ছিলো সবাই, তখন এসে গোলাঘর থেকে হ্যাটটা তুলে নিয়ে যায় তিন কাউবয়। নিয়ে গিয়ে ক্যাম্পফায়ারের কাছে ফেলে রাখে ওটা, রিগোকে ফাঁসানোর জন্যে।'

'সেটা প্রমাণ করতে পারবে না,' কুকুরের মতো গরগর আওয়াজ বেরোলো ডরির গলা দিয়ে। 'কেন রিগোকে ফাঁসাতে চাইবে ওরা?'

'কারণ, ওই দাবানলটাও ওরাই লাগিয়েছিলো। গোলাঘর আর হাসিয়েনডা পোড়ানোর জন্যেও ওরাই দায়ী।'

'প্রমাণ করতে পারবে, কিশোর?' ইয়ান ফ্লেচার জিজ্ঞেস করলেন।

'আর ওই কাউবয়গুলোকে পাওয়া যাবে কোথায়?' জানতে চাইলেন শেরিফ।

'আমার বিশ্বাস, ডয়েল র‍্যাঞ্চে পাবেন।'

রেগে গেলেন মিস্টার ডয়েল, 'কি বলছো তুমি, ছেলে! আমি এসব করিয়েছি বলতে চাও?'

'না, স্যার, আপনি এসবের কিছুই জানেন না। তবে যারা জানে, তারা, এখানেই আছে। কাউবয়েরা হ্যাটটা আনতে একা যায়নি, তাই না টেরি?'

'টেরি?' ঝট করে ছেলের দিকে তাকালেন মিস্টার ডয়েল।

'ও পাগল হয়ে গেছে, বাবা, ওর কথা বিশ্বাস করো না!'

পকেট থেকে চাবির রিঙটা বের করলো কিশোর। 'গোলাঘরে পেয়েছি। এটা খুঁজতেই এসেছিলো কাউবয়েরা, আর এটার জন্যেই আমাদেরকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। রিগোর হ্যাটটা নেয়ার সময় চাবিটা পড়ে গিয়েছিলো। র‍্যাঞ্চ ওয়াগনের চাবি।'

'আমাদের ওয়াগনের?' বিশ্বাস করতে পারছেন না মিস্টার ডয়েল।

'আমার তো তাই বিশ্বাস। আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন।'

'টেরি!' কঠিন দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন মিস্টার ডয়েল।

'আ-আমি···আমি···,' তোতলাতে শুরু করলো টেরি। তারপর ডরির দিকে তাকিয়ে জ্বলে উঠলো তার চোখ। 'এই ম্যানেজারের বাচ্চাকে দিয়েছিলাম এটা, বাবা! ও বললো, তার কাছে যেটা ছিলো, আগুন লাগার সময় সেটা হারিয়ে ফেলেছিলো। আমাকে বলেনি···'

'চুপ করো!' গর্জে উঠলো ডরি। 'তুমি জানো না কিছু, না? হ্যাটটা আনার সময় যে চাবিটা হারিয়েছি একথা ভালো করেই জানো তুমি!'

সবার চোখ এখন হোঁৎকা ম্যানেজারের দিকে।

'ওই গাধা তিনটে আমার দোস্ত,' সব বলে দিতে লাগলো ডরি, রাগটা টেরির

ওপর। 'আমাকে একবার বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিলো। এবার ওরা বিপদে পড়ে এলো আমার কাছে। মিস্টার ডয়েলের এলাকায় ওদের লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করলাম। আগুন জ্বালতে কতোবার মানা করেছি, তা-ও শুনলো না গাধাগুলো, জ্বাললোই। ওদের ক্যাম্পফায়ার থেকেই দাবানল লাগলো। বুঝলাম, এটা জানাজানি হয়ে গেলে আমারও বিপদ হবে, ঘাড় ধরে বের করে দেবেন আমাকে মিস্টার ডয়েল। টেরিয়ারকে বললাম সেকথা। সে-ই আমাকে বুদ্ধি দিলো রিগোকে ফাঁসিয়ে দেয়ার জন্যে। চলে গেলাম আলভারেজদের গোলাঘরে, রিগোর ব্যবহার করা একটা জিনিস খুঁজে আনার জন্যে। দেখলাম, দরজার পাশেই হুকে ঝোলানো রয়েছে ওর হ্যাটটা। নিয়ে এলাম। পরে গিয়ে ফেলে রেখেছিলাম ক্যাম্পফায়ারের কাছে। হয়ে গিয়েছিলো কাজ, সব ভজঘট করে দিলো ওই হতচ্ছাড়া চাবিটা!'

গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন শেরিফ, 'চাবিটা তখন তুলে নিলে না কেন?'

'তাড়াহুড়ার মধ্যে ছিলাম তখন,' ডরি বললো। 'খোঁজার সময়ই ছিলো না। কে কোত্থেকে দেখে ফেলে এই ভয়ে...'

'সময় আর থাকবে কি করে?' খোঁচা দিয়ে বললো মুসা। 'গোলাঘর তখন নিশ্চয় পুড়তে শুরু করেছে।'

'হ্যাঁ,' গলা বসে গেল ডরির। কাশি দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে বললো, 'আসলে এসব পোড়ানোর কোনো ইচ্ছে আমার ছিলো না। আমি শুধু শয়তান তিনটেকে জায়গা দিয়েছিলাম। ওরা শুনে ফেললো, আলভারেজদের র‍্যাঞ্চটা আমরা চাই। তাই ইচ্ছে করেই আমাদেরকে সাহায্য করতে এলো, দাবানল লাগালো, হাসিয়েনডা আর গোলাঘর পোড়ালো। আমি যখন জানলাম, তখন দেরি হয়ে গেছে। আগুন লাগিয়ে দিয়েছে গোলাঘরে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে ঢুকলাম, হ্যাটটা পেয়ে আর একটা মুহূর্ত দেরি না করে বেরিয়ে চলে এলাম। চাবি খোঁজার সময়ই পেলাম না।'

'আরেকটা কথা স্বীকার করছেন না কেন?' ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো রবিন, 'তলোয়ার খোঁজায় আমাদের বাধা দিয়েছেন আপনারা। আপনি আর টেরি। পিছে লেগেছেন, জানালায় আড়ি পেতেছেন, আমাদের হুমকি দিয়েছেন।'

'দায়িত্ব পালন করেছি শুধু,' প্রতিবাদ জানালো ডরি।

'দায়িত্ব আর পালন করতে হবে না তোমাকে,' মিস্টার ডয়েল বললেন। 'যাও, জিনিসপত্র যা আছে, নিয়ে বিদেয় হও।' তারপর জ্বলন্ত চোখে তাকালেন ছেলের দিকে। 'আর তোমার ব্যবস্থাও আমি করছি, পরে! যাও, গাড়িতে গিয়ে বসো।'

'সরি, আপনি যেতে বললেও আমরা ওদের যেতে দিতে পারি না,' শেরিফ বললেন। ডেপুটিকে আদেশ দিলেন, 'অ্যারেস্ট করো।'

ডরি আর টেরিকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুললেন ডেপুটি।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে রইলেন মিস্টার ডয়েল। তারপর নীরবে গিয়ে নিজের গাড়িতে উঠলেন। শেরিফরা রওনা হওয়ার আগেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন, বোধহয় উকিলের সঙ্গে দেখা করার জন্যেই।

গাড়ির দিকে যাওয়ার আগে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হাসলেন ইয়ান ফ্লেচার, 'একজন নির্দোষ মানুষকে মুক্ত করলে তোমরা। আমি এখুনি গিয়ে রিগোকে ছাড়ার ব্যবস্থা করছি।'

শেরিফ, ক্যাপ্টেন ফ্লেচার, আর ডয়েলরা চলে গেল। ঘড়ি দেখলেন রাশেদ পাশা। ইয়ার্ডের ট্রাকটা আনতে বললেন বোরিস আর রোভারকে। ছেলেদেরকে বললেন, 'ভূত সেজে আছিস তো একেকজন। চল, আগে গোসল করতে হবে। তারপর খাওয়া।'

'কিন্তু আরও কিছুক্ষণ থাকতে হবে আমাদেরকে এখানে,' কিশোর বললো। 'অন্তত পনেরো মিনিট। তাতেই হয়ে যাবে।'

'আরও থাকবি?' অবাক হলেন রাশেদ পাশা। 'কেন?'

'তাতে কি হয়ে যাবে, কিশোর?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'আলভারেজদের র‍্যাঞ্চটা বাঁচাতে হবে না?' কিশোর বললো, 'করটেজ সোর্ডটা বের করবো।'

'হায় হায়, ভুলেই গিয়েছিলাম!' প্রায় চিৎকার করে উঠলো পিনটু। 'তুমি বলছিলে জবাব পেয়ে গেছো!'

'হ্যাঁ, পেয়েছি তো। এসো আমার সঙ্গে।'

কাউন্টি রোডের দিকে এগোলো সে। সাথে চললো রবিন, মুসা, পিনটু। কৌতূহল দমাতে না পেরে রাশেদ পাশাও চললেন পেছন পেছন। বৃষ্টি থেমেছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসার তাল করছে সূর্য। অ্যারোইওর ওপরের ব্রিজটায় পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'আমেরিকান লেফটেন্যান্টের জার্নালের কথা মনে আছে তোমাদের? লিখেছিলো, শৈলশিরার ওপরে তলোয়ার হাতে দেখেছে ডন পিউটোকে। ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন ডন।'

'আছে,' মুসা বললো। 'তবে ভুল লিখেছিলো। হাসিয়েনডার দিক থেকে আসা কোনো নালাও নেই, আর পাশে কোনো শৈলশিরাও নেই, যেটাতে ঘোড়সওয়ার দেখা যাবে।'

'আছে এখন,' খুশি খুশি গলায় বললো কিশোর। 'আর আঠারোশো ছেচল্লিশ সালেও ছিলো। ওই দেখো।'

অ্যারোইওটাই ক্রীক বা নালা হয়ে গেছে এখন। ওটার ওপাশে শৈলশিরার মাথায় সগর্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন মুণ্ডুহীন ঘোড়ার মূর্তিটা।

'আঠারোশো ছেচল্লিশ, এবং তারও আগে,' বুঝিয়ে বললো কিশোর, 'শান্তা

ইনেজ ক্রীকের নিশ্চয় দুটো শাখা ছিলো। ম্যাপে দেখেছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি আমরা। কারণ ম্যাপে আঁকা অ্যারোইও আর ক্রীক দেখতে একই রকম। আঠারোশো ছেচল্লিশ সালে লেফটেন্যান্ট যখন এখানে এসেছিলো, অ্যারোইওটা তখন ক্রীকই ছিলো। তারপর ভূমিকম্পে কিংবা ভূমিধস নেমে এটার মুখ বন্ধ হয়ে যায়, নালা বন্ধ হয়ে গিয়ে সৃষ্টি হয় অ্যারোইও। সম্ভবত ওই একই ভূমিকম্পে বন্ধ হয়ে যায় কনডর ক্যাসলের নিচের গুহামুখটাও। দিন যেতে থাকলো। এই অ্যারোইওটা যে একসময় ক্রীক ছিলো, ধীরে ধীরে লোকে ভুলেই গেল সেকথা।'

'লেফটেন্যান্ট তাহলে ঠিকই দেখেছিলো,' রবিন বললো। 'ডন পিউটোকে দেখেছিলো সান্তা ইনেজ ক্রীকের পাশের শৈলশিরায়।'

'দেখেছিলো। চলতে দেখেছিলো, তারপর নিশ্চয় হারিয়ে ফেলে। লেফটেন্যান্টের মাথা গরম ছিলো তখন, তাছাড়া সন্ধ্যার অন্ধকার। মূর্তিটার কথা জানতো না। মূর্তিটাকে যখন দেখলো, ওটাকে ডন পিউটো বলেই ভুল করলো।'

ব্রিজ থেকে নেমে পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করলো কিশোর। অন্যেরা সঙ্গী হলো তার। রবিন জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু মূর্তিটাকে তো নড়তে দেখার কথা নয়।'

'নড়েওনি,' কিশোর বললো। 'নড়েছেন পিউটো। ওটার কাছে দাঁড়িয়ে। তলোয়ারের খোলসটা তখন ওটার ভেতরে লুকাচ্ছিলেন তিনি।'

'তাহলে কি আরও কোনো সূত্র আছে মূর্তির কাছে?' মুসা জিজ্ঞেস করলো। 'যেটা আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে?'

'ছাই…ধুলো…বৃষ্টি—সাগর,' বিড়বিড় করলো গোয়েন্দাপ্রধান। 'ছেলের জন্যে মেসেজ রেখে গিয়েছিলেন ডন। সাগর থেকে বৃষ্টির উৎপত্তি, আবার সাগরেই ফিরে যায়। ছাই যায় কোথায়?' ধুলো যায় কোথায়? স্প্যানিশ ক্যালিফোর্নিয়ানরা খুব ধার্মিক লোক ছিলো। তারা…'

'ছাই থেকে ছাই!' বলে উঠলো পিনটু।

'আর ধুলো থেকে ধুলো!' প্রতিধ্বনি করলো যেন রবিন। 'কবর দেয়ার সময় এই শ্লোক আওড়ায় পাদ্রীরা। এটা বোঝানোর জন্যে, যেখান থেকে আসে সেখানেই আবার ফিরে যায় সব কিছু। যেখান থেকে উৎপত্তি!'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'আহত ডনের হাতে সময় ছিলো খুব কম। স্যানটিনো যেন বুঝতে পারে, এরকম একটা ম্যাসেজই তিনি লিখেছিলেন ওই অল্প সময়ে। বোঝাতে চেয়েছিলেন, তলোয়ারটা যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই ফিরে গেছে। অর্থাৎ করটেজের কাছ থেকে এসেছে, আবার তাঁর কাছেই গেছে।'

পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মূর্তিটার দিকে তাকালো সবাই। মুণ্ডুহীন ঘোড়ার পিঠে আসীন দাড়িওয়ালা গর্বিত আরোহী যেন তাকিয়ে রয়েছে আলভারেজদের জমিদারীর

দিকে।

'তাহলে কি মূর্তির মধ্যেই লুকানো রয়েছে তলোয়ারটা?' প্রশ্ন করলেন রাশেদ পাশা।

'তা কি করে হয়?' মানতে চাইলো না পিনটু। 'খোঁজা তো আর বাদ রাখিনি আমরা। তলোয়ার লুকানোর জায়গাই নেই ভেতরে।'

'দোহাই তোমার, কিশোর,' দুই হাত ওপরে তুলে ফেললো মুসা, 'মূর্তির তলায় খুঁড়তে বলো না আর! এমনিতেই যা খুঁড়েছি, আগামী একশো বছর আর ওকাজটি করার ইচ্ছে নেই।'

তার কথায় হেসে ফেললো সবাই।

'না, সেকেণ্ড,' অভয় দিয়ে বললো কিশোর, 'মাটি খুঁড়তে বলবো না। দরকার নেই। মনে আছে, খোলস থেকে তলোয়ারটা বের করে ফেলায় অবাক হয়েছিলাম আমরা? খোলসটা তৈরিই হয়েছে জিনিসটা নিরাপদে রাখার জন্যে, অথচ বের করে ফেলা হয়েছে। নিশ্চয় জরুরী কারণে। কারণটা এখন আমি জানি।'

'জানো?'

'বলো!'

'কোথায় ওটা, কিশোর?'

হাসলো গোয়েন্দাপ্রধান। সবাইকে টেনশনে রেখে আনন্দ পাচ্ছে সে। 'গুহার ভেতরে জগটার কথা মনে আছে, যেটাতে কালো রঙ ছিলো? মেসেজ লেখা ছাড়াও ওই রঙ দিয়ে আরও একটা কাজ করেছেন ডন। গুলি খাওয়ার আগেই। যেখান থেকে তলোয়ারটা এসেছিলো, সেখানেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। মূর্তির ভেতরে নেই ওটা, আছে মূর্তির গায়ে।'

কাঠের মূর্তির পাশে ঝুলছে কাঠের তলোয়ার। আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হয়। তলোয়ারটা ধরে টান দিলো কিশোর। খুলে এলো তার হাতে, একটা নখের সর্বনাশ করলো। হাত থেকে ছেড়ে দিলো ওটা সে। পাথরে লেগে ঠং করে উঠলো তলোয়ার। নখটা একবার দেখে পকেট থেকে বের করলো ছোট ছুরি। উত্তেজনায় ব্যথা ভুলে গেছে। তলোয়ারের কালো শরীর থেকে রঙ চেঁছে তুলতে লাগলো। মেঘের ফাঁক দিয়ে বেরোনো সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করে উঠলো তলোয়ারের ধাতব শরীর।

বেরিয়ে পড়লো লম্বা একসারি দামী পাথর—লাল, নীল, সবুজ রঙের, হীরাও আছে কয়েকটা।

তলোয়ারটা সূর্যের দিকে তুলে ধরলো কিশোর। ঝিক করে উঠলো কয়েকটা পাথর। গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলো সে, 'এটাই করটেজ সোর্ড!'

একুশ

'ছাই থেকে ছাই, ধুলো থেকে ধুলো!' একঘেয়ে কণ্ঠে বললেন বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার, অনেকটা মন্ত্রপাঠের মতো করে। 'চমৎকার একটা মেসেজ রেখে গিয়েছিলেন ডন পিউটো আলভারেজ। অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক। আমাদের কিশোর পাশার মতোই।'

তলোয়ারটা খুঁজে পাওয়ার দিন কয়েক পরে পরিচালকের অফিসে রিপোর্ট করতে এসেছে তিন গোয়েন্দা। একজন প্রহরীকে নিয়ে এসেছে সাথে করে, কারণ, করটেজ সোর্ডটা মিস্টার ক্রিস্টোফারকে দেখাতে এনেছে ওরা। বিশাল টেবিলে পড়ে আছে এখন ওটা। ঘরের আলোয় দ্যুতি ছড়াচ্ছে পাথরগুলো, ঝিকমিক করছে সোনা আর রূপার অলংকরণ। একটা পান্না দেখালো কিশোর, ওটা এখন তলোয়ারের গায়ে জায়গামতো বসানো, ঝুপড়ির গর্তে খুঁজে পেয়েছিলো যেটা।

'চমৎকার জিনিস!' তলোয়ারটার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন পরিচালক। 'তাহলে র‍্যাঞ্চটা বাঁচলো আলভারেজদের।' কিশোরের দিকে মুখ তুললেন তিনি। 'কাউবয়গুলোকে ধরেছে পুলিশ?'

'ধরেছে,' কিশোর জানালো। 'টেকসাসে ডাকাতির দায়ে ওদের খুঁজছিলো পুলিশ এমনিতেই। আগুন লাগিয়ে আরেকটা অপরাধ করেছে। ওদেরকে সাহায্য করার জন্যে ডরিকেও জেলে ভরে দিয়েছে পুলিশ।'

'আর টেরিয়ারকে?'

'টেরিয়ার ওদেরকে সরাসরিভাবে সাহায্য করেনি,' মুসা জানালো। 'তাই কিছুটা নমনীয় হয়েছেন বিচারক। কিশোর অপরাধীদের সংশোধন করার ইস্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছেন।' হাসলো মুসা। 'বেরিয়ে এসে আর শয়তানী করতে হবে না আমাদের সঙ্গে। বোরোতেই দেবে না।'

'বেশি লাই দিয়ে আসলে মাথায় তুলে ফেলা হয়েছিলো তাকে। সন্তান খারাপ হওয়ার জন্যে বাবা-মায়েরাই বেশি দায়ী। যাকগে, সংশোধন ইস্কুলে যখন দেয়া হয়েছে, স্বভাব-চরিত্র ভালো না করে আর ছাড়বে না। তো, করটেজ সোর্ডটার কি হবে?'

'দেখেই কেনার অফার দিয়ে ফেলেছেন মিস্টার ডয়েল,' কিশোর বললো।

'তবে দাম আসলে যা হওয়া উচিত, তার চেয়ে কম,' রবিন বললো। 'ঠকানোর লোভ এখানেও ছাড়তে পারেননি।'

'টাকা ধার দিতে রাজি হয়ে গেল একটা লোক্যাল ব্যাংক,' কিশোর জানালো,

'মিস্টার ডয়েলের কাছ থেকে হেরিয়ানো পয়লা পেমেন্ট নেয়ার আগেই। মর্টগেজটা ডন হেরিয়ানোর কাছ থেকে আপাতত ব্যাংকই নিয়ে নিয়েছে।'

'আহারে, কি দরদ!' তিক্ত কণ্ঠে বললেন পরিচালক। 'আগে কোথায় ছিলো ওরা? যেই দেখলো, অত্যন্ত দামী একটা জিনিস পেয়ে গেছে আলভারেজরা, ওটা হাতিয়ে নেয়ার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলো। তলোয়ারটা কিনে নিয়ে গিয়ে আরেকটা ব্যবসা করার জন্যে। দামী অ্যানটিক দেখলে ওরকম অনেক ব্যাংকই এগিয়ে আসে। তবে মিস্টার ডয়েলের চেয়ে নিশ্চয় বেশি দেবে?'

'অনেক বেশি,' মুসা জানালো। 'কিন্তু রিগো আর পিনটু ব্যাংককে সেটা দিতে রাজি নয়। ধার যা দিয়েছে ব্যাংক সেটা ওরা সুদসহ আদায় করে দেবে। তলোয়ারটা বিক্রি করতে চায় মেকসিকান গভার্নমেন্টের কাছে, ওখানকার ন্যাশনাল মিউজিয়ম অভ হিসটোরিকে। ব্যাংক যা দিতো দাম অবশ্য তার চেয়ে কমই পাবে। তবু ওখানেই বেচবে ওরা। রিগো বলছে, মেকসিকোর ইতিহাসের সঙ্গে তলোয়ারটা জড়িত, কাজেই যেখানকার জিনিস সেখানেই যাক।'

'আবার ছাই থেকে ছাইয়ে...,' মৃদু হাসলেন পরিচালক। 'ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

'টাকা যা পাবে,' কিশোর বললো, 'তাতে ব্যাংকের ঋণ শোধ করেও অনেক বাঁচবে। আবার নতুন করে হাসিয়েনডা বানাতে পারবে আলভারেজরা, কৃষি-যন্ত্রপাতি কিনতে পারবে।' হাসি ছড়িয়ে পড়লো তার মুখে। 'তারপরেও আরও টাকা থাকবে। এবং সেটা দিয়ে কিনে নেবে মিস্টার ডয়েলের সমস্ত র‍্যাঞ্চ।'

ভুরু সামান্য কুঁচকে গেল পরিচালকের, অবাক হয়েছেন, 'মিস্টার ডয়েল বিক্রি করে দেবেন?'

'দেবেন,' হেসে উঠলো মুসা, 'র‍্যাঞ্চ করার শখ তাঁর মিটিয়ে দিয়েছে টেরি আর ডরি মিলে। তিনি র‍্যাঞ্চার নন। বেতন দিয়ে লোক রেখে যে ওই কাজটি করানো যায় না বুঝেছেন এতোদিনে। আরও একটা কারণ আছে। ইচ্ছে করলেই তাঁর বিরুদ্ধে এখন মামলা ঠুকে দিতে পারে আলভারেজরা, কারণ তাঁর লোকই ওদের ক্ষতি করেছে। রিগোকে অনুরোধ করেছেন তিনি, মামলা যাতে না করে, তাহলে খুব কম দামে তাদের কাছে র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে দেবেন তিনি।'

'নিশ্চয় রাজি হয়েছে রিগো?'

'হয়েছে।'

'এটা সবচেয়ে ভালো খবর,' খুব খুশি হয়েছেন পরিচালক, তাঁর হাসির পরিমাণ দেখে সেটা অনুমান করা গেল। 'এক কাজ করো। সময় করে একদিন পিনটুকে নিয়ে এসো আমার এখানে। এই বিজয় সেলিব্রেট করবো আমরা। মুসা, মেন্যুটা তুমিই তৈরি

করো।'

ঝকঝকে সাদা দাঁত সব বেরিয়ে পড়লো মুসার। 'নিশ্চয় করবো, স্যার।'

কিশোর হাসলো না। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে পরিচালকের দিকে, 'আলভারেজরা র‍্যাঞ্চ ফিরে পেয়েছে, নিশ্চয় সে-খুশিতে নয়, তাই না, স্যার?'

'নো, মাই বয়,' হাসি মুছলো না পরিচালকের মুখ থেকে। 'ঠিকই, ধরেছো। আমিও ব্যবসায়ী। সেলিব্রেটটা করবো গল্পের জন্যে, নতুন একটা ভালো গল্প উপহার দিয়েছো। ছবি করবো। ভাবছি, শুটিংও করবো আলভারেজদের জায়গায়ই। অবশ্যই ভাড়া দেবো। কেমন হবে, বলো তো?'

'খুব ভালো হবে, স্যার, খুব ভালো!' সমস্বরে বলে উঠলো তিন গোয়েন্দা।